# সমর্পণ

যে সুপরিচিত পল্লী-অঞ্চলটির
পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সহিত
লেখকের আবাল্য সম্বন্ধ বিজড়িত
সেই বিশিষ্ট অঞ্চলের
জনপ্রিয় অধিবাসী
নঙ্গীর সুপ্রসিদ্ধ পাল-বংশের
মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান
লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইন-ব্যবসায়ী
সাহিত্য-রসিক সৎসাহিত্যের পরিপোষক
লেখকের পরম স্নেহভাজন
শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ পাল এম, এ, বি, এল
বাবাজীবনের কর কমলে
অন্তরের আশীর্ব্বাদ সহ
এই গ্রন্থখানি সমর্পিত হইল

# পরিচয়

এই গ্রন্থের কিয়দংশ দুইটি ছোট গল্পের আকারে ( পাতিরাম পাকড়ে ও ঋণ পরিশোধ নামে ) মাসিক বসুমতীতে বাহির হইয়াছিল। দুইটি গল্পই পাঠক-সমাজের চিত্ত আকৃষ্ট করে এবং অনেকেই পাতিরাম পাকড়ের পরবর্ত্তী জীবন-কথা জানিতে উদগ্রীব থাকেন। কিন্তু এতদিন পরে খণ্ড গল্পাকারে মাসিকের পৃষ্ঠায় ইহার শেষাংশ প্রকাশের পরিবর্ত্তে বরেন্দ্র লাইব্রেরীর সত্বাধিকারী সুহৃদ্বর শ্রীযুত বরেন্দ্রনাথ ঘোষের আগ্রহাতিশয্যে সমগ্র বিষয়বস্তুটি উপন্যাসাকারেই প্রকাশিত হইল।

মাসিক বসুমতীতে পাতিরাম-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইলে ক্লাইভ স্ট্রীট ব্যবসায়ী-মহলে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং আমার পরম শুভানুধ্যায়ী কোন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করিয়া এই চিত্রটি চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া একটা আন্দোলনও উঠে। এ সম্বন্ধে লেখকের কৈফিয়ৎ এই যে, সমাজ-জীবনের বৈচিত্র্যময় কোন চিত্র যদি লেখকের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, লেখক নিজস্ব পরিকল্পনায় তাহাকে রূপায়িত করিতে প্রয়াস পান মাত্র। কিন্তু চিত্রটিই যে ব্যক্তিবিশেষের অবিকল চিত্র নহে, বুদ্ধিমান মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। সুতরাং এই আখ্যানবস্তু যে কোন ব্যক্তি-বিশেষের জীবন-বৃত্ত নহে, ইহা লেখকের কল্পনা-প্রসূত একটি মৌলিক চিত্র, পাঠকপাঠিকাগণকে ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে।

২০১ পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় পংক্তিতে মুদ্রিত 'দৌহিত্র' শব্দ দুইটি 'ভাগিনেয়' হইবে। পাঠক পাঠিকাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত মুদ্রণত্রুটি সংশোধন করিয়া লইবেন।

ফাল্গুন, ১৩৪৬
আরিয়াদহ, ২৪ পরগণা

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

# ইনটেলিজেণ্ট

# ইনটেলিজেণ্ট

## এক

পতিরামের বয়স তখন সতেরো, টালার বিদ্যাসাগর স্কুলে পড়ে। সারা নিকিরিপাড়ার মধ্যে সেই-ই একমাত্র ছেলে—শিক্ষা-সম্পর্কে বামুন-কায়েতের ছেলেদের সহিত এক বেঞ্চিতে বসিতে পাইয়াছে এবং তাহাদের সহিত অবাধ মেলামেশা ও খেলাধুলায় প্রকৃতগত বাধা কিম্বা সঙ্কোচ অনায়াসে নিশ্চিহ্ন করিতে পারিয়াছে।

নিকিরিপাড়ার ছেলেরা তাহাদেরই জাতিভাই পাতিরামের দুঃসাহস দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়!—স্কুলের ছুটীর পর বাড়ী ফিরিয়া সে পাড়ায় থাকে না, পাড়ার ছেলেদের সহিত মিশিতে চাহে না,—ভদ্দর পাড়ার সহপাঠিরাই এখন তাহার খেলার সাথী; তাহাদের সহিত মিশিয়া, গলা ধরা-ধরি করিয়া বেড়ায়,—গান গায়, গল্প করে, খাবার কাড়া-কাড়ি করিয়া খায়! পাড়ার ছেলেরা সে সময় কাছে আসিয়া পড়িল, না চিনিবার ভান করিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়!

সহরের সংস্পর্শে থাকিয়াও নিকিরিরা আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্মে

ছিল একান্ত রক্ষণশীল। এ সব বিষয়ে পাণটুকু হইতে চূণটুকু খসিলেই পাড়া হইত তোলপাড়! তখনই সালিসি বসিত, বিচার হইত, অপরাধীর দোষ প্রতিপন্ন হইলে দণ্ড না লইয়া তাহার অব্যাহতির উপায় থাকিত না।

শীতের এক সন্ধ্যায় পাড়ার সবাই জানিল, পাতিরাম কি প্রকারে পাণ হইতে চূণ খসাইয়াছে! যেহেতু, পাড়ার মোড়ল বা চাঁই কালচাঁদ কোটালের এজলাসে তাহার তলপ হইয়াছে। পাড়ার মধ্যস্থলে অধিষ্ঠাত্রী-দেবী শীতলামাতার 'স্থান'টুকুই সার্ব্বজনীন কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পল্লিবাসিগণ সকলেই খোলার ঘরে বাস করে, কিন্তু চাঁদা করিয়া টাকা তুলিয়া তাহারা মায়ের আস্তানাটি পাকা করিয়া দিয়াছে। পাকা ঘর খানির ভিতর মায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, ঘরের সম্মুখে পাকা দালান। দালানের নীচেই কাঠাপাঁচেক খোলা জমি, ইহাও দেবীস্থানের অন্তর্গত। মায়ের বার্ষিক উৎসবের সময় এই খোলা জমির উপর মেরাপ বাঁধিয়া আসর তৈয়ারী হয়, শীতলা মাতার গান, যাত্রা, তর্জ্জা প্রভৃতির আয়োজন চলে। অন্যান্য সময় দিবাভাগে পল্লীবাসীরা এই খালি জায়গাটুকুতে তাহাদের ভিজা জালগুলি শুকাইতে দেয় এবং সন্ধ্যার পর পাড়ার মাতব্বররা এখানে সমবেত হইয়া মায়ের আরতি দেখে, হরিনাম কীর্ত্তন করে আবার প্রয়োজন হইলে সালিসী-পঞ্চায়েতীর কায চালায়। মায়ের মন্দিরের পাশেই মায়ের পূজক সারদা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসা। সপরিবার তিনি মায়ের মন্দিরসংলগ্ন খানতিনেক খোলার ঘর অধিকার করিয়া বাস করেন এবং একান্ত নিষ্ঠার সহিত মায়ের সেবায় ব্যাপৃত থাকেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতি পল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রদ্ধাভক্তির অন্ত নাই।

মায়ের আরতির পর পাকা দালানের নীচে খোলা জায়গাটির উপর পঞ্চায়েতী বৈঠক বসিয়াছে। কালাচাঁদ কোটাল, হারাধন গালু, লখীন্দর গুণিন্, সহদেব সরদার, ধর্ম্মরাজ ঢালী প্রভৃতি দলপতিগণ সদলবলে উপস্থিত। ছেলেদের দল একটু তফাতে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাড়ার মেয়েরাও বাদ পড়ে নাই, তাহারা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসার দিকে অপেক্ষাকৃত অন্তরালে আশ্রয় লইয়াছে। দালানের উপর একখানা কম্বল বিছাইয়া বসিয়াছেন সারদা চক্রবর্ত্তী স্বয়ং এবং তাঁহার আত্মীয় স্থানীয় কয়েকজন ব্রাহ্মণ।

মায়ের মন্দিরের সম্মুখে এই দালানটির উপর, বিশেষ কারণ ব্যতীত পাড়ার কেহ কখনও উঠিতে সাহস করিত না। পূজা দিবার প্রয়োজন হইলে, স্নানান্তে বিশুদ্ধ বস্ত্রে তাহারা কুণ্ঠিতভাবে আসিয়া নীচে দাঁড়াইত, চক্রবর্ত্তী মহাশয় আদেশ দিলে তবে তাহারা দালানে উঠিত—ঠিক যেন অপরাধীটির মত! অথচ এই মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্যে তাহারা অর্থ দিয়াছে, প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছে, অধিকার তাহাদের যথেষ্টই আছে; কিন্তু এই সমানাধিকারবাদের দাবী তাহাদের মনের মধ্যে কোনদিন কোনও সমস্যাই তুলে নাই, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহারা চিরদিন ইহাই বুঝিয়া আসিয়াছে যে,মন্দির মায়ের; চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার প্রতিনিধি এবং পাড়াশুদ্ধ তাহারা সবাই মায়ের সেবক। পূজা দিবার জন্য যেদিন তাহারা স্নান সারিয়া শুদ্ধ হইয়া ঠাকুরের আজ্ঞায় মন্দিরের দালানটির উপর পূজার উপচার লইয়া উঠিত,—ঠাকুর তাহাদের হাত হইতে সেই সমস্ত লইয়া দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেন এবং প্রসাদের সহিত আশীর্ব্বাদীপুষ্প দিতেন, তাহারা যেন তখন কত কৃতার্থ হইয়া যাইত।

যে পবিত্র স্থানটির উপর প্রবীণদেরও এত শ্রদ্ধা, সে দিনের ছেলে হইয়া পাতিরাম তাহার অমর্য্যাদা করিয়াছে, শুধু তাহাই নয়, গ্রামবাসী সর্ব্বসাধারণ যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দেবতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, এই সূত্রে পাতিরাম তাঁহারও অবমাননা করিয়াছে। ইহারই প্রতিবিধানের জন্য পঞ্চায়েৎ বসিয়াছে এবং গ্রামের 'ষোলো আনাকে' তলপ করা হইয়াছে :

পাতিরামের বিরুদ্ধে অভিযোগ,—সে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, ব্রাহ্মণ দেখিলে মাথা নেয়ায় না, কোনও বিধি নিষেধ সে মানিতে চায় না ; যখন তখন যা তা কাপড়ে সে পূজার দালানে গিয়া উঠিয়া থাকে, ঠাকুর নিষেধ করিলে অধিকার লইয়া তাঁহার সহিত তকরার করে এবং শেষে আস্পর্দ্ধা তাহার এত বাড়িয়া যায় যে, স্কুলের ছেলেদের ডাকিয়া আনিয়া আগের দিন দালানে উঠিয়া বসে, সকলে মিলিয়া সেখানে খাবার খায়, তাহাদের উচ্ছিষ্ট পাতা মায়ের মন্দিরের ভিতর বাতাসে উড়িয়া গিয়া পড়ে।

পাতিরামকে প্রশ্ন করা হইলে সে দম্ভের সহিত জবাব দিল,—আমি অন্যায় কিছু করি নাই

দলপতি তাহাকে ধমক দিয়া বলিল,—বরাবর যে নিয়মকানুন চ'লে আসছে, তাকে হেলা করলেই অন্যায় করা হয়।

পাতিরাম তর্কের ছলে ঝাঁঝাইয়া উত্তর দিল,—তা ব'লে তোমরা যদি বরাবর ভুল ক'রে থাক, আমি তা কেন করব ?

পাতিরামের কথা শুনিয়া সমবেত সকলেই অগ্নি অবতার। সে দিনের ছেলের এত বড় বুকের পাটা, মুখের দৌড় এত দূর। যোগে

আনার ভুল দেখাইতে আসে! কিন্তু নিরক্ষর হইলেও, তাহারা নির্ব্বোধ ছিল না, পাতিরামকে কথা কহিবার অবসর দিল। প্রশ্ন হইল,—কি ল আমরা করেছি?

পাতিরাম তথন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি দক্ষিণের এক পাদ্মরাজ বি, এ, পাশ করিয়া তাহাদের স্কুলে প্রথম মাষ্টারী করিতে আসিয়াছেন; পঁচিশ বছরের তরুণ যুবা, সাহিত্য শিক্ষা দিতে বসিয়া ক্লাসের মধ্যে যতটা সম্ভব বর্ণ-বিদ্বেষের বিষ উদ্‌গার করিতেন,—নিঃশেষ করিতেন প্রতি শনিবার দুইটার বন্ধের পর ছেলেদের ডিবেটিং উপলক্ষে। ই শিক্ষকটি বিখ্যাত চর্চ্চমিশনারী স্কুল ও কলেজ হইতে আগাগোড়া শিক্ষালাভ করিয়া—সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি একটা বিরুদ্ধভাব ইয়াই বিদ্যাসাগর স্কুলের ছেলেদের মুক্তির ভার লইয়াছিলেন এবং সুবিধা াইলেই প্রচার করিতেন,—মানুষমাত্রই অমৃতের পুত্র, কোনও পার্থক্য াহারও মধ্যে নাই. সবাই সমান; জাতিভেদ কুসংস্কার; দেব-দেবীপূজা ন্ত্রতন্ত্র সমস্তই মিথ্যা—সুবিধাবাদী স্বার্থপর ব্রাহ্মণ জাতির অলীক কল্পনা াত্র!—বিদ্যালয়ে অধীত বিদ্যাংশ ত্যাগ করিয়া পাতিরাম এই মুখরোচক ্যগুলি যথাসাধ্য কণ্ঠস্থ করিয়াছিল এবং উত্তরচ্ছলে তাহার বিচারকদের কট উদ্‌গার করিয়া সভাস্থ সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দিল।

—কিন্তু পাতিরামের দুর্ভাগ্য, তাহার ব্রহ্মবিদ্যার পরিচয় পাইয়াও কেহই াহাকে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ বলিয়া বাহোবা দিল না, বরং তাহার বিরুদ্ধে 'রায়' বাহির হইল যে, সর্ব্বসমক্ষে তাহার মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ণ্ডত মস্তকে এক ঘড়া গোবর-জল ঢালিয়া দেওয়া হইবে এবং সাত চ মাপিয়া সে নাকেখৎ দিবে!

পাতিরাম স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার দণ্ডাদেশ শুনিল. একটি কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না. ঠোঁটখানি পর্য্যন্ত নড়িতে দেখা গেল না।

কিন্তু সহসা ভীড় ঠেলিয়া পঞ্চায়েতদের সম্মুখে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল তাহার মা দ্রৌপদী! সরোদনে কহিল,—দুধের ছেলে আমার, ন্যাকাপড়া শিখেই না ওর কাল হ'ল! ওকে তোমরা এ যাত্রা ক্ষেমা-ঘেন্না কর. ও হুকুম ফিরিয়ে নাও,—দু চার গণ্ডা ট্যাকা বরং জরিমানা কর, আমি ভিক্ষে সিক্ষে করেও তা হাজির করব।

দণ্ড শুনিয়া যে পাতিরাম ধৈর্য্য হারায় নাই, মায়ের এই হীনত দেখিয়া সে গর্জ্জিয়া উঠিল,—খবরদার মা! আমার হয়ে একটি পয়সা তুমি জরিমানা ব'লে দিতে পারবে না; তা হ'লে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব কি করেছি আমি? চুরি করেছি, ডাকাতি করেছি, না কারুর বুকে ছুরি মেরেছি যে জরিমানা দেবে? ওরা সব এককাট্টা হয়েছে, আমি একলা তাই যা ইচ্ছা তাই করতে চাইছে! কিন্তু আমি সবই না, এর শোধ নেবই।

সতেরো বছরের 'দুধের' ছেলের এই দুঁদেপনা কাহারও বরদাস্ত হইল না; সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ গোয়াল হইতে এক থাবা গোময় আনিয়া জোর করিয়া পাতিরামের মুখবিবরে গুঁজিয়া দেওয়া হইল এবং দুই-জন যোয়ান তাহার দুই কাণ ধরিয়া পঞ্চাশবার ওঠবস করাইল।

পুরোহিত ঠাকুর হাত তুলিয়া কহিলেন,—বাস্, বাস্, যথেষ্ট হয়েছে ছেলেমানুষ কুসংসর্গে পড়েই মাথাটাকে বিগড়ে ফেলেছিল, এবার চৈতন্য হবে; চৈতন্যময়ী ওকে সুপথ দেখাবেন। এবারের মত তোমরা ওকে

ক্ষমা কর,—আর ও সব শাস্তির দরকার নেই। কাছে আয় বাবা, কাছে আয়, আশীর্ব্বাদ নিয়ে যা—

মুখ বিকৃত করিয়া পাতিরাম উত্তর দিল,—থাক্ থাক্, তোমাকে আর 'গরু মেরে জুতো দান' করতে হবে না; কে তোমার আশীর্ব্বাদ চায়, ঠাকুর? আশীর্ব্বাদ ওদের কর; পাতিরাম পাকড়ে কেয়ার করে না তোমাকে—তোমাদের বামুন জাতকে—তোমাদের ঠাকুর-দেবতাকে,—এ কথা জেনে রেখো।

পাতিরামের এত বড় স্পর্দ্ধার কথাটা ঠাকুর মহাশয় হাসিয়া উপেক্ষা করিতে চাহিলেও, সভার 'ষোল আনা' তাহা বরদাস্ত করিতে পারিল না। পুনরায় তাহার কাণ দুটি ধরিয়া 'পঞ্চের' সম্মুখে খাড়া করা হইল এবং 'পঞ্চের' মাথা হইয়া কালাচাঁদ কোটাল পাতিরামকে জানাইয়া দিল,—ষোল আনার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হ'লে, আর দশ জনের মত সবার 'সো' হয়ে থাকতে হবে; বামুন দেবতা নেমকম্ম মানবো না বললে চলবে না।

দুই চক্ষ পাকাইয়া গোঁয়ারের মত পাতিরাম কহিল,—আমি যদি না মানি

জোর গলায় কোটাল তাহারও ব্যবস্থা দিল,—তা হ'লে ষোল আনা তোকে সার থেকে ছেঁটে ফেলে দেবে, কোন তোয়াক্কা তোর রাখবে না।

দৃঢ়স্বরে পাতিরাম জানাইল,—বেশ, তাই সই! আজই আমি ষোল আনাকে ছেঁটে আলাদা হলুম।

পঞ্চের আদেশে 'ষোল আনা' সকলেই তৎক্ষণাৎ পাতিরাম পাকড়ের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিল। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতার

প্রান্তদেশে নিরক্ষর নিকিরি-সমাজের মধ্যেও সামাজিক শাসনের প্রভাব এতটা তীব্র ছিল।

২

দ্রৌপদী ছেলেকে তিরস্কার করিয়া কহিল,—দোষ ত তোর! তুই দুপাতা ন্যাকা-পড়া শিখে বেজ্ঞদের পাল্লায় পড়ে এত বড় নায়েক হয়েছিস্ যে দেবতা বামুন মান্‌তে চাস্ না, পঞ্চের সামনে তাই নিয়ে তকরার কল্লিস্!

পাতিরামের রোখ তখনও কমে নাই, মায়ের কথায় ফোঁস্ করিয়া উঠিয়া উত্তর দিল,—আমার খুসী; তুই চুপ ক'রে থাক্।

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আমি ত চুপ করবই, আমার ক্ষ্যামতা কি, তোর সাথে কথায় পারি? কিন্তু, দেখতে পাচ্ছি, তোর কাণে পাক দিয়ে মুখের মধ্যে গোবর গুঁজেও কেনারা তোরে আক্কেল দিতে পারে নি। তোর অদেষ্টে ঢের কষ্ট আছে।

পাতিরাম তথাপি দমিল না. তর্জ্জন করিয়া কহিল,—মরদকা বাত. হাতীকা দাঁত,—যা বেরোয়, ঢোকে না। আমি যা বলেছি, তাই করব; পাড়ার কারুর সঙ্গে আমি কোনও তোয়াক্কা রাখব না, দেবতা-বামুনকে কেয়ার করব না—

দ্রৌপদী এবারে রাগের সুরে ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—বামুন বামুন করছিস্, বামুনরা যেন তোরে সাধছে—তোর ভক্তিছেরেদ্ধা নেবার

লালসে, তুই না হ'লে আর তাদের চলছে না। কিন্তু তুই এত বড় নেমকহারাম, এইটেই ভুলে যাচ্ছিস যে, বামুনের দৌলতেই তুই এত বড়টি হয়েছিস্—ল্যাকাপড়া শিখিছিস্।

আগুনের উপর যেন জলের অঞ্জলি পড়িল। পাতিরাম বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করিল,—কি বল্লি,—বামুনের দৌলতে মানুষ হয়েছি আমি, লেখাপড়া শিখেছি?

দ্রৌপদী দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল,—হ্যাঁ, যখন বিধবা হই, তুই তখন সবে পাঁচ বছরের কোলে পা দিয়েছিস্। একটি পয়সা তোর বাপ রেখে যায় নি। মুখুয্যে বাবুদের পুকুরগুলো সে দেখাশোনা করত। তেনারা শুনেই গতির টাকা দেন পাঠিয়ে। পরে হামরাই হয়ে দাঁড়ান, যাতে তোকে নিয়ে না পথে দাঁড়াতে হয়। কর্ত্তাবাবু ওঁকে ছেলের মত ভালবাসতেন। তাঁরই দয়ায় শ্রেদ্ধায় বড় বড় ঘরে মাছের জোগান দিয়ে তোকে মানুষ করি। তোকে চালাক-চতুর দেখে তিনিই জিদ ক'রে বলেন, দ্রুপ! তোর ছেলেটার লক্ষণ আছে, কালে মানুষ হবে, এরে আর মাছের ঝুড়ি বইতে শেখাসনি, ইস্কুলে পড়তে দে, যত দিন পড়বে, ওর মাইনে আর জামা-কাপড় বই পত্তর জোগাবো আমি। কিন্তু খবরদার, এ কথা কাউকে বলতে পাবি নে; কথা ফাঁস হলেই আমিও হাত গুটোব।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া পাতিরাম জিজ্ঞাসা করিল,—তা হ'লে ওপাড়ার সাতকড়ি মুখুয্যে আমার লেখা-পড়ার খরচ জোগায়,—সেই দেয় স্কুলের মাইনে? জামা, কাপড়, জুতো, বই, খাতা— সব?

দ্রৌপদী উত্তর দিল,—হ্যাঁ, নইলে আমার কি ক্ষ্যামতা—তোকে এই

ছালে স্কুলে পাঠাই ? পাড়ার দশ জনে এই নিয়ে কত কথাই আমাকে বলে, জিজ্ঞাসা করে, ন্যাকা-পড়া শিখে শতা তোকে কোন স্বর্গের সিঁড়ি বানিয়ে দেবে ? আমি চুপ ক'রে শুনে যাই, কারুর কথায় রা কাড়ি না. তখন কি জানতুম, ন্যাকা-পড়া শিখে তুই এমনি নায়েক হয়েছিস্ ? দশ জনের সামনে আমার মুখে ভুষোকালি মাখিয়ে দিলি !—তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

পাত্তিরাম নরম হইয়া কহিল,—তুই কাঁদিসনি, আর আমি লেখা-পড়া করব না, আজ থেকে ওপাটে ইস্তফা দিলুম।

অঞ্চলে দুই চক্ষু মুছিয়া দ্রৌপদী ছেলের শান্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিল,—আর ইস্কুলে যাবি নি ?

—না।

—কি করবি তা হ'লে ? কায ত কিছু করা চাই।

—কাযই করব ; যাতে রোজগার হয়, পরের কাছে আর হাত পাততে না হয়।

—কায করবি, সে ত ভাল কথা ; কি কায করবি, ঠিক করেছিস ?

—সে তোমাকে এখন বলব না, পরে জানতে পারবে। কিন্তু তোমাকে এই কাযের জন্য আমাকে কালই পঞ্চাশটি টাকা যোগাড় ক'রে দিতে হবে।

—বলিস কি ! সে কত বললি ? ক গণ্ডা ট্যাকা ?

—সাড়ে বারো গণ্ডা ; এ তোমাকে দিতেই হবে। কিন্তু কারুর কাছ থেকে ধার ক'রে যদি তুমি টাকা এনে দাও, তা হ'লে আমি নেব না।

—তোর যত সব অনাচ্ছিষ্টির কথা! টাকা কি আমার ঘরে পোতা আছে যে, তুই চাইবামাত্রই তুলে এনে দেব? তোর সে খবরে দরকার কি, ধার ক'রে আনি. কি চেয়ে আনি;—তোর ত টাকা নিয়ে কথা?

—ধার করা টাকা নিয়ে আমি কায করতে নারাজ। তুমি বরং ঘটীবাটি বিক্রী করেও এই টাকা আমাকে যোগাড় ক'রে দাও, তুমি দেখে নিও সম্বৎসরের ভিতর আমি এর তিনগুণ টাকা তোমাকে তুলে দেব।

দ্রৌপদী রাজী হইল। পরদিনই সেই টাকা হাতে লইয়া পাতিরাম কাযের সন্ধানে বাহির হইল। সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় সে বাড়ী ফিরিয়া মাকে ডাকিয়া কহিল,—কায যোগাড় ক'রে ফেলেছি মা, টাকা সেখানে ছড়ানো আছে; তুলে আনতে পারলেই হ'ল।

দুই চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া মা পুত্রের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—বলছিস কি?

পাতিরাম কহিল,—হাবড়া ষ্টেশনে গিয়েছিলুম মা, আগেই খবর একটু পেয়েছিলুম। পশ্চিম থেকে রেলে মাছ আসছে আজকাল. সেই মাছ ওখানে সস্তায় কিনে নেব; তারপর কলকাতার সব বাজারে যোগান দেব। মাস কতক কায ক'রে, হাতে টাকা জমিয়ে নিজে আড়ত খুলে বসব। একটু মাথা খেলিয়ে তরিবদ্ ক'রে ও মাছ যদি বাজারে চালাতে পারি, দেখবে তখন—পয়সা কে খায়!

দ্রৌপদী অবাক্ হইয়া প্রশ্ন করিল,—পচ্চিম থেকে মাছ আসছে রেলে? বলিস কি রে। তা, সে মাছ ত প'চে ঢোল হবার কথা!

পাতিরাম কহিল,—বরফ দিয়ে তারা পাঠায় যে, পচবে কেন?

দ্রৌপদীর বিস্ময় যদি বা কাটিল কিন্তু সমস্যা তুলিল,—চালানী মাছ লোকে নেবে কেন?

পাতিরাম জানাইল,—খদ্দেরের কাণে কাণে কি ব'লে বেড়াতে হবে যে, মাছ এনেছি পশ্চিম থেকে! সবাই জানবে, ভিন্ গাঁয়ের পুকুরের মাছ।

দ্রৌপদী পুত্রের প্রস্তাব শুনিবামাত্রই শিহরিয়া উঠিল; কহিল,—এতে যে দুদিনেই জানাজানি হয়ে পড়বে বাবা, চালানী মাছ পুকুরের ব'লে চালাতে গেলেই ধরা পড়তে হবে, নিন্দে হবে—

পাতিরাম কঠিন হইয়া কহিল,—কিছুই হবে না। বাজারে দেখ নি, বড় মাছ পড়লে চীলের মত সবাই ছুটে এসে কাড়াকাড়ি লাগায়, কোথাকার মাছ, কখন্ ধরা হয়েছে, কটা লোকে তার খবর নেয়? পশ্চিম থেকে মাছের চালান আসতে পারে, এ কথা কেউ এখনো বিশ্বাসই করবে না, তার পর যখন জানাজানি হবে, তত দিনে আমরা কায গুছিয়ে নেব, মা! তুমি দেখে নিও, এই কাযে নেমে আমি কি ক'রে কায বাজাই, পয়সা পয়দা করি!

মা বুঝিল, ছেলেকে বুঝাইবার প্রয়াস বৃথা। সে অগত্যা চুপ করিয়া রহিল। পাতিরাম সেই দিনই তাহার লেখাপড়ার সাজসরঞ্জাম সমস্তই উঠানে আগুন জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ফেলিল,—তাহার সখের জামা, জুতা, কাপড়, চাদর—সমস্তই তাহাতে আহুতি পড়িল। অগ্নিশিখা উঁচু হইয়া উঠিল। পাশের বাড়ীর মেয়েরা সভয়ে ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—করছিস কি?

পাতিরাম দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল,—যজ্ঞ করছি—ঋণ-মুক্তির।

মাথা ন্যাড়া করিয়া তাহাতে নিত্য নিয়মিত ঘোল ঢালিবার যুক্তি দিয়া তাহারা চলিয়া গেল। মা বাজারে গিয়াছিল, ফিরিয়া কহিল,—এ কি সর্ব্বনাশ করেছিস রে?

পাতিরাম বিকৃতস্বরে কহিল,—মুখুয্যে বামুনের দেনার চিহ্নগুলো জ্বালিয়ে দিলুম, মা! দেনার খাতায় বামুনের হিসেবটা আগেই টুকে নিয়েছি, ঠিকঠাক সব হিসেব ত ধরতে পারিনি, মোটামুটি ধ'রে নিয়েছি—হাজার! মানুষ হয়েই সুদশুদ্ধ এইটে আগেই শুধবো।

অবাক্ হইয়া মা পুত্রের অগ্নির উত্তাপপৃষ্ট রক্তাভ মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল।

## ৩

সতেরো বৎসর বয়সে পাতিরাম যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, অসাধারণ প্রতিভা, একাগ্রতা ও অধ্যবসায় সম্বল করিয়া কয়েক বৎসরের কঠোর সাধনায় তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। অথচ তাহার বয়স এখনও বাইশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

কার্য্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রচুর অর্থাগম হইতে থাকে এবং অর্থকে কঠিনভাবে আয়ত্তে রাখিতে তাহাকেও কঠিন হইতে হইয়াছে! তাহার বিধিবিগর্হিত কার্য্যের জন্য প্রতিবাসীরা তাহার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে, পাতিরাম কিন্তু পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করে নাই বা তাহাকে কেহ কোনও দিন কোনও প্রতিবাসীর মুখাপেক্ষী হইতে দেখে নাই।

পাছে কোন দিন প্রতিবেশীদের দ্বারস্থ হইতে হয়, এই আশঙ্কায় মায়ের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে সে বিবাহ পর্য্যন্ত করে নাই।

পাড়ার কথা উঠিলেই তাহার মার্জ্জারের মত অদ্ভুত দুই চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠে, বিড় বিড় করিয়া নিজের মনে কত কি বলে; কিন্তু তাহার সঙ্কল্পের কথা তাহার মনেই গুপ্ত থাকে; কি করিতেছে সে, বা কি করিবে, তাহা লইয়া সে যেমন আস্ফালন করে না, তেমনই কাহারও নিকট ব্যক্তও করে না, তবে তাহার মনের দৃঢ় ধারণা এই যে, এক দিন সে সমস্ত পাড়ার উপর তাণ্ডবনৃত্য করিবে; সে দিন পাড়াপড়শীর একখানা মাথাও উঁচু হইয়া থাকিবে না—সকলেই মাথা পাতিয়া দিবে—তাহার নৃত্যচপল চরণযুগল সভয়ে তুলিয়া লইবার জন্য!

মায়ের নিকট পাতিরাম যে টাকা লইয়া ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়াছিল, বৎসরের মধ্যেই তাহার বিশ গুণ টাকা মায়ের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। দ্রৌপদী এখন আর মাছের ঝুড়ি মাথায় করিয়া বাড়ী বাড়ী যোগান দিতে বাহির হয় না। এখন তাহার পুত্রের দৌলতে তাহার বাড়ীতে লোকের অভাব নাই। দেহাদ হইতে পাতিরাম ছয় জন নিকিরিকে মোটা মাহিনায় নিযুক্ত করিয়া বাড়ীতে রাখিয়াছে। তাহারা বাড়ীতে থাকে, আড়তের কায করে, রাত্রিতে বাড়ীতে আসিয়া পাহারা দেয়। পাতিরামের এখন বেশ বোলবোলাও হইয়াছে। যাকে তাকে টাকা ধার দেয়, কিন্তু দলীল বেশ কায়দা করাইয়া লিখাইয়া লয়—যাহাতে কোনও সূত্রে আইন-আদালতে না বাঁচিয়া যায়। ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব হয় না, টাকা ধার দেওয়ার কথা প্রচার হইয়া পড়িলে সকল বাধা ঠেলিয়া উমেদারের দল দেখা দেয়। পাড়ার কয়েক জন মাতব্বরও সামাজিক

প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করিয়া বিষম দায়ে পড়িয়া পাতিরামের খাতক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাহ্য ব্যাপারে মনে হয়, পাতিরামের মনে কোন বিকার নাই, আগেকার অপ্রিয় দাগটুকু সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে; তাহার লক্ষ্য শুধু চড়া সুদ ও পাকা দলীল সম্পাদনের দিকে; টাকা ধার দিতে কোন দিন তাহাকে বিমুখ হইতে দেখা যায় না।

অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৈতৃক সামান্য ভিটেবাড়ীটিও যথাসম্ভব সংস্কার করিয়া লইয়াছে; কিন্তু ইমারত তুলে নাই। পাতিরামের প্রতিজ্ঞা, অন্ততঃ দশ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন না করিলে সে পাকা বাড়ীতে মাথা গলাইবে না। বাহিরে খোলার চালা দেওয়া লম্বা চওড়া একখানা ঘর, লাল রংয়ের সিমেন্ট করা গৃহতল, তাহার উপর ময়লা বিছানা পাতা, গোটা দুই তাকিয়া; বিছানার চাদর ও তাকিয়ার ওয়াড় কাবুলিওয়ালার অঙ্গবস্ত্রের মত এ পর্যন্ত স্থানচ্যুত হইবার অবকাশ পায় নাই, তেল ও ধূলার সংযোগে তাহারা বর্ণ-বিভ্রাট উপস্থিত করিয়াছে,—কিন্তু পাতিরামের এসব বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই! এই গদিঘরে—বিচিত্র গদিতে বসিয়া সে নিত্য হাজার হাজার টাকার লেন-দেন করে। বাহিরের সিমেন্ট-করা প্রশস্ত দাওয়াটির উপর তাহার মক্কেল ও খাতকরা অনুগ্রহ প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে!

অদ্ভুত তাহার কার্য্য-পদ্ধতি,—সাধারণের পর্য্যায়ে আসিয়া যাহার নিন্দা মূলক সমালোচনা করা চলে না। রাত্রি ঠিক তিনটায় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া সে তাহার কার্য্যারম্ভ করে। সমস্ত কাষ নিজের চক্ষুতে দেখিয়া ব্যবস্থা করা তাহার চিরন্তন অভ্যাস। নূতন রোজগার না করিয়া সে জল স্পর্শ করে না, বাসি পয়সায় খাইব না—এটিও তাহার

অন্যতম প্রতিজ্ঞা। সহরের উপকণ্ঠে বিভিন্ন স্থানে তাহার শতাধিক পুষ্করিণী বিদ্যমান—দীর্ঘকালের মেয়াদে এ সকল পুকুর জমা করা আছে। আষাঢ়-শ্রাবণে গঙ্গায় ঘোলা জলের সঙ্গে সঙ্গে ডিমের মরসুম যেই উপস্থিত হয়, পাতিরাম একাই সে সব কিনিয়া লয়, ডিম ফুটিবার উপযুক্ত পুষ্করিণীগুলিতে নিজে উপস্থিত থাকিয়া পরিমাণমত ডিম ফেলে,—বক্রী চড়া দরে বাজারে বিক্রয় করে! আশ্বিনের শেষ হইতে বিভিন্ন পুকুরে চারা পোনাসমূহ চালাই ও পাইকারী বিক্রয় আরম্ভ হয়। তাহার পর সারা বৎসর ধরিয়া এই ব্যবসায় চলে,—কুন্‌কে-ভরা ছোট পোনা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে অতিকায় রুই-কাৎলা পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যায় না। ভোর পাঁচটার মধ্যে পুকুরের ব্যাপার সারিয়া তাহাকে হাবড়ায় আড়তে ছুটিতে হয়, নয়টার পূর্ব্বেই সারাদিনের কায শেষ করিয়া সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসে।

পাতিরামের আড়তের শাঁখের করাত আসিতে যাইতে দুই তরফা কাটে! রেলের কল্যাণে নানা স্থান হইতে আড়তদারের নামে বাক্স-বন্দী হইয়া মাছের চালান আসে। পাতিরাম বুদ্ধি খাটাইয়া মফস্বলের চালানদারের নিকট বাক্স ও বরফ পাঠাইবার ব্যবস্থা করে, ইহার ফলে অন্য সব আড়তদারকে কাণা করিয়া দিয়া তাহারই আড়ত দেখিতে দেখিতে জমকাইয়া উঠিয়াছে। পাতিরামের ব্যবসায়ের ব্রহ্মাস্ত্র ছিল পয়সা ছুঁড়িয়া মারা! জল-ঝড় বজ্রপাত—প্রাকৃতিক যত কিছু দুর্যোগ আসুক, হরতাল হউক বা আড়তের কায বন্ধ থাকুক,—চালানদারের নামে রোজকার টাকা পাঠান কিছুতেই বন্ধ থাকিবে না। পাতিরাম কোনও দিন স্থানীয় ব্যাপারীদের মুখ চাহিয়া থাকে না,—নিজেই

বিধামত দর দিয়া নিজের লোকের দ্বারা বেনামীতে মাল কিনিয়া
য় এবং নিজের লোক দ্বারা সহরের বিভিন্ন বাজারে, মেসে, হোটেলে
বক্রেয় করিতে পাঠায়। অন্যান্য আড়তদাররা পাতিরামের শাঁখের
রাত চালাইবার অপূর্ব্ব কৌশল দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। কিন্তু
াতিরামের যেমন প্রতাপ তেমনই দম্ভ, সমব্যবসায়ীদিগকে গ্রাহ্যও করে
া কোন দিন।

গায়ের রংটি তাহার যদিও কালো, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া এমন
কটা আভা ফাটিয়া বাহির হয় যে, প্রথম দর্শনেই চমৎকৃত করিয়া
লে। মুখখানা যেন প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তায় জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।
াধারণতঃ চোখ দুটি ক্ষুদ্র ও নিষ্প্রভ মনে হয়, কিন্তু সময় বিশেষে
াহাদের অপরূপ বিকাষ দেখা যায়; জ্যোতিষী যেমন হাতের রেখা
াখিয়া জাতকের ভাগ্য নির্ণয় করে, পাতিরাম তাহার দুই চক্ষুর দৃষ্টি
রাই ততোধিক নৈপুণ্যে আগন্তুকের অন্তর পাঠ করিতে পারে।
া অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যেমন স্থির তেমনই তীক্ষ্ণ। আবার যখন সে
হসা উত্তেজিত হইয়া উঠে, সে সময় ঐ ছোট ছোট দুটি চোখ বুঝি
কেবারে পাল্টাইয়া যায়, মনে হয় যে, এতবড় ও জলন্ত একজোড়া চোখ
াহার মুখের উপর বিরাজ করে, সে মানুষ নহে—বাঘ। চোখের মত
ুখের প্রকৃতিকেও সে ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত। আলাপ
রিচয়ের সময় কখনও তাহাকে দেখা যে যায় একেবারে আত্মভোলা
ানুষ, সব কাজেই তাহার এলোমেলো, প্রতিপদেই তাহার ভুল চুক
য়াছে। কখনও বা নেকা-বোকা সাজিয়া আলাপ কারীকে অবাক
রিয়া দেয়। সাধারণতঃ সে অল্পভাষী, কিন্তু আবার ক্ষেত্র বা পাত্র

বিশেষে তাহার মুখ দিয়ে যেন কথার খই ফুটিতে থাকে। এইভা
সে যাহাদের মনের মণিকোঠায় অনায়াসে প্রবেশ করিতে সম
হয়, তাহার নিজের অন্তরটাই তাহাদের পক্ষে রহস্যময় হই
থাকে।

## ৪

পুত্রের অর্থ-ভাগ্যে দৌপদীর যতটা আনন্দ ও উল্লাস, পাড়াপ্রতিবাসী
সহিত মনোমালিন্যে তাহার মনের গোপন ব্যথাও ততটা গভীরভা
প্রকাশ পায়। সদাসর্ব্বদাই তাহার সাধ হয়, ছেলের বিবাহ দিয়া রা
টুকটুকে একটি বধূ-বাড়ীতে আনে এবং সেই-সূত্রে বোল আনাকে
করিয়া আগেকার মত আবার দলভুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু পাত্তিরা
কাছে যখনই সে কথাটা পাড়ে, তখনই সে গম্ভীর হইয়া উত্তর দেয়,
এখনও সে সময় আসেনি, মা।

মা সাগ্রহে সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটির প্রতীক্ষা করে, কিন্তু
সেই কাম্য দিনটি সহসা দেখা দিবে, তাহা ভাবিয়া পায় না।

পুত্রের আর একটি ব্যবহারে মায়ের প্রাণ ব্যথায় ভ
উঠে। সে লক্ষ্য করে, চড়া সুদে টাকা দেওয়া পাত্তির
যেন একটা নেশা হইয়া পড়িয়াছে; টাকা ধার দিবার

যে খাতককে সে জামাই-আদরে থালাভরা খাবার খাওয়ায়, মাস কয়েক পরেই দেখা যায়, তাহারই সর্ব্বনাশে সে বদ্ধপরিকর, বাঘের মত সে তখন দুর্ভাগ্য খাতকের টুঁটি দাঁতে কাটিয়া তাহার রক্তপানের জন্য উন্মত্ত! তখন তাহার লঘুগুরু জ্ঞান থাকে না, পয়সার জন্য পিশাচেরও অধম হইয়া উঠে।

অবশ্য, এমন ঋণপ্রার্থীরও অসদ্ভাব দেখা যাইত না,—যাহারা অত্যাবশ্যক অর্থের মোহে আভিজাত্যের দর্পকে খর্ব্ব করিতে ঘৃণাবোধ করিতেন; কিন্তু পাতিরামের মিষ্টান্ন তাঁহারা উপেক্ষা করিলেও পাতিরাম তাঁহাদের এই স্পর্দ্ধা উপেক্ষা করিতে পারিত না, চিত্রপটে তাহাদের নাম সে হিংসার অক্ষরে লিখিয়া রাখিত এবং এই সব ক্ষেত্রে ঋণদানে তাহাকে মুক্তহস্ত দেখা যাইত।

পুত্রকে বাগে পাইলে মা তাহাকে উপদেশ দেয়,—বাবা! ভগবান্ তোকে যখন কারবারে পয়সা ঢেলে দিচ্ছেন, তখন তেজারতি ক'রে লোকের শাপমন্যি কুড়িয়ে কি দরকার। পার ত, লোকের উপকার ক'রো দান ক'রে? নইলে, ধার দিয়ে এক দিন তার উপকার ক'রে তারপর শতেক দিন তার খোয়ার করার চেয়ে হাত গুটিয়ে নেওয়াই ভাল। টাকা ধার দেবার সময় সন্দেশ-রসগোল্লা খাইয়ে টস্ দেখানো তারপর ধার শুধতে না পারলে তার বুকের কল্‌জে ছিঁড়ে নেওয়া—এর চেয়ে মহাপাপ আর নেই, বাবা!

বাবা কিন্তু কথার এই আঘাতটুকু নিরুত্তরে সহ্য করিয়া যায়; তাহার উদ্ভাবিত এই বিচিত্র অর্থনীতির মূলে কি রহস্য নিহিত, সে ভিন্ন অন্যে তাহার মর্ম্ম কি বুঝিবে?

শীতলা-মন্দিরের পুরোহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে দিন গোপনে পাতিরামের সহিত দেখা করেন এবং কন্যাদায় উপলক্ষে তাঁহার দমদমার ভদ্রাসনবাটী ও জমি জমা বন্ধক রাখিয়া তিন হাজার টাকা ধার চাহেন, সে দিন পাতিরামের ওষ্ঠপুটে হাসির ঝিলিক দেখা দিয়াছিল পাতিরাম তাঁহাকে টাকা দেয় এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাকে এই প্রতিশ্রুতি করাইয়া লন যে, এই লেনদেন ও বন্ধকী ব্যাপারটা গোপন থাকিবে। পাতিরাম বর্ণে বর্ণে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিল, কাহারও নিকট এ তথ্য ব্যক্ত করে না।

কিন্তু বৎসরখানেক পরে আর এক কন্যার বিবাহ-ব্যাপারে উক্ত বন্ধকী সম্পত্তির উপর আরও হাজার টাকা ধার দিবার প্রস্তাব লইয়া যে দিন চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুনরায় গোপনে পাতিরামের গদিতে পদার্পণ করিলেন, সে দিন সে গম্ভীরভাবে জানাইল,—হাত যে এখন একবারে খালি চক্রবর্ত্তী মশাই, থাকলে এখনি দিতাম। তা, আপনি এক কাম করুন না কেন, বাজে জমীজমা বিক্রী ক'রে হাজারখানেক টাকা তুলে নিন না!

চক্রবর্ত্তী মহাশয় সবিস্ময়ে জানাইলেন,—বন্ধকী জমী বিক্রী করবার অধিকার ত আমার নেই, পাতিরাম!

পাতিরামের ওষ্ঠে আবার সেই হাসি দেখা দিল; কহিল,—তাতে কি হয়েছে? বন্ধক রেখেছি ত আমি! আমার যখন আপত্তি নেই, কেন আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন?

ব্রাহ্মণ একেবারে তন্ময়! কি মহাপ্রাণ এই ক্ষণজন্মা নিষ্কিরিমন্দন

জাতিতে হেয় হইলে কি হয়? ব্যবহারে চণ্ডালও ব্রাহ্মণ হয়! পরক্ষণে প্রশ্ন তুলিলেন,—তা হ'লে তুমি কি বাবা, ঐ পরিমাণ টাকায় ভূ-সম্পত্তি বিক্রী করবার সম্মতিপত্র দেবে লিখে একখানা?

পাতিরামের ওষ্ঠের দুই প্রান্তে হাসি এবার ফুটিয়া উঠিল; উপেক্ষার স্বরে কহিল,—আপনি কি পাগল হয়েছেন, চক্রবর্ত্তী মশাই! এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ছুঁচোর বিষ্ঠে পর্ব্বতে তুলতে চান! কাক-চীল এ ব্যাপার জানে না যখন, লেখা-লেখির দরকার? বন্ধকী ব্যাপারের নাম-গন্ধ না তুলে আপনি তাড়াতাড়ি কায হাসিল ক'রে ফেলুন। হ্যাঁ, তবে একটা কথা আমার বলবার আছে। বিক্রীর টাকা যদি হাজারের ওপর হয়, হাজার আপনি নিয়ে, বাকিটুকু আমাকে জমা দিয়ে দলীলে উস্থল করিয়ে নেবেন।

কায যথাসময় হাসিল করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিক্রীত জমির চৌহদ্দীসমেত ফিরিস্তি ও ক্রেতার নাম পাতিরামকে জানাইতে দ্বিধা করেন নাই। তবে দলিলে কিছু টাকাই উস্থল দিতে পারেন নাই। এক বন্দ বাগান ও কয়েক বিঘা ধান-জমী বিক্রয় করিয়া পৌনে নয় শত টাকার বেশী তিনি পান নাই।

কিন্তু এই ঘটনার পর মাস পূর্ণ হইতে না হইতে এই গুপ্ত কথাটি ... সহসা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। সকলেই শুনিয়া বিস্মিত হইল যে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মত নিষ্ঠাবান্ ধাৰ্ম্মিক ব্রাহ্মণ, তাঁহার সম্পত্তি পাতিরাম পাকড়ের নিকট বন্ধক রাখিয়া, তাহার অজ্ঞাতে উক্ত বন্ধকী সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় করিয়াছেন!

যে ব্যক্তি পৌনে নয় শত টাকায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাগান ও

জমী কিনিয়াছিল, বেনামা-পত্রে বন্ধকী ব্যাপার জানিয়া সে চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের নামে উকীলের চিঠি দিল।

এইভাবে বিপদাপন্ন হইয়া এবার যখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাতিরামে গদিতে আসিলেন, তখন তাহার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মুখের সে ভঙ্গী নাই, ভাষায় সে মাদকতা নাই, বাহ্যিক মহানুভবতা খোলস ত্যাগ করিয়াছে!

চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দেখিবামাত্র পাতিরাম কঠিন হইয়া রূঢ়স্বরে জানাইল,—আপনার কাছে আমি লোক পাঠাচ্ছিলুম, এসেছেন ভালই হয়েছে; টাকাগুলো আমাকে চুকিয়ে দিতে হবে—পনেরো দিনের মধ্যে

চক্রবর্ত্তী অবাক্! তিনি আসিয়াছেন, গুপ্তকথা কেন ব্যক্ত হইয়াছে—তাহা জানিতে, উকীলের চিঠির কি জবাব দেওয়া যাইবে, তাহার যুক্তি লইতে!—কিন্তু আসিতে না আসিতে পাতিরামের মুখে এ কি কথা! সে ত তাগাদা করিবার পাত্র নয়, টাকা লইবার কথা ছিল, মাসে মাসে সুদ দিয়া গেলেই চলিবে, আসলের জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। সুদ ত ফেলেন নাই; তবে?

উকীলের চিঠি দেখিয়াই পাতিরামের মুখে ভাতিল নিষ্ঠুর হাসি পরক্ষণেই যেন অগ্নিগর্ভ বোমা ফাটিয়া গেল! চীৎকারে খোলার ঝণঝণা তুলিয়া হাঁকিল,—জোচ্চোর, পাজী, বজ্জাত! জোচ্চুরি আর যায়গা পাওনি! আমার কাছে জমী বন্ধক রেখে, সে কথা ভাঁড়িয়ে জমী বেচেছে অপরকে! এত বড় বুকের পাটা! তোমাকে যদি না আমি জেল খাটাই, আমার নাম পাতিরাম পাকড়ে নয়!

ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গ তখন ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছে! এত

অপমান এ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে কখনও করিতে পারে নাই। অতি কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিয়া তিনি কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—তুমি কি আজ নতুন হয়ে এলে, পাতিরাম! তোমার মুখে এ কথা শুনব, আমি কখনো প্রত্যাশা করিনি! বিনা অপরাধে তুমি আমাকে চোর ছ্যাঁচড়ের মতন অপমান করলে! বন্ধকী জমী আমি বিক্রয় করেছি সত্য, কিন্তু তুমিই কি আমাকে এ কার্য্যে প্ররোচিত করনি?

বোমা এবার ফাটিয়া চৌচির! হাত-মুখ খেঁচিয়া, কণ্ঠে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া পাতিরাম তারস্বরে গর্জ্জন করিল,—কি, মিথ্যাবাদী! আমি তোমাকে জুচ্চুরী করিতে বলেছি? আমার কাছে যে জমী তুমি বন্ধক রেখেছ, জোচ্চোর! আমি তোমাকে তা বিক্রী করতে বলেছি? আমার নিজের মাথা খানা তোমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আমি যোড়-হাত ক'রে সেধেছিলুম তোমাকে—দয়া ক'রে কুড়ুল চালাও ধর্ম্মাবতার!

ব্রাহ্মণের দুই চক্ষু ছাপাইয়া তখন অশ্রুর বন্যা ছুটিয়াছে! আর্ত্তস্বরে তিনি কহিলেন,—তোমার মত আমি ত চীৎকার করিতে পারব না বাবা, সে শক্তি আমার নেই! তর্কও তোমার সঙ্গে আমি করব না, মা ব্রহ্মময়ী তোমার আমার সে দিনের কথা শুনেছেন আজও শুনছেন। এখন তোমার কি হুকুম, তাই বল! আমি যখন তোমার কাছে ঋণী, যে কারণেই হোক, বন্ধকী সম্পত্তি যখন বিক্রয় করেছি, তখন অবশ্যই আমি অপরাধী। এখন কি তুমি আমাকে করতে বল?

পাতিরাম সুর এবার অপেক্ষাকৃত নরম করিয়া কহিল,—আমার যা বলবার, প্রথমেই তা বলেছি। পনের দিনের মধ্যে যদি আমি

সমস্ত টাকা বুঝে না পাই, তা' হ'লে ষোল দিনের দিন দেওয়ানী ফৌজদারী দু'দফা মামলাই আমাকে একসঙ্গে জুড়তে হবে।

একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন,—মা ব্রহ্মময়ীর যা ইচ্ছা, তাই হবে!

পাতিরামের ব্যবহার ও মিথ্যাচার নিষ্ঠাবান্ সরল ব্রাহ্মণের বুকে শেলের আঘাতের মত বাজিয়াছিল। এই অদ্ভুত মানুষটির ঋণপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি সর্ব্বস্ব পণ করিলেন এবং পনের দিনের মধ্যেই তাঁহার ভদ্রাসন ও অবশিষ্ট সম্পত্তি বন্ধকের পরিমিত টাকাতে বিক্রয় করিয়া অঋণী হইলেন। যে ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে কিয়দংশ সম্পত্তি পৌনে নয় শত টাকায় কিনিয়াছিল, সে-ই ব্রাহ্মণকে বিপদাপন্ন দেখিয়া ছয় হাজার টাকার সম্পত্তি তিন হাজারে ক্রয় করিল।

রেজেষ্টারী আফিসে টাকা উশুল করিতে গিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত পাতিরামের যখন চোখোচোখি হইল, পাতিরাম ওষ্ঠপ্রান্তে যে হাসি টানিয়া ব্যঙ্গের সুরে কহিল,—মিছেই মা ব্রহ্মময়ীকে ডেকেছিলে ঠাকুর,—শেষ-রক্ষাটা তার সাধ্যে কুলোলো না!

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মুখ ফিরাইয়া লইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। সায়াহ্নে বাসায় ফিরিয়া মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সাশ্রুনয়নে আর্ত্তস্বরে কহিলেন,—মা ব্রহ্মময়ি! সর্ব্বহারা হয়ে তোর দ্বারকেই সার করা হল,—শেষরক্ষা তোরই হাতে।

৫
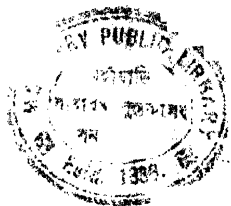
মাছের ব্যবসায়ে সমব্যবসায়ীদিগকে পিছনে ফেলিয়া পাতিরাম এত উঁচুতে উঠিয়া গেল যে, তাহার নাগাল পাওয়াও অন্যের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

পাতিরামের উন্নতি দেখিয়া যদি কোনও নূতন কর্ম্মী হাবড়ার মেছোহাটায় তাহার অদৃষ্ট তরণী ভিড়াইতে চাহিত, সঙ্গে সঙ্গেই পাতিরামের সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থায় আবর্ত্তের পর আবর্ত্তের সংঘাতে তরী তীরে লাগিতে না লাগিতেই খানচাল হইয়া যাইত। বাজারের প্রত্যেক পাইকারটি পাতিরামের খাতক, তাহার কাছে সকলেরই টিকি বাঁধা; পাতিরামের নির্দ্দেশেই বাজারের দর উঠা-নামা করে; সুতরাং কাহার সাধ্য তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া যাইবে?

সেদিন পাতিরাম আড়তের কায সারিয়া উঠি উঠি করিতেছে, এমন সময় আড়তের সামনেই বড় রাস্তার উপর একখানি ঘুড়ি আসিয়া থামিল। গাড়ীর পিছনে উর্দ্দীপরা সহিস দাঁড়াইয়াছিল; গাড়ী থামিতেই তাড়াতাড়ি নামিয়া দরোজা খুলিয়া দিল। গাড়ীর ভিতর হইতে ছাব্বিশ সাতাশ বৎসরের এক যুবা ধীরে ধীরে নামিয়া, আড়তের যে অংশে সুবৃহৎ ও সুউচ্চ এক তক্তপোষের উপর পাতিরাম পাকড়ে বসিয়াছিল—সেই দিকেই অগ্রসর হইল। চেহারাটি তাহার ছিপ ছিপে পাতলা, গায়ের রঙ বেশ ফরসা, গোঁফের দুই প্রান্ত ছাঁটা এবং যেটুকু আছে, তাহাও

কর্টা। একটি চক্ষু ঈষৎ টেরা, গায়ে চুনট করা আদ্দির পাঞ্জাবী, তাহার উপর জরির আঁচলাদার মিহি সুতির চাদর কায়দা করিয়া ফেলা; পায়ে দামী পাম্প-সু, হাতে সৌখীন ছড়ি, তাহার মাথাটি সোনার পাত দিয়া মোড়া।

তক্তপোষটির প্রায় কাছে আসিয়াই আগন্তুক পাতিরামের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—চিনতে পারছিস্ পাকড়ে?

আসেপাশে সাতজন কর্ম্মচারী ও দশ বারটি কুলি উপস্থিত ছিল, তাহাদের রাসভারী মনিবটিকে লক্ষ্য করিয়া একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে এই-ভাবে প্রশ্ন করিতে দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। পাতিরাম সম্ভবতঃ মনের ভাবটুকু মুখের ভঙ্গীতে প্রকাশ হইতে না দিয়া কৃত্রিম বিনয়ের সহিত কহিল,—আজ্ঞে, চেহারাটা আপনার চেনা চেনা মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু ঠিক ঠাহর করতে পারছি না—আপনি কোন্ রাজার ছেলে; কাসীমপুরের না, আজীমগড়ের?

প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া আগন্তুকের সুন্দর মুখখানা সহসা যেন কালো হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি না দমিয়া বিদ্রূপের সুরে পাল্টা আঘাত দিবার অভিপ্রায়েই কহিল,—তা হলে যা শুনেছিলুম, মিছে নয় দেখছি আঙুলি ফুলে কলাগাছ হয়েছিস্ কি না, তাই চেনালোককে চিনতে চাস্ না। ছোটলোক কি আর গাছে ফলে!

পাতিরাম ধীরভাবে পূর্ব্বের সুরটুকুর অনুসরণ করিয়াই কহিল,—আজ্ঞে না, ছোট লোক গাছেও ফলে না, চেহারা আর কাপড় চোপড়ে চাপাও থাকে না, আপনি এসেই জানিয়ে দেয়।

আগন্তুক কথাটা গায়ে না মাখিয়াই সুর একটু নরম করিয়া

কহিল,—টালার ইস্কুলে এক ক্লাসে পড়া, ছেলেবেলার গরীবানি হাল—বড় হলেও ভদ্দর লোকে মনে রাখে, ভুলে যায় না।

পাতিরাম কহিল,—ঠিক কথাই আপনি বলেছেন। আর আমি যে তা ভুলিনি, আমার পেশা আর পোষাক তার সাক্ষী দিচ্ছে। আমি যে গরীবের ছেলে, আমার মা যে মাথায় মাছের বোঝা চাপিয়ে বাড়ী বাড়ী ফিরি করে বেচে আমাকে মানুষ করেছে, প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যে দুটি বেলাই তা মনে করি। কিন্তু, আপনার বাপ-মা না হোক, পিতামহ যে ক্ষুর-বাটি নিয়ে লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে চুল-নোখ কেটে খেউরী করে দিত—আপনি সেটা ভাবতে পারেন?

ভদ্রলোক এবার ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া হুঙ্কার তুলিল,—সাট্ আফ! জান, আমি ইচ্ছে করলে চাল কেটে তোমাকে ভীটে ছাড়া করতে পারি?

পাতিরাম হাসিয়া কহিল—যেহেতু আপনার মামা সৃষ্টি দাস নিকিরি, পাড়ার জমিদার—তাই? কিন্তু এটা যদি সত্যই সম্ভব হয়, তাহলে, ঐ যে বড় বড় প্যাকিং বাক্স দেখছেন, ওরই একটার ভেতরে আপনাকে ভরে বরফ দিয়ে এঁটে আপনার মামার সেরেস্তায় পাঠানো আমার পক্ষেও অসম্ভব নয়!

আগন্তুক এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসির বেগ থামিলে সে তাহার বক্র চক্ষুটির দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ করিয়া পাতিরামের মুখে নিবদ্ধ করিল, তাহাতে কিন্তু হাসির কোন চিহ্নই ছিল না; তাহারপর কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়াই কহিল,—ছেলেবেলার সে বুনো স্বভাব তোর ঠিকই আছে দেখছি, ঠাট্টাও বুঝিস্ না; এতে কেমন করে যে ব্যবসা

চালিয়ে ভাগ্য ফিরিয়েছিস্, সেইটি আশ্চর্য্য! যাক্, আমি একটা কাযের কথা নিয়েই এসেছিলুম।

পাতিরামের মুখে পরিবর্ত্তনের কোনও চিহ্নই দেখা গেল না, পূর্ব্বের মতই সে অবিচলিত কণ্ঠে কহিল,—কাষটা কি?

আগন্তুক কহিল,—আমিও তোর মতন মাছের কারবার করব, ঠিক করেছি। তাই জানতে এসেছি, এতে সুবিধে হবে কি না?

পাতিরাম কহিল,—মোটেই না।

মুখখানি অপ্রসন্ন করিয়া আগন্তুক পুনরায় প্রশ্ন করিল,—কেন' তোর যদি এই কারবারে সুবিধা হতে পারে, আমার না হবার কি কারণ'

পাতিরাম গম্ভীর হইয়া এবার উত্তর দিল,—আপনার সুবিধার পথে বিশেষ বাধা আছে তাই।

আগন্তুক আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করিল,—ধারাটা কি? সেটা বি সরাতে পারা যায় না?

পাতিরাম কণ্ঠস্বর এবার দৃঢ় করিয়া উত্তর দিল,—যায়; যদি আপনার বাড়ীর মেয়েদের মাথায় মাছের টুকরী চাপিয়ে বিক্রীর ব্যবস্থ করতে পারেন।

দুই চক্ষু পাকাইয়া আগন্তুক এবার, তর্জ্জনের সুরে কহিল,—ঠাট্টা একটা মাপ আছে পাকড়ে।

পাতিরাম কহিল,—এ ঠাট্টা নয়, খাঁটি কথা, তবে শুনতে তেতে বটে।

আগন্তুক জানিতে চাহিল,—বাড়ীর মেয়েদের কথা এতে তুই তুলি কেন? লোক রাখবার ক্ষমতা কি আমার নেই?

পাতিরাম উত্তর দিল,—থাকলেও মাছ সব পচবে।

আগন্তুক উষ্ণ হইয়া কহিল,—যে লোক লাখ টাকা নিয়ে নামবে, সে মনোপালী বিজনেস করবে—সেই মত ব্যবস্থাও হবে।

পাতিরাম কহিল,—হতে পারে, কিন্তু যাদের নিয়ে বিজনেস, তারা কেউ আপনার মাছ ছোবেও না। পরামর্শ নিতে এসেছেন বললেন, তাই স্পষ্ট কথাই বললুম ; এখন আপনার যা খুসী।

আগন্তুক তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন,—এ হচ্ছে তোমার জেলাসী।

পাতিরাম হাসিমুখে এবারও কহিল,—না, এ আমাদের জাতের পলিসি।

—আচ্ছা আমি দেখে নেব তোদের এ পলিসি আমি ভাঙ্গতে পারি কি না! তুই যেমন পাতিরাম পাকড়ে, আমিও তেমনি কৃত্তিবাস কোলে। কালই সকালের এক্সপ্রেসে ভাগলপুর থেকে আমার পঞ্চাশ মণ মাছ আসছে, দেখি তুই কি করে ঠেকাস, আর তোর জাতের লোককে রুখে সে মাছ পচাস!

কথার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি চলিয়া গেল। পাতিরাম চুপ করিয়াই তাহার কথাগুলি শুনিল ; কোনও উত্তর দিল না। আর তাহার লোক-গুলির মধ্যে এমন দুঃসাহসী কেহই ছিল না যে, এ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন মুখ ফুটাইয়া তাহাকে কেহ করে।

বাল্যকালে পতিরাম যখন টালার ইংরাজী স্কুলে পড়িত, সেই সময় যে কয়টি বড়লোকের ছেলের সহিত তাহার মোটেই বনিবনাও হইত না এবং অতি সন্তর্পণেই সে যাহাদিগকে এড়াইয়া চলিত, এই কৃত্তিবাস কোলে তাহাদেরই অন্যতম।

পাত্তিরামের দারিদ্র্য এবং তাহা সত্ত্বেও তাহার মনের দৃঢ়তা, নিজের অবস্থাতেই তুষ্ট থাকিয়া ইহাদিগের অর্থগত প্রভাবকে উপেক্ষা করিবার চেষ্টা এবং এই সূত্রে কথায় কথায় বিরোধ বা মনোমালিন্য—এতকাল পরেও কোন পক্ষই ভুলিতে পারে নাই। পাত্তিরাম পাকড়ের প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়াই কৃত্তিবাস যেমন মেছোহাটায় তাহার সহিত 'ভেট' করিতে আসিয়াছিল, পাত্তিরামও তেমনই তাহাকে দেখিবামাত্রই চিনিয়াছিল প্রায় বারো বৎসর পরে বাল্যকালের সেই দাম্ভিক সহপাঠীটিকে তাহার পর্ণশালায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া হয় ত সে অন্য ভাবেই তাহাকে গ্রহণ করিত, কিন্তু কৃত্তিবাসের বেশভূষার প্রাচুর্য্য, আভিজাত্যের গর্ব্ব ও কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিয়াই সে মনে মনে জ্বলিয়া গিয়াছিল এবং তৎক্ষণাৎ বারো বৎসর পূর্ব্বের যে সব অবাঞ্ছিত ঘটনা এই দাম্ভিক ছেলেটিকে কেন্দ্র করিয়া টালার বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইত, ছবির মত একটি একটি করিয়া তাহার মানস-পটে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। এক্ষেত্রে সহপাঠীর নিকট নিজেকে প্রকাশ করা বা মন খুলিয়া কথা বলা পাত্তিরামের প্রকৃতি বিরুদ্ধ; সুতরাং যে ভাবে সে কৃত্তিবাসের সহিত আলাপ করিল, তাহা শুধু তাহার পক্ষেই সম্ভব।

পরদিনই কৃত্তিবাসের মাছ আসিয়া হাটের একটা অংশ দখল করিয়া বসিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, কোনও আড়তদার সে দিকে ঝুঁকিল না, একটি পাইকারও তাহার ত্রিসীমায় ঘেঁসিল না। পঞ্চাশ মণ না হৌক, প্রায় ত্রিশ মণ মাছ বাক্সবন্দী হইয়া মাছের বাজারে উঠিয়াছিল এবং পূর্ব্বদিনের মতই কৃত্তিবাস জুড়ী চড়িয়া এই বাজারে তাহার নূতন ব্যবসায়ের খবরদারী করিতে আসিয়াছিল।

কিন্তু বাজারের কল-কাঠিটি অদৃশ্য হস্তে এমনই আশ্চর্য্য ভাবেই 'পিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, কৃত্তিবাসের অত মাছ গাদা হইয়া পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও, কেহ কোন প্রশ্নই সে সম্বন্ধে করিল না। বেলা ক্রমশঃ বাড়িতে, কৃত্তিবাসের চৈতন্য হইল, সে তখন পাতিরামকে বাদ দিয়া, হাটের অন্যান্য আড়তদারদিগকে ধরিল, বেশী কমিসনের লোভ দেখাইয়া তাহার চালানের মাছগুলির বিলি বন্দোবস্ত করিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। কিন্তু তাহাকে সকলেই একবাক্যে জানাইল,—কাকে আমরা বিলি বন্দোবস্ত করব বলুন! এখানকার মাছ যারা কেনে, তারা কেউ আপনার মাছ ছোঁবে না। আপনি, পাতিরাম বাবুকে ধরুন।

বাবু! বিরক্ত মুখখানা রীতিমত বিকৃত করিয়া কৃত্তিবাস কহিল,—পাতিরাম পাকড়ে মেছো হাটায় এসে বাবু হয়েছে বটে! বন গাঁয়ে শিয়াল রাজা! এই চামচিকের খোসামোদ করবে হার্ডোয়ার মার্চেণ্ট কেলি কোম্পানীর মালিক কৃত্তিবাস? না হয়, মাছগুলো গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যাব।

জনৈক আড়তদার কহিল,—আজ্ঞে, তাতেও ঝঞ্ঝাট আছে।

—তার মানে?

—আজ্ঞে, মানে এই—মাছগুলো যদি দুপুরের এপারে ফেলবার ব্যবস্থা না করেন, ধরুন—কুলিরা যদি ও মাছ না ছোঁয়, তখন কর্পোরেসনকেই এর তদ্বির করতে হবে। তাতে খরচা ত আছেই, জরিমানার দিক দিয়েও পঞ্চাশটি টাকা দণ্ড দিতে হবে।

কৃত্তিবাস বুঝিল, সমস্তই পাতিরামের ষড়যন্ত্রের ফল। সেইই উদ্যোগী হইয়া তাহাকে বয়কট করিয়াছে, পাছে এই ব্যবসায়ে হাত দিয়া সে

তাহার রোজগারে ভাগ বসায়—এই আশঙ্কায়। কিন্তু সেও ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বসিল, কিছুতেই সে পাতিরামের দ্বারস্থ হইবে না এবং এই বাজারে প্রতিষ্ঠালাভের সঙ্কল্পও ছাড়িবে না। প্রথম দিন না হয় সে ঠকিল, কিন্তু পরে সে দেখিয়া লইবে :

কিন্তু কৃত্তিবাস গোড়া হইতেই এখানকার হিসাবে ভুল করিয়া বসিয়াছিল ; এবং এই ভুলের পথেই সে তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ দম্ভের সহিত অগ্রসর হইতে চাহিল। তাহার ফলে, নানাপ্রকার চেষ্টা যত্ন করিয়াও অবশেষে তাহাকে হাল ছাড়িয়া দিতে হইল। তখন সে এ বাজারে কৌতূহলোদ্দীপক প্রহসনের পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার পৈতৃক হার্ডোয়ারী কারবারের প্রায় হাজার দশেক টাকা মাছের সহিত মাটি হইয়া গিয়াছে।

যে দিন শুনা গেল, কৃত্তিবাস তাহার ব্যবসায়ের জাল গুটাইয়াছে এবং রীতিমত আক্কেল-সেলামী দিয়া এ বাজার হইতে বিদায় লইতে উদ্যত হইয়াছে, সেই দিন পাতিরাম নিজেই উপযাচক হইয়া কৃত্তিবাসকে ডাকিয়া কহিল,—শোনো, কথা আছে।

এদিন কৃত্তিবাসের চেহারায় সে দম্ভের চিহ্ন ছিল না, পোষাক-পরিচ্ছদেও পূর্ব্বের মত আড়ম্বর নাই. এবং আজ সে জুড়ী ছাড়িয়া রিক্সায় চড়িয়া আসিয়াছিল। পাতিরাম এই ব্যাপারে যতই নির্লিপ্ত থাকিবার বা এই মানুষটিকে উপেক্ষা করিবার ভাবভঙ্গী দেখাক না কেন, কিন্তু অপ্রকাশ্যে সে যে ইহার উপর নিপুণ লক্ষ্য রাখিয়াছিল, তাহার সন্ধান তাহার অতি বিশ্বাসভাজন গোয়েন্দা ভিন্ন অন্য কেহই জানিত না।

আজ পাতিরামের আহ্বান পাইয়া কৃত্তিবাস মুখখানি ম্লান করিয়া তাহার তক্তপোষটির ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

পাতিরাম স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল,—বোসো কৃত্তিবাস।

কৃত্তিবাস বসিল। তাহার মুখখানি অতিশয় ম্লান, বক্র চক্ষুটিও দীপ্তিশূন্য, বিদ্রূপের সেই প্রখর প্রভা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

পাতিরাম কহিল,—সে দিন যদি এই ভাবে এসে দেখা করতে বা পরামর্শ চাইতে, তাহলে এ দুর্গতি তোমার হ'ত না কৃত্তি।

কৃত্তিবাস কহিল,—অদৃষ্ট!

পাতিরাম কহিল,—টালার হাইস্কুলে পড়ার কথা সেদিন বলছিলে না? সে সময় তুমি আর রাধু ছিলে বড়দলের চাঁই। আমি গরীবের ছেলে, আমার মা মাছ বেচে আমাকে পড়ায়, এই নিয়ে কত খোঁটাই তোমরা দিতে, আমাকে জব্দ করতে কত চেষ্টাই করেছ, কিন্তু একটি দিনের তরেও কাবু আমাকে করতে পারোনি কিছুতেই; বল—কোনো দিন আমাকে নীচু হতে দেখেছ তোমাদের কাছে?

কৃত্তিবাস চুপ করিয়া রহিল, কোনও উত্তর দিল না। বুঝি পাতিরাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া তাহার অন্তরের ভাষাটুকু পড়িয়া লইল। পরক্ষণেই সে কহিল,—রাধুর বাবা জমিদার, মস্ত লোক; তোমার বাবা মার্চেণ্ট—তোমার মামাদের দৌলতে ভাগ্যবান। তোমাদের তুলনায় আমি ছিলুম নিতান্ত গরীব, তোমাদের দৃষ্টিতে আমি তখন সব দিক দিয়েই ছোট; কিন্তু আমার মনের ভেতরে তখন কি হত জান? জোর করে আমি কি ভাবতুম শুনবে? নিজের

চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আমি একদিন বড় হবই; আর যারা বাপ-পিতেমোর পয়সার জোরে বড় ব'লে বড়াই করে—তাদের আমি যেমন করে হোক দাবিয়ে দেবই! সেই সাধনা আমার চলেছে বুঝলে?

কৃত্তিবাস একটা ঢোঁক গিলিয়া আস্তে আস্তে কহিল,—বুঝেছি কিন্তু হঠাৎ তোমার মনের চাকাখানা ঘুরে গেল কেন, অর্থাৎ যাকে কায়দা করে ডুবিয়ে দিলে, তাকেই আবার কি মতলবে ডেকে কাছে বসালে, সেইটিই বুঝতে পারছি না।

পাতিরাম সহজ কণ্ঠেই কহিল,—বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি এখুনি, আর এটা বুঝিয়ে দেবার জন্যই তোমাকে ডেকেছি। আজ তোমাকে জুড়ী ছেড়ে রিক্সায় চড়ে আসতে দেখেই বুঝিছি, রাধুর পীরিত চটবার দাখিল হয়েছে।

—কি ভেবে একথা তুমি বলছ?

—বরাবর রাধুর জুড়ী চেপে এসেছ, আজ আর সে জুড়ী পাঠায় নি, এতেই বুঝতে পেরেছি জোড়ে ঘা পড়েছে।

কৃত্তিবাস স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পাতিরামের প্রতিভা—প্রদীপ্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিল!

পাতিরাম সে দৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়াই আপন মনে কহিল,—তোমার হাল সবই আমি জেনে ফেলিছি।

কৃত্তিবাস কহিল,—তুমি যখন এ বাজারের হর্তাকর্তা বিধাতা এখানকার হাল আমার জানবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

পাতিরাম কহিল,—এখানকার তোমার হাল ত একটা জুয়াড়ী

কুলী পর্য্যন্ত জানে। এ জানায় আর বাহদুরী কি! আমি বলছি, তোমার ও দিক্‌কার হাল—ক্লাইভ ষ্ট্রীট বাজারের গো!

কৃত্তিবাস চমকিত হইয়া কহিল,—মাছের বাজারে বসে, তুমি ক্লাইভ ষ্ট্রীটের খবরও রাখ নাকি?

পাতিরাম কহিল,—রাখতে হয়েছে তোমার জন্যই যে! শুনবে?

কৃত্তিবাস মনের ভাব গোপন করিয়া কহিল,—বেশ চলে যাও; তোমার ক্ষমতাটাই দেখি।

অতঃপর পাতিরাম একটি একটি করিয়া সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টভাবে কৃত্তিবাসকে যে সকল কথা শুনানইয়া দিল, তাহার মোটামুটি মর্ম্ম এইরূপ, —বাপের কারবারটি হাতে পাইয়া কৃত্তিবাস তাহার দফা রফা করিয়া আসিয়াছে। বাহিরের ঠাটখানি শুধু বজায় আছে, ভিতরটা ফোঁকরা। এই অবস্থায় ভাগ্য ফিরাইবার অভিপ্রায়ে তাহার প্রিয় বন্ধু রাধু—ওরফে টালার বেনেদী জমিদার ও ব্যবসায়ী সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র রাধানাথের সহিত মাছের কারবারে ঝুঁকিয়া পড়ে। রাধানাথ বাবুত আর এই ইতর কারবারে প্রকাশ্যে নামিতে পারেন না, অথচ এই কারবারের ভিতর দিয়াই তাহাদের বাল্য জীবনে নিতান্ত ঘৃণ্য ও অবহেলার পাত্র পাতিরাম পাকড়ে লক্ষপতি হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং এমন সুযোগ পরিত্যাগ করাও চলে না; তাই দুই বন্ধুর পূর্ণোদ্যমে এই পথে অভিযান। রাধানাথ বাবু আড়ালে থাকিয়া বন্ধু কৃত্তিবাসকেই আগাইয়া দেন। কিন্তু একটি মাসের মধ্যেই যখন দশটি হাজার টাকা মাটী হইয়া গেল, তখন দুই বন্ধুর বন্ধুত্বেও ভাটা পড়িল। টাকাটা রাধানাথই দিয়েছিল! কিন্তু কৃত্তিবাসের এখন সসেমীরে অবস্থা।

কোথা হইতে টাকা দিবে! তাই স্থির হইয়াছে, তাহার কারবারে যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তৎসহ গুডউইলটা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া দিয়া তাহার অংশের লোকসানের পাঁচ হাজার টাকার দেনা হইতে রেহাই পাইবে।

সমস্ত ব্যাপারটি সঠিক শুনিয়া কৃত্তিবাস স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ বসিয় রহিল। তাহার পর অভিভূতের মত সে প্রশ্ন করিল,—তুমি কি জ্যোতিষ জান?

পাতিরাম কহিল,—কারবার করতে বসলে শুধু বাটপাড় হলে কি চলে বন্ধু, সব ব্যাপারেই ঝুনো ওস্তাদ হতে হয়। যাক্, এখন আমার কথা শোন, আমা হতেই যখন তোমার এতটা লোকসান হল, আমি সেটা অন্য দিক দিয়ে তোমার উসুল করে দিতে চাই।

কৃত্তিবাস শুষ্ককণ্ঠে কহিল,—বল।

পাতিরাম কহিল,—আমি যদি জানতুম, সত্যিই তুমি রাধুবাবুর মত তালেবর লোক, দু-দশ হাজার জলে পড়লেও গায়ে লাগবে না তাহলে চুপ করেই থাকতুম। কিন্তু এখন বুঝছি, সত্যি সত্যিই তুমি সর্ব্বস্বান্ত হতে বসেছ। সামান্য পাঁচটি হাজার টাকার মায়া রাধুবা কাটাতে পারলে না। কারবারটা তার দরুণ কেড়ে নিচ্ছে—আরে ছ্যা–

কৃত্তিবাস কহিল,—কেড়ে নেবে কেন, আমি নিজেই দিচ্ছি।

পাতিরাম কহিল,—ও, একই কথা। তার চেয়ে আমি বলি কি টাকাটা তুমি বরং ওকে ফেলে দাও; কারবারটাকে ছেড়ে দিও না।

কৃত্তিবাস কহিল,—ও কারবার আমি রাখব না, যার কিছু বুঝি না, লোহা-লক্কড় নিয়ে যেখানে ঝামেলা, তাতে আমার মাথা ভাবে

খলে না। লোহা থেকে কখনো রস বেরোয়? সেইজন্যই আমি রাধুর প্রস্তাবে সায় দিয়েছি।

পাতিরাম কহিল,—তাহলে এক কায করো, কারবারটা তুমি মাকেই বেচে ফেলো। আমি তোমাকে তার জন্য দশ হাজার াকা দিচ্ছি। তুমি তা থেকে রাধু বাবুর পাঁচ হাজার চুকিয়ে দাও। াকি পাঁচ হাজার নিয়ে অন্য কোন কায কর।

কৃত্তিবাস মনের আনন্দ মনেই চাপিয়া কহিল,—বল কি! এ কথা সত্য?

পাতিরাম মুখখানা কঠিন করিয়া কহিল, তুমি কি ভেবেছ, আমি তোমার এই অবস্থায় তোমার সঙ্গে চালাকী করছি? আমার একটা অভ্যাস কি জান, কথা বেশী বাড়াই না; কিন্তু যে কথা বলি, তার নড়চড় হয় না। ইচ্ছা করলে, আজই তুমি রেজেষ্টারী করতে পারো।

কৃত্তিবাস কহিল,—কিন্তু খানকতক টেবিল, চেয়ার, সোফা, আলমারী, গাড়ীখানেক খাতা আর কতকগুলো লোহা-লক্কর—এই আমার অ্যাসেট; এই গুলোর জন্য তুমি দশ হাজার টাকা দাম দেবে?

পাতিরাম কহিল,—গুড উইলত আছে; যদিও সেটাকে তুমি ঘেয়ো করে ফেলেছ, কিন্তু সে ঘা সারাবার মত দাওয়াই আমায় জানা আছে। তাই না কোমর বেঁধেছি। তুমি তৈরী হও, আমি তৈরী।

# আট

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতা, ও সহরতলীর যে সকল স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বিত্তশালী ভূস্বামী বারো মাসে তের পার্ব্বণের উৎসব সাড়ম্বরে সম্পন্ন করিয়াও বহুজনের আশ্রয় ও অন্নদাতারূপে প্রভাব-প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়াছিলেন, টালার সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

বারাসত অঞ্চলের সুবিস্তৃত জমিদারী, ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের বিশাল কলিয়ারী এবং উডমণ্ড ষ্ট্রীটের হার্ডওয়ারী সুবৃহৎ ব্যবসায় পুরুষানুক্রমে মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের অবলম্বন স্বরূপ হইয়া বিপুল বিত্ত, ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তির ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিল।

আমরা যে সময়ের কথা লইয়া এই আখ্যায়িকা আরম্ভ করিয়াছি তখন ক্ষণজন্মা সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ম্মময় জীবনের সায়াহ্নকাল উপস্থিত।

বাহিরের সুপ্রশস্ত বৈঠকঘরে নীচু পাটাতনের উপর ঢালা বিছানা বাহার, তাহার উপরে চারিধারে বিশ বাইশটি সাদা ধবধবে ওয়াড় দেওয়া তাকিয়া। মধ্যস্থলে একখানা বিশাল বাঘছাল আবৃত; তাহার উপর সুদীর্ঘ দেহযষ্টি ঋজু করিয়া যোগীর মত ভঙ্গীতে বসিয়াছিলেন সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়। যাত্রার দলের ভীষ্মের মত তাঁহার পরিপাটি সুপুষ্ট গোঁফযোড়াটি স্ফীত এবং বশিষ্ঠের ন্যায় চামরধবল শ্মশ্রুরাজি নাভি দেশ পর্য্যন্ত বিসারিত; পরিপুষ্ট দেহের ত্বকে এখনও তপ্ত কাঞ্চনের

াভা, কোথাও ঈষৎ লোল বা কুঞ্চিত হয় নাই। গুম্ফ ও শ্মশ্রুর
রিপক্কতাই প্রতিপন্ন করিতেছিল যে, তিনি অশীতিপর; নতুবা
দৃঢ়তা বা বাঁধুনির দিক দিয়া বয়ঃক্রম নির্ণয়ের সম্ভাবনা
ছিল না।

ব্রহ্মণ্য মর্য্যাদা, আভিজাত্য ও আচারগত নিষ্ঠায় মুখোপাধ্যায়
াশয়ের অতিরিক্ত রক্ষণশীলতা সময় সময় ব্যক্তিবিশেষকে ক্ষুব্ধ করিয়া
তুলিত, কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না; বরং দৃঢ়তার
হিত ব্যক্ত করিতেন—এই ক্ষমতাটুকু বরাবর সমানভাবে রাখতে
পরেছি বলেই এখনো আমি এ অঞ্চলে সমাজপতি; যে যতই কেরামতী
আমার কাছে তাকে মাথা নীচু করতে হবেই।

পূজাপাঠ সারিয়া সকালের দিকে কর্ত্তা যখন বৈঠকখানায় আসিয়া
সেন, সারা বাহির মহল তখন সশব্যস্ত হইয়া উঠে। গল্পগুজব
ালোচনার নিবৃত্তি হয়, হাতের কাযে কর্ম্মচারীদের মনোযোগের
থাকে না।

কর্ত্তার উপস্থিতিতে বহির্মহল যখন নিস্তব্ধ, সেই সময় সহসা বাহিরের
থা কাঁপাইয়া একখানা বাড়ীর গাড়ী বিশাল দেউড়ীর সম্মুখে আসিয়া
। কর্ত্তা তখন একাকী যথাস্থানে বসিয়া নিবিষ্টমনে রুদ্রাক্ষ-
ালার সহায়তায় ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন। গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর
দের সহিত পথচারীকে সতর্ক করিতে, চালকের পদপৃষ্ঠ ঘণ্টির ঘন ঘন
নি মিলিত হইয়া কর্ত্তার নিবিষ্টতা শিথিল করিয়া দিল।

অল্পক্ষণ পরেই বৈঠকখানায় ভৃত্যের কুণ্ঠিতভাবে প্রবেশ। কর্ত্তা প্রশ্ন
রলেন,—কে এল রে?

ভৃত্য এই বার্ত্তা লইয়াই আসিয়াছিল। কহিল,—নিকিরিপাড়া পাতিরাম পাকড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তার দুইচক্ষু বিস্ফারিত হইতে দেখা গেল, ওষ্ঠের উপ স্থূল গোঁফজোড়াটিও স্ফীত হইয়া উঠিল। প্রশ্ন হইল,—ক্রপর বো পতা, সে এসেছে জুড়ি-চেপে আমার বাড়ীতে!

ভৃত্য করযোড়ে জানাইল,—হুজুরের কাছেই তেনার বরাত।

গম্ভীরভাবে হুজুর হুকুম দিলেন,—আসতে বল্।

কয়েক মিনিট পরেই যে আসিল, এইমাত্র ভৃত্য তাহার পরি দিয়াছিল তাই, নতুবা, হুজুরও বোধ হয় আগন্তুকের বসনভূষণে অতিরিক্ত আড়ম্বরে প্রথম দর্শনেই ভুল করিয়া বসিতেন যে, চাট অথবা অহমদেশের কোনও খেতাবধারী রাজা বা রাও তাঁহার বৈঠ খানায় উপস্থিত। গায়ে তাহার ফরাসীদেশীয় দামী ক্রেপ্ সিল্কের সোনা রঙের পাঞ্জাবী, স্থান বিশেষে তাহাতে জরীর কায এবং গলার বোতামগু আসলই হউক বা টেটস্ ডায়মণ্ড কোম্পানীর ভাণ্ডার হইতে আম জরীখচিত ঘরগুলির ভিতর বসিয়া হীরার মতই ঝকমক করিতেছিল পরনে ছিল জরীপাড় ঢাকাই ধুতি, পাঞ্জাবীর উপর সদ্য পাটভা জরীদার বেনারসী একলাই চাদর,—তাহার উভয় কিনারায় অর্দ্ধ পরিমিত জরীখচিত মীনার নক্সী কারুকার্য্য; চাদর খানির এই চ চমৎকারী আঁচলাদুইটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন কায়দাতে তাহা কাঁধের দুই ধারে ফেলা হইয়াছে। এইখানেই পরিচ্ছদ পারিপাট সমাপ্তি নয়, ইহার উপর বাহার দিয়াছে প্রায় বাইশভরি ওজনের একছ মোটা গার্ড চেন এবং দুই হাতের দশটি অঙ্গুলীর মধ্যে আটটি বিভি

র্ণের প্রস্তরখচিত স্বর্ণাঙ্গুরী। আগন্তুকের পরিচয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভৃত্যের মুখে আমরা আগেই পাইয়াছি।—
কাতার প্রান্তবর্ত্তী নিকিরি পাড়ার আধুনিক ধনী—পাতিরাম াকড়ে!

পাতিরাম ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই দুইহাতের অঙ্গুরীখচিত অঙ্গুলীগুলি করিয়া ললাটের দিকে তুলিল; অবশ্য ব্যবধান রহিল একটি বিঘতেরও বেশী। পূজ্যের উদ্দেশে নতি প্রকাশের এই প্রথা বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই চিত হইলেও, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সম্ভবতঃ পাতিরামই হার প্রবর্ত্তক। যুক্তকর ললাটের সংস্পর্শে না আনিয়াও শ্রদ্ধা-নিবেদনের অভিনয় অতি সহজেই সারা চলে। অশীতিপর স্থবির ষসিংহকে এইভাবে শ্রদ্ধানিবেদনের ছলে দুইহাতের অঙ্গুরীগুলির দেখাইয়াই পাতিরাম ফরাসের এক ধারে বসিয়া পড়িল।

কর্ত্তার পলকশূণ্য দৃষ্টি পাতিরামের মুখের উপর অব্যাহত—দুটি জ্বল চক্ষুর আলোকে তিনি যেন এই মানুষটির অন্তর বাহির এক নিমেষে খিয়া লইলেন।

মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করিয়া পাতিরাম কহিল,—আমি আপনার াছেই এসেছি।

সহজ সুরেই কর্ত্তা উত্তর দিলেন,—সে ত দেখতে পাচ্ছি পষ্ট। কিন্তু বুও আমার মনে একটা ভারী ধোঁকা লাগছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া পাতিরাম কর্ত্তার মুখের কে চাহিল।

কর্ত্তা কহিলেন,—বোধ হয় বছর বত্রিশের কথা হবে; নেত্তা

মুখুজ্জ্যে সরকারের জল আবাদের তদ্বির করত। পুকুর দিঘির বিলি বন্দোবস্ত, মাছ ফেলা-ধরা—সবই থাকত তার হাতে। মাথা ঘুরিয়ে খ্যাপলা জাল ফেলতে সে ছিল নিকিরিপাড়ার মধ্যে সবচেয়ে ওস্তাদ। দেহখানা তার লম্বায় সাড়ে চার হাতের কম ছিল না, কিন্তু আট হাতী ধুতি আর বেগমপুরের পাঁচহাতী একখানা গামছা, এই ছিল তার সম্বল; এতেই সে লজ্জা নিবারণ করত!

পাতিরামের কালো মুখখানা ছায়ের মত ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিল,—যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়! তাহার ন্যায় খ্যাতনামা ধনবান ব্যক্তির সম্মুখে অকারণ তাহার অখ্যাতনামা অতি সাধারণ পিতার প্রসঙ্গ কেন! সে সন্তর্পণে চাহিয়া দেখিল, সেখানে তাহারা দুই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ নাই,—এ কথা আর কেহ শুনে নাই! তাড়াতাড়ি নিজের কাযটুকু শেষ করিতে সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু চতুর গৃহস্বামী যেন তাহার মনোভাব বুঝিয়াই তাহাকে কথা বাহির করিবার অবসরটুকু না দিয়াই কণ্ঠস্বর কিছু গাঢ় করিয়া কহিলেন,—তারপর হঠাৎ হল তার ব্যায়রাম, তিন দিনের ভেতরেই টেঁসে গেলো। শুনলুম যে, এমন সংস্থান কিছু রেখে যায়নি, যাতে তার মাগ ছেলে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায়; গতির পয়সা পর্য্যন্ত ঘরে নেই। কাযেই সব রকমেই মাথা দিতে হয়েছিল তখন। হাঁ, যে কথা বলছিলুম, যেটা আমার চোখের ওপর এখনো জ্বল্ জ্বল্ করছে;—এই ঘরের ভেতরেই ঠিক এই জায়গাতেই—আমি ব'সে, রূপ এসে দাঁড়িয়েছে ঐ দরজার সামনে, চৌকাটের এদিকে পা বাড়াতে তার ভরসা হয়নি; মায়ের ময়লা

আঁচোলটি ধরে দাঁড়িয়েছিলি তুই,—বছর সাতেকের ছেলে, হুদো ন্যাংটা, কোমরে কালো রঙের ঘুনসীতে একটা আধলা ঝুলছে—

পাতিরাম চিরদিনই অসহিষ্ণু। কর্ত্তার এই সব অপ্রিয় কথায় তাহার ধৈর্য্যের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল ; একটু উত্তেজিত ভাবেই সে কহিল,—সে সব পুরোনো কাসুন্দী ঘেঁটে ত কোনো লাভ নেই, মা আমাকে সে সমস্তই জানিয়েছেন ; আমিই বলছি শুনুন,—সেই থেকে আপনি আমাদের গতি মুক্তির বিধাতা হন, আমার মা যাতে মাথায় টুক্‌রী নিয়ে আপনাদের মতন ভদ্দরদের বাড়ী বাড়ী মাছের যোগান দেয় তার ব্যবস্থা করে দেন, আর আমাকে টালার ইংরাজী ইস্কুলে ভর্ত্তী করিয়ে চুপি চুপি তার সমস্ত ভার নেন। কিন্তু যেদিন আমি মায়ের মুখে একথা শুনেছি, সেইদিনই ইস্কুলের পাট তুলে দিয়ে তার সাক্ষী বই সিলেট খাতা জামা কাপড় জুতো ছাতা সমস্তই আগুণ জেলে পুড়িয়ে ফেলিছি তারপর নিজের চেষ্টায় নিজের পয়সায় নিজের মাথা খেলিয়ে যে কায চালিয়ে পয়সা পয়দা করেছি, তার সঙ্গে টালার সেই ইস্কুলে শেখা বিদ্যের কোন সম্বন্ধই নেই।

বদ্ধদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত পাতিরামের মুখের দিকে চাহিয়া স্থবির সিংহ মনের আবেগ সবলে রুদ্ধ করিয়াই কহিলেন,—এখনও আমার চোখের ওপর জ্বল্ জ্বল্ করছে—ঐখানে রূপর আঁচলের খুঁটটি ধরে দাঁড়ানো তার সেই বছর সাতেকের নাংটো দেহখানা ! এর মধ্যে এত পরিবর্ত্তন ! সত্যি, আমি বরদাস্ত করতে পারছি না। বেশ বেশ—

পাতিরাম খপ করিয়া কহিল,—তাহলে ন্যাংটো হয়ে কিম্বা নেংটি পরে আপনার সমানে এসে দাঁড়ালেই বোধ হয় আপনি খুসী হতেন !—

গৃহস্বামী মুখখানা ঈষৎ গম্ভীর করিয়া কথাটার উত্তর দিলেন,—গান্ধারী দুর্য্যোধনকে প্রসব করবার পর, চোখে ঠুলি বেঁধে তপস্যায় বসেন। তপস্যা যখন তাঁর শেষ হ'ল, দুর্য্যোধন তখন যুবা। গান্ধারী বলে পাঠালেন, চোখের ঠুলি খুলেই তিনি আগে দেখবেন জ্যেষ্ঠ সন্তান দুর্য্যোধনকে ; কিন্তু সে যেন যুধিষ্ঠিরের কথামত সজ্জায় আমায় দেখা দেয়। যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে বললেন, মা যে সময় শেষ দেখা দেখে চোখে ঠুলি পরেন, তখন তুমি ছিলে শিশু, উলঙ্গ। মা চোখ খুলে দেখবেন সেই সন্তানকে ; সুতরাং এ সময় কোনো সজ্জা তোমার নেই, উলঙ্গ হয়েই তুমি মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াও।—অভিমানী দুর্য্যোধনের মনে এলো লজ্জা ; উলঙ্গ দেহে মাকে দেখা দিবেন ! শেষে যুক্তি ক'রে নাভি থেকে উরু পর্য্যন্ত পরিচ্ছদ পরে মার মন্দিরে গেলেন। সাধ্বী মায়ের দৃষ্টিতে দুর্য্যোধনের সর্ব্বাঙ্গ লৌহবৎ হয়েছিল—শুধু ঐ উরু দুটি ছাড়া।—আজ যদি নেত্যর ছেলে পতা তার বাপের মত আট হাতি ধুতি আর কাঁধে এক খানা গামছা ফেলে আমার সঙ্গে দেখা করত, তাহলে বুঝতুম, সত্যিকারের ধনী সে হয়েছে। কিন্তু যে হালে তুই এসেছিস আমার সঙ্গে দেখা করতে পাতিরাম, তাতে আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোর ধনদৌলত সব মিছে—ব্যবসাটাও বাজে, মূলধন পর্য্যন্ত তোর চাপা পড়ে গিয়েছে।

অসহিষ্ণুভাবে পাতিরামকহিল,—আমি বুঝতে পারছি না, এ সব কথা আমাকে বলবার আপনার কতটুকু অধিকার আছে !

—দ্রুপ যদি বেঁচে থাকে, এ কথা তাকে জিজ্ঞেসা করিস্ ; লায়েক হয়ে আমার দেওয়া বই খাতা সব জ্বালিয়ে দিয়েছিস্ ; মাথা খেলিয়ে

পয়সা কমিয়েছিস্ বললি না,—কিন্তু অতটা লায়েক হলি কার দৌলতে, সে কথা তোর মার কাছ থেকে জেনে নিস্; শুধু তুই কেন, তোর তিন পুরুষের কথা তুলে সে তোকে শুনিয়ে দেবে—দায়ে ঘায়ে সব রকমে কে তাদের রক্ষা করে এসেছে।

—বিনা স্বার্থে কেউ কাউকে রক্ষা করে না, দায়ে ঘায়ে দেখে না মুকুজ্জে মশাই! তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটেছে—উদয়াস্ত কাষ করেছে, তাই আপনিও তাদের দেখেছেন, অমনি কিছু করেন নি।

—ও! তাই বুঝি আজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে তাদের উপযুক্ত বংশধর পাতিরাম পাকড়ে মহাশয়ের এই ভাবে এখানে আগমন? এটা আমি এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, কিন্তু এরও উত্তর আছে পাকড়ে মশাই! —সিমলের সাতুবাবু নাটুবাবুর নাম শুনেছিস্ ত! তাদের বাবা রামদুলাল সরকার গোড়ায় মদনমোহন দত্তের সেরেস্তায় দশ টাকা মাইনের চাকরী করতেন। সেই সূত্রে পরে তিনি নিজে কারবার ফেঁদে কোটীপতি হন। তখন চৌঘুড়ী চেপে রাস্তায় বেরুতেন। কিন্তু বাঙ্গলা মাস কাবার হলেই দিনের দিন পায়ে হেঁটে আধময়লা ধুতিখানি পরে দত্তদের সেরেস্তায় গিয়ে মাইনের দশটি টাকা হাত পেতে নিতেন। বলতেন, এখানকার অন্ন ও অর্থে দেহ পুষ্ট হয়েছিল বলেই না পরে ভাগ্যলক্ষ্মীকে ধরবার মত শক্তি পেয়েছি! বাইরে আমি যাই হই না কেন, এখানে আমি দশটাকা মাইনের চাকর, আর দত্তবংশ আমার মনিব। এই মূলধনটুকু ধরে রেখেছিল বলেই রামদুলাল সরকার সারা কলকাতার সেরা ধনী হয়েছিল।

—দেখুন, ওসব কথা আপনি আর কাউকে বলবেন, আপনার চালে

যে মাথা গুঁজে থাকে। আমি আপনার কাছে সাহায্য চাইতে আসি নি, আপনি যে সাহায্যে একদিন আমার অজ্ঞাতে আমাকে লেখাপড়া শেখাবার সূত্রে করেছিলেন, আমার বাবার গতি করতে আমাদের খাওয়া পরার বাবদে যে সব খরচ পত্তর দিয়েছিলেন, আমি তাই বেবাক শোধ করতে এসেছি।

—বটে, বটে—তাহলে দেখছি এ একটা নতুন ব্যবস্থা!

—এ ব্যবস্থা আরো আগেই আমার করা উচিত ছিল। কিন্তু নানা ঝঞ্ঝাটে হয়ে ওঠেনি। আমি এ পর্য্যন্ত দুহাতে ঋণ দিয়েই এসেছি, কিন্তু কারুর কাছে কখনো ঋণ করিনি বা করবও না কোনো দিন। আমাদের বাবদে আপনি যা খরচ করেছেন, সুদে আসলে সে সমস্তই শোধ করব বলেই আমি এসেছিলুম। কিন্তু আপনি মিছিমিছি কতকগুলো কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন আমাকে, আপনার বাড়ীতে বসে আছি বলে!

স্থির দৃষ্টিতে পাতিরামের দিকে চাহিয়া সহজ সুরে কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—ঋণ পরিশোধ করতে কত টাকা এনেছ পাতিরাম?

পকেট হইতে নীল রঙের একখানা চেক বই বাহির করিয়া পাতিরাম উত্তর দিল,—হিসেব ত আমার কাছে ঠিকঠাক নেই, আপনিই বলুন।

—আমি যদি বলি লাখ্ টাকা?

—আজ পর্য্যন্ত আমার ব্যাঙ্কে চলতি হিসেবে মজুত আছে এক লাখ সাঁইত্রিশ হাজার তিন শো বাইশ টাকা বারো আনা ন পাই। আপনি বলুন, এই সমস্ত টাকাই আমি এখনি চেকে লিখে দিয়ে আপনার কাছে অঋণী হই।

স্থবির পুরুষ সিংহের মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা গেল। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে পাতিরামের মুখের দিকে চাহিয়া গাঢ়স্বরে তিনি কহিলেন,—সাবাস! বয়স আমার আশী পার হয়ে গিয়েছে, অনেক রকমের মানুষ—নানা রকম আকৃতিও কত অদ্ভুত প্রকৃতিই তাদের মধ্যে দেখেছি, কিন্তু এমনটি দেখলুম, এই প্রথম। এখন মনে পড়ছে, দ্রুপকে বলেছিলুম, দ্রুপ! তোর ছেলেটার লক্ষণ আছে, কালে মানুষ হবে; একে আর মাছের ঝুড়ি বইতে শেখাস নি। বুঝতে পারছি না ঠিক, মোড় ফিরিয়ে দিয়ে ভুল করেছি কিম্বা কোনো অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়েছি। সে যাই হোক, আমি এখন মুক্তকণ্ঠে তোমার তারিফ করছি; এখন কি, তোমাকে ঠিক না বুঝে—নিজের আভিজাত্যের অহঙ্কারে যে অনুযোগ তোমাকে করেছি—সে সমস্তই আমি তুলে নিচ্ছি। এমন আমার কথা শোনো পাতিরাম, সাতকড়ি মুখেজ্জ্যে এ পর্য্যন্ত যাকে যা হাত তুলে দিয়েছে, ফিরে নিতে কখনো হাত পাতে নি। আমার ঋণের টাকা তোলাই থাক্ তোমার কাছে, সুদেই না হয় বাড়তে থাকুক। এর পরি যদি কখনও সত্যিই তোমার কাছে সাতকড়ি মুখুজ্জে বা তার ছেলেদের হাত পাতবার প্রয়োজন আসে, তখন ক'রো এই ঋণ পরিশোধ, তার পূর্ব্বে নয়।

## ৭

সাত বৎসর পরের কথা। ছয় বৎসর হইল সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় তিন পুত্রকে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি তুল্যাংশে ভাগ করিয়া দিয়া

পরলোকের পথে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই টালার সেই লোকবিশ্রুত বহু আত্মীয় স্বজন পূর্ণ বিশাল একান্নবর্ত্তী সংসার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জেষ্ঠ্য পুত্র শক্তিনাথ বারাসতের জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুর বাড়ী বারাসত সহরে। সুতরাং জমিদারী শাসন ব্যাপারে তিনি সপরিবার সেইখানেই কায়েমীভাবে বসিয়াছেন। কনিষ্ঠ সিদ্ধিনাথ ঝরিয়ার কলিয়ারী ও ধানবাদ অঞ্চলের অভ্রখনির সর্ব্বময় মালিক হইয়া রুগ্না স্ত্রীর স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের অছিলায় পৈতৃক বাসভূমির সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ করিয়াছেন। মধ্যম রাধানাথের আশৈশব ঝোঁক ব্যবসায়ের দিকে এবং সহরের প্রতি তাহার মোহও অসামান্য: পৈতৃক বিশাল হার্ডওয়াসী ব্যবসায়ের একমাত্র সত্বাধিকারী হইয়া ব্যবসায়ে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত হইবার অভিপ্রায়ে তিনি সপরিবারে কলিকাতা বুকে বাসা পাতিয়াছেন। টালার প্রাসাদোপম তিন মহল বিশাল ভবন শ্রীহীন ; আশ্রিত আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে যাহারা একান্ত নিরুপায় ও নিরাশ্রয়, তাহারা এখনও মাথা গুঁজিয়া আছেন ও গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, যাঁহাদের দেশে কিছু জমি-জমা ও সংস্থান আছে, তাঁহারা উত্তরাধিকারীদের বাসস্থান ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সরিয়া পড়িয়াছেন। টালার বাড়ী ও তৎসহ কিছু ভূসম্পত্তি দেবোত্তরের অন্তর্ভূক্ত করিয়া কর্ত্তা ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন যে, উক্ত আয় হইতেই যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম্ম এবং অতিথি অভ্যাগত ও আশ্রিতদের সেবা চলিবে। কিন্তু কর্ত্তার মৃত্যুর পর ভাগ বাঁটোয়ারার সময় তিন পুত্রই এক মত হইয়া বিধান দিয়াছেন, আশ্রিত আত্মীয়েরা বাড়ীতে থাকুন তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু আহারের ব্যবস্থা

তাঁহাদিগকেই করিতে হইবে নিজ নিজ ব্যয়ে। পুরাতন কর্ম্মচারী সম্পত্তির আয় আদায় পত্র করিয়া বাড়ীবাগান মেরামত, লোকজনের বেতন, নিত্য-পূজা ও অন্যান্য পূজাপার্ব্বণ যথাসম্ভব সংক্ষেপে সম্পন্ন করিবেন। মৃতুকালে মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্যাঙ্কে সঞ্চিত তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে তিন পুত্রকে তুল্যাংশে তিন লক্ষ এবং গুরু, পুরোহিত, আশ্রিত আত্মীয়স্বজন, কর্ম্মচারী ও পরিচারক পরিচারিকাগণকে পাঁচিশ হাজার টাকা প্রদান করিয়া যান।

তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম রাধানাথবাবুই ছিলেন একটু উচ্ছৃঙ্খল ও বেহিসাবী। অন্য দুই পুত্র পৈতৃক অর্থ হাতে পাইয়াই নিজ নিজ নামে ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু রাধানাথবাবু সেই টাকায় কলিকাতায় বহুবাজের অঞ্চলে এক প্রকাণ্ড বাড়ী, তদুপযোগী আসবাবপত্র ও একখানা মটরগাড়ী কিনিয়া ফেলিলেন!

সম্পত্তি বিভাগ সম্বন্ধে মুখোপাধ্যায় মহাশয় চুল-চেরা ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। অবশ্য স্থাবর সম্পত্তি হিসাবে জমিদারী ও কলিয়ারীর প্রতিষ্ঠা সমধিক হইলেও, হার্ডোয়ারী আয়ের দিক দিয়া অধিকতর লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাধানাথ নিজেই উপযাচক হইয়া কলিকাতার ব্যবসায়ের প্রার্থী হইয়াছিলেন।

কিন্তু যে বিপুল আয় দেখিয়া তিনি এই ব্যবসায়ের দিকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঝুঁকিয়াছিলেন, তাঁহার অদৃষ্টক্রমে প্রথম প্রথম তাহারা স্বর্ণ-প্রসব করিয়া সহসা একেবারে বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইল। যত্র আয়, তত্র ব্যয় অবস্থা। আফিসের ব্যয় ব্যবসায়ের অর্থে কোনওরূপে নির্ব্বাহ হইলেও, বাড়ীর বিপুল ব্যয়ের ব্যবস্থা পুঁজি ভাঙ্গিয়া সম্পন্ন হইতে লাগিল। সমব্যবসায়ী

সকলেরই এই অবস্থা, আক্ষেপ করিবার কিছু নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করিবারও কোনও প্রয়াস দেখা গেল না। এমন অবস্থা কিছুতেই থাকিতে পারে না, দুদিন পরেই বাজারের স্রোত ফিরিবে; এইরূপ অনিশ্চিত আশায় কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ব্যবসায় সম্পর্কে সঞ্চিত অর্থ ক্রমশঃই নিঃশেষিত হইয়া আসিল।

ইহার পর বাজার ত চড়িল না, বরং আরও নামিয়া গেল। এইবার প্রতিমাসে ক্ষতির অঙ্ক পরিপুষ্ট হইয়া বহুবৎসরের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটিকে ভারগ্রস্থ করিয়া তুলিল।

হার্ডোয়ারী ব্যাপারে অনেকগুলি ভদ্রসন্তান অর্ডার সাপ্লায়ারের কায করিয়া সে সময় বেশ দু পয়সা উপায় করিতেন, এখনও উডমণ্ট ষ্ট্রীট, ষ্ট্রাণ্ডরোড, ক্লাইভ ও ক্যানিং ষ্ট্রীটের লোহালক্কড়ের দোকানগুলিতে কিছুক্ষণ বসিলেই এই শ্রেণীর অর্ডার সাপ্লায়ারদের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। বিভিন্ন আফিস হইতে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় মালের অর্ডার গ্রহণ এবং হার্ডওয়ারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাচাই করিয়া যেখানে দরে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা পাওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ ক্রয় করিয়া আফিসে সরবরাহ—ইহাঁদের নিত্যকার কার্য্য। স্বাধীনভাবে এই কার্য্যে ইঁহারা বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করেন এবং হার্ডওয়ারীর মালিকরা ব্যবসায়ের লক্ষ্মীর বাহন ভাবিয়া ইহাঁদের খাতির যত্নের চূড়ান্ত করিয়া থাকেন।

সে সময় সীতানাথ শীল নামে এক ধড়িবাজ অর্ডার সাপ্লায়ারদের অতিক্রম করিয়া নিজের কায রীতিমত গুছাইয়া লইয়াছিল। কয়েকটি কারণে সীতানাথ শীল সহজেই ব্যবসায়ীমহলে সুপরিচিত ও অধিকাংশের

প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। চেহারার দিক দিয়া সীতানাথ ছিল যতটুকু প্রিয়দর্শন, ততোধিক ছিল তাহার সাজসজ্জার চটক ও পরিপাটী। গুছাইয়া কথা বলিতে ও দুষ্প্রাপ্য কায সহজে আদায় করিতে সীতানাথের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এ বিষয়ে তাহার প্রধান অস্ত্র ও অবলম্বন ভাগ্যগনন। সীতানাথ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, বর্ত্তমানের ব্যবসায়গত অর্থ সমস্যায় ভাবপ্রবণ অদৃষ্টবাদী ভাগ্যান্বেষী বাঙ্গালীকে সহজেই হাতের মুঠায় আনিবার প্রধান উপায় এই ভাগ্য-গনন। স্নানাহারেও যাহার অবকাশ থাকে না, সেও যদি শুনিতে পায় যে, সহরোপকণ্ঠের শেষ প্রান্তে এক অসাধারণ গণকের আবির্ভাব হইয়াছে, হাতের সমস্ত কায ফেলিয়া সেই লোক সেখানে ছোটে অদৃশ্য অদৃষ্টের সন্ধান লইতে,—কররেখায় যে পরিচয় অবোধ্য ভাষায় ভাগ্যদেবতা লিখিয়া রাখিয়াছেন, গণকের দৃষ্টিতে তাহা পাঠ করিতে তাহার আগ্রহের আর অন্ত থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আগ্রহ শেষে অদম্য হইয়া গণককেই ভাগ্যদেবতার স্থলে অভিষিক্ত করিয়া দেয় এবং তাহার মুখের প্রতি কথাটি ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ভৃগুর অমোঘ বাণীর প্রতিধ্বনি ভাবিয়া মুগ্ধ জাতক তাহার বিধান নতমস্তকে মানিয়া লয়।

পাথুরিয়াঘাটার কোনও ধনশালী স্বর্ণবণিকের বাড়ীতে সীতানাথের মাতা আশ্রিতারূপে মনিবের ছেলেপুলেদের পরিচর্য্যা করিত। সীতানাথও সেই সূত্রে শৈশব হইতে এই বাড়ীতে স্বজাতীয় মনিবপুত্রদের সহিত প্রতিপালিত ও মোটামুটি রকমের লেখাপড়া শিখিবার অবকাশ পাইয়াছিল। বাড়ীর কর্ত্তা সীতানাথের বাঙ্গলা হস্তাক্ষরের ছাঁদ ও হিসাবপত্রের দিকে তাহার মাথা পরিষ্কার দেখিয়া সেরেস্তায় তাহাকে বাহাল করিয়া দেন।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই সীতানাথের প্রধান চিন্তা—কোন পথটি ধরিয়া সে দুদিনেই সেরেস্তার সকলকে টপকাইয়া কর্ত্তার কাছে গিয়া দাঁড়াইবে। সীতানাথের সহজাত প্রকৃতি অনুযায়ী পথটিই তাহার চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিয়াছিল, সেই পথে পাড়ি দিয়া একটি মাসের মধ্যেই সে সেরেস্তার সতেরো জন কর্ম্মচারীকেই এক সঙ্গে সশব্যস্ত করিয়া তুলিল; সেরেস্তায় কথোপকথন সূত্রে মনিব সরকার সম্বন্ধে যে কোনও কথা হইত তাহা পল্লবিত করিয়া মালিকের কানে তোলা সীতানাথের ছিল প্রধান কায এবং এই কাযের ভিতর দিয়া মনিবের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিতে তাহার পক্ষে অধিক বিলম্ব হয় নাই।

জ্যোতিষের আলোচনাসূত্রে ভৃগুসংহিতার মতে ভাগ্যগননা, এই বাড়ীর কর্ত্তার ছিল একটা বড় রকমের বাতিল বা মোহ। বিশাল বাড়ী, বিপুল জমিদারী, প্রচুর আমদানী সত্ত্বেও একটি পয়সা কর্ত্তার সেরেস্তা হইতে বেহিসাবী খরচ হইবার উপায় ছিল না, কিন্তু এই ভাগ্য গননা ব্যাপারে ব্যয়ের দিকে তাঁহার দৃকপাত দেখা যাইত না। নানাশ্রেণীর জ্যোতিষীর সমাগমে তাঁহার বৈঠকখানা ভরপুর থাকিত এবং জ্যোতিষী-দের পুঁথিপত্র রক্ষা ও তাঁহাদের গননাদির নকল করিবার ব্যবস্থা থাকিত সীতানাথের উপর। জ্যোতিষীদের অখণ্ড প্রভাব দেখিয়া তাহার ভাসা ভাসা দুইটি চক্ষু চক্ চক্ করিয়া উঠিত; সেই সময় হইতেই তাহার তরুণ চিত্তের উপর এই ধারণা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছিল, ফাঁকতালে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার এমন উপায় আর দুটি নাই! এই সূত্রেই সে মাথা খেলাইয়া তোষামোদ ও পরিচর্য্যায় জ্যোতিষীদের হৃদয় এমন ভাবে অধিকার করিয়া ফেলে যে, তাঁহারা ফলিত জ্যোতিষের মোটামুটি

কৌশলগুলি তাহাকে শিখাইয়া না দিয়া নিস্কৃতি পান নাই। একজন নপালী জ্যোতিষী সীতানাথের সহিত কোনও বিষয়ে গোপনে একটা রফা চরিয়া—আগন্তুক আসিবামাত্র তাহার মনের চিন্তা পাঠ করিবার উপায় ও তাহা ব্যক্ত করিয়া অতঃপর কি ভাবে তাহাকে মাত্ করিয়া দেওয়া যায়—তাহার প্রণালীও যথাযথভাবে শিখাইয়া দেন।

বাড়ীর মালিকের সখ হইয়াছিল, তাঁহার পরিজনদের প্রত্যেকেরই জীবন পত্রিকা ভৃগুসংহিতার বিধি অনুসারে সুচারুরূপে সংগ্রহ করিবেন। কাশীর কোনও নামজাদা মারাঠা জ্যোতিষী যিনি ভৃগুসংহিতার বিপুল প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমানের আখ্যান কীর্ত্তনে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, প্রচুর দক্ষিণার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে পাথুরিয়াঘাটার বাটীতে আহ্বান করা হয়। প্রায় তিনটি মাস তিনি ধনাঢ্য গৃহস্বামীর আতিথ্য স্বীকার করিয়া দোভাষীর সহায়তায় একুশখানি কোষ্ঠী ভৃগুসংহিতা অনুসারে সম্পন্ন করিয়া দেন: কোষ্ঠীগুলির বাঙ্গলা অনুলিপি লিখিবার ভার সীতানাথই লইয়াছিল। এই সূত্রে সে বুঝিয়াছিল, ফলিত জ্যোতিষ গননা ও চিন্তা পাঠ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহার উপর যদি একুশজন জাতকের জন্মকুণ্ডলী, ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে দ্বাদশ ভাবের বিশদ গননা কাহিনী সে হস্তগত করিতে পারে, তাহাহইলে এইগুলি অবলম্বন করিয়া কৌতূহলী ধনী সমাজে চাঞ্চল্য উপস্থিত করা, তাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে।

হইয়াছিলও তাহাই, সীতানাথ প্রসঙ্গে প্রারম্ভেই আমরা যাহার আভাস দিয়াছি। সারারাত্রি জাগরণ করিয়া সীতানাথ তাহার কায গুছাইয়া লইল, অর্থাৎ জন্মপত্রিকাগুলির হুবহু নকল এক এক প্রস্থ

অতিরিক্ত প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। কাশীর জ্যোতিষীর সহিত যে সময় পত্রযোগে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তাহার পূর্ব্ব হইতেই নেপালী জ্যোতিষীটী এ বাড়ীতে আস্তানা পাতিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই সীতানাথের সহিত তাঁহার গোপন রফা হইয়া গিয়াছিল। তিন মাস পরে ভৃগুসংহিতার কায যখন শেষ হইয়া গেল, কাশীর জ্যোতিষীর যেদিন বিদায় লইবার কথা, সেই দিন প্রত্যুষে দেখা গেল নেপালী জ্যোতিষী অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে কাশীর জ্যোতিষীর ভৃগুসংহিতার দুষ্প্রাপ্য মূল দপ্তরটির কোনও চিহ্ন নাই!

ইহার পরই মনিববাড়ী হইতে সীতানাথকেও পাততাড়ি গুড়াইতে হয় এবং সোনাগাছির এক বিদ্যাধরীকে জীবন-তরণীর কাণ্ডারী করিয়া তাহারই আশ্রয়ে অভিশপ্ত জীবনের যাত্রা আরম্ভ করে।

হার্ডোয়ারী অঞ্চলে নব্য ব্যবসায়ী মহলে সীতানাথের নূতন নামকরণ হইয়াছে—ভৃগুরাজ! মোটাসোটা দোহারা নাদুস নুদুস চেহারার অধিকারী এই ক্ষণজন্মা মানুষটি কর্ম্মের গতিকে যখনই ক্লাইভ ষ্ট্রীট অঞ্চলের কোনও লোহালকড়ের দোকানে প্রবেশ করে, সঙ্গে সঙ্গে দোকানের কাযকর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়, ভৃঙ্গের গুঞ্জনের মত সমবেত কণ্ঠে আহ্বান আসে—আসুন ভৃগুরাজ, আসুন!—হাত দেখাইবার জন্য প্রত্যেকেরই হাত যেন সুড়্ সুড়্ করিয়া উঠে, ভৃগুর বচন শুনিতে সবাই উস্‌খুস্ করে। যেখানে ভৃগুরাজ সূচ হইয়া প্রবেশ করে, সেখান হইতেই যেন ফাল হইয়া নির্গত হয়। হার্ডওয়ারী-জগতের নানাবিধ লৌহময় বস্তুর শ্রুতিমধুর নামের ফিরিস্তি লইয়া যদিও ভৃগুরাজ অর্ডার সাপ্লায়ার-

রূপে দোকানে প্রবেশ করে, কিন্তু ভৃগুর ফতোয়া দিয়া প্রসন্ন মনে বহির্গত হইবার সময় দুই চারিটি মূল্যবান রত্নরাজির অর্ডার সূত্রে নগদ কিছু না কিছু অগ্রিম দাদন স্বরূপ তাহার পকেট জাত হইয়াও থাকে। ভৃগুরাজ যাহারই ভাগ্য গননায় শ্রম স্বীকার করে, তাহাকেই কিন্তু উপসংহারে একটা না একটা গুনবন্ত রত্ন ধারণের কথা, উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে হয়। খোদ ভৃগুর কথা, সংসয়ের অবকাশ কোথায়? ভৃগুরাজ শুধু যে তিন জ স্ক্রু, সাত ইঞ্চি বণ্টু কিনিতেই পটু তাহা নহে, প্রকৃত গুণবন্ত রত্ন—যাহা ধারণ করিবামাত্রই ভাগ্যদেবতা হুড় হুড় করিয়া যশ অর্থ কাম্য ঢালিয়া দেন—তাহা চিনিতেও বিশেষ দক্ষ। কাযেই রত্ন আহরণের ভার তাহার উপর দিয়াই প্রায় সকলে নিশ্চিন্ত হয় এবং ভৃগুরাজও এই সুযোগে বড়বাজারের এক জহুরীর সহিত রীতিমত রফা করিয়া টাকায় তিন টাকা লাভে ভৃগু মাহাত্ম্য রক্ষা করে।

হার্ডওয়ার-মহলের প্রায় প্রত্যেক মালিকের সহিত সীতানাথের বন্ধুতা থাকিলেও মুখার্জ্জী কোম্পানীর সত্বাধিকারী রাধানাথ মুখোপাধ্যায় স্বাভাবিকমেই তাহার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য ননাসূত্রেই রাধানাথের সহিত সীতানাথের সংযোগ এবং রাধানাথের ভাবপ্রবন খামখেয়ালী চিত্তের উপর প্রভাব প্রকাশ করিতে সীতানাথকে কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই।

সীতানাথ রাধানাথের যে জন্মপত্রিকা ভৃগুর কুণ্ডলী অনুসারে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, জন্মান্তরে রাধানাথ ছিলেন এক বিশাল রাজ্যের রাজা, একদা বিনা অপরাধে তিনি তাঁহারই এক সামন্ত রাজার শিরচ্ছেদ করিলেন; কিন্তু পরে ভ্রম বুঝিয়া তাহার পুত্রকে সম্পত্তিতে

পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও যে পাপ তিনি করিয়াছিলেন, তাহার ফল ত তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে! সুতরাং তাঁহার রাজ্যপাট সমবেত শত্রু রাজন্যবর্গের আক্রমণে যখন তছনছ হইবার কথা, ঠিক সেই সময় দেখা দিল পুণ্যের বল,—তাঁহার শত্রুদল পরস্পর বিবাদে ছিন্ন ভিন্ন হয় এবং পরে তাহাদের রাজ্য ও তাঁহার অধিকারে আসে।

বর্ত্তমান জন্মেও ভৃগুর মতে রাধানাথবাবুর জীবনযাত্রায় জন্মান্তরের গ্রহগণের সেইরূপ সংস্থান দেখা যাইতেছে। সুতরাং তাঁহার ব্যবসায়ের উপর আপদ বিপদ ও ঝঞ্ঝাট যাহা চলিয়াছে, যে ভাবে ক্রমশঃই নীচের দিকে নামিতেছে, এ ভাব থাকিবে না। শীঘ্রই এমন একটা পরিবর্ত্তন ঘটিবে, যাহার ফলে তাঁহার ব্যবসায়ের জয় জয় কার হইবে এবং তিনি এই ব্যবসায়েই রাজা বিশেষ হইবেন।

ভৃগু সংহিতার এই আশ্বাসই অবশেষে যখন রাধানাথের প্রধান ভরসা হইয়া তাহার কর্ম্মক্ষেত্রের তমোময় পথে ঘন ঘন আকারে বর্ত্তিকা ধরিতেছিল এবং কারণে অকারণে সীতানাথের সহযোগিতায় জীবনের সেই কাম্য দিনটি কবে আকস্মিকরূপে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহাই যখন প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল, ঠিক সেই সময় যেন রাধানাথের ভাগ্য-বিধাতার নির্দ্দেশেই তাহার ভাগ্য ও কর্ম্মের সংযোগ-স্থলে ভিন্নমূর্ত্তিতে দেখা দিল—পাতিরাম পাকড়ে।

শকুনীর দৃষ্টি যে ভাবে ভাগাড়ের দিকে পড়িয়া থাকে, ততোধিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাতিরাম পাকড়ে বরাবর সাতকড়ি মুখুজ্জ্যে ও তাঁহার বংশধরদের উপর তাকাইয়া ছিল। দুর্জ্জয় দম্ভে সে সাতকড়ি

মুখোপাধ্যায়ের ঋণ পরিশোধ করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার প্রত্যাখান পাতিরামের বুকে সূচের মত বিঁধিয়াছিল। এমন ভাবে স্পষ্ট কথা কেহ তাহাকে শুনাইতে পারে নাই। যে লোক দিবারাত্রি টাকার তোড়ার উপর বসিয়া থাকে, অর্থপ্রত্যাশী বুভুক্ষুদের স্তুতিবাদ নিয়ত যাহার মাথার উপর পুষ্পবর্ষণ করে, স্পষ্ট কথা—অপ্রিয় সত্য সে লোক কখনই বরদাস্ত করিতে পারে না। পাতিরামও পারে নাই।

বাসায় ফিরিয়াই পাতিরাম তাহার মূল্যবান বসন ভূষণ সমস্তই টানা হেঁচড়া করিয়া খুলিয়া ফেলিল এবং একখানা ময়লা ধুতি পরিয়া ভেকভুক্ত ঢোঁড়া সাপের মত নিথর ভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। প্রভুর সাড়া পাইয়া ভৃত্য তুলসীদাস ছুটিয়া আসিতেই হুঙ্কার দিয়া কহিল, এই গুলো সব সরিয়ে নিয়ে যা আমার সামনে থেকে,—খবরদার! যেন আমার চোখের সামনে না পড়ে।

তুলসীদাস প্রভুর প্রকৃতি ভালরূপই চিনিত। সে যদিও সর্ব্বক্ষণই নেশায় চুর হইয়া থাকিত, কিন্তু তাহার প্রভু কোনও নেশা না করিয়াও যে মাতলামী করিতে তাহার অপেক্ষা অধিকতর দক্ষ, তাহা সে ভালরূপেই জানিত। রক্তাভ দুইটি চক্ষু তুলিয়া সে প্রশ্ন করিল,—কি করব এগুলো, রাখব কোথায়?

এইবার বোমা যেন ফাটিয়া গেল; উত্তর হইল,—চুলোয়! খালের জলে বিসর্জ্জন দিয়ে আয়, না হয়, দেশলাই জ্বেলে পুড়িয়ে দে;—যত সব পাজী বদমাস নেশাখোর নচ্ছার নিয়ে আমার কায! হারামজাদাদের দাব এবার দূর ক'রে—

যেমন প্রভু, তেমনই ভৃত্য; বুঝিল সে,—ইল্লীর ধূপ ধুপুনী বিল্লীর

ঘাড়ে– কেউ কিছু বলে থাকবে কড়া কথা, তারই শোধ তোলা হচ্ছে—ধান ভানতে ভাঙ্গা কুলো—তুলসীর ওপরে।

ছাড়া কাপড় জামা চাদর গার্ডচেন একটি একটি করিয়া তুলিয় পুঁটলী বাঁধিয়া সে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

পাতিরাম তাহার লাল খেরোয় বাঁধা এক বিঘত চওড়া, দে বিঘত লম্বা ও দুই বিঘত মোটা এক অপূর্ব্ব খাতায় রোজনামচা লিখিতে বসিল। কর্ম্মজীবনের সূত্রপাতের দিন এই খাতাখানি সে অর্ডার দিয় তৈয়ারী করাইয়া ছিল, প্রায় এক যুগ ধরিয়া ইহাই তাহার কা সাধিতেছে।

পাতিরাম লিখিল,—দেন্‌দার—সাতকড়ি মুখুজ্জ্যে, তার ওয়ারিস তিন ছেলে, তার ঘরবাড়ী পুকুর বাগান, বিষয় আসয় মান-সম্ভ্রম, সর্ব্বস্ব —এসবের উচ্ছেদে দেনা শোধ হবে;—এই ভাবে আমি আমা ঋণ পরিশোধ চাই।

সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদে পাতিরাম ক্ষিপ্তের মত অস্থি হইয়া উঠিয়াছিল, এ সম্বন্ধে তাহার আক্ষেপের এই মাত্র কারণ—বু জীবিত থাকিতে সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিল না! আপন মে বিড়্ বিড়্ করিয়া সে বলিয়াছিল—বুড়ো বামুন বেঁচে গেলো, বেঁচে গেলে এমন ক'রে আর কেউ আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারে নি।

তাহার পর সাতটি বৎসর পাতিরাম অবিরাম চেষ্টায় রাধানাথে চারিধারে বেড়াজালের বেষ্টনি দিয়াছে। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ দেশত্যাগী, সুতর সহরবাসী রাধানাথের উপর তাহার অলক্ষ্যে নানারূপ আক্রমণ চলিয়াছি

হার্ডওয়ারী ব্যবসায় মুখোপাধ্যায় বংশের উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ, তা

পাতিরামও তলে তলে সুড়ুক সন্ধান লইয়া আফিস অঞ্চলে যে সময় একখানি হার্ডওয়্যারী দোকান ফাঁদিবার সঙ্কল্প করিতেছিল, সেই সময় কৃত্তিবাস কোলের সহিত তাহার হাবড়ার মেছোহাটায় সংঘর্ষ সূত্রে সম্প্রীতি ঘটে। কৃত্তিবাসের হার্ডোয়্যারী প্রতিষ্ঠানটি দশ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়া সে এই নূতন ব্যবসায়টির হাড়হদ্দ জানিবার জন্য কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হয়! কয়েক মাসের মধ্যেই এই ব্যবসায় সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ক্রীত ব্যবসায়টির নাম পাল্টাইয়া তাহার নূতন নামকরণ করিয়াছিল—নগদ বিদায় এজেন্সী। নগদ ব্যতীত কাহারও নিকট হইতে কখনও এখানে ধারে কিছুই খরিদ হইত না, যদিও চড়াদরে ধারে মাল সরবরাহ করাই এখানকার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। অদ্ভুত অধ্যবসায়ে পাতিরাম এই ব্যবসায়ের হাড় হদ্দ ও গুপ্ত রহস্য এমন অভিনিবেশের সহিত বুঝিয়া লইয়াছিল যে জীবনের অধিকাংশ কাল এই ব্যবসায়ে ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত থাকিয়া যে সকল বহুদর্শী মাথার চুল ও চক্ষুর ভুরু পাকাইয়াছিলেন, তাঁহাদের চর্ম্মচক্ষুর উপর সেই রহস্য বৃত দ্বার কোনও দিনই উদ্ঘাটিত হইতে পারে নাই।

ইতিপূর্ব্বে জলের মাছ স্থলে বিক্রয় করিয়া পাতিরাম লক্ষ লক্ষ টাকা যেমন উপার্জ্জন করিয়াছিল, তেমনই তাহার অপচয়ও হইয়াছিল। কিন্তু লোহার বাজারে রহস্যের সন্ধান পাইয়াই সে বুঝিয়াছিল যে, এই শক্ত বস্তুটির মধ্যে যে প্রচুর রস প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহা হইতে একদিন সোনার ধারা বহিবে। কাযেই সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এই ব্যাপারেই সে কোমর বাঁধিয়া নামিয়া পড়িয়াছিল।

মাথা খেলাইয়া পাতিরাম অর্থাগমের আর একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের হার্ডওয়্যারী মালপত্রের যাহারা রক্ষক ও সরবরাহকারী, পাতিরাম তাহাদের প্রত্যেককেই বড় বড় মাছ ও মোটা রকম টাকার নিয়মিত মাসোহারা দিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। বহু মিলের বাবু, সরদার ও ফোড়ের দল পাতিরামের হাতের পুতুল হইয়া পড়িয়াছিল। সে সময় বস্তা বস্তা লোহার 'পীন্‌' মিলের ষ্টোর হইতে পাচার হইয়া জলের দরে স্থানান্তরে বিক্রয় হইতেছিল, পরে এই প্রসঙ্গ লইয়া কারখানা-অঞ্চলে তুমুল আন্দোলনও উঠিয়াছিল, কিন্তু কেহই তখন কল্পনাও করিতে পারে নাই—এই অভূতপূর্ব্ব ফন্দীর প্রবর্ত্তক নগদ বিদায় এজেন্সীর মালিক স্বয়ং পাতিরাম পাকড়ে। পাতিরামই তাহার দিগন্ত বিসারী দৃষ্টি বিরাট লৌহ-জগতের সর্ব্বাংশে নিক্ষেপ করিয়া এই সত্য নির্ণয় করিয়াছিল যে, লৌহময় এই ক্ষুদ্রতম তীক্ষ্ণ পীন্‌টি আধুনিক বস্তুতন্ত্রের একটি অপরিহার্য্য যন্ত্র; এই ক্ষুদ্রকায় বস্তুটির অভাব যদি কোনও দিন ঘটে, অতিকায় কারখানার অজগরতুল্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৎক্ষণাৎ হইবে অচল! যেহেতু এই ক্ষুদ্র পীণ মিলের প্রাণ। মিল চলে বাঙ্গলা দেশের একপ্রান্তে, কিন্তু পীন্‌গুলি প্রস্তুত হয় য়ুরোপের অন্য প্রান্তে। সুতরাং যদি কোনও প্রকারে এই অকিঞ্চিতকর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দ্রব্যগুলিকে মিল অঞ্চল ও বাজার হইতে হঠাৎ গুম্ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে নূতন চালান আসিবার পূর্ব্বেই সে বাজার মাত করিয়া ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে। মিলের এই 'পীণ্‌' তখন আবর্জ্জনার মত ক্লাইভ ষ্ট্রীট অঞ্চলের প্রত্যেক দোকানেই স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া থাকিত, ইহা যে কেহ কোনও দিন যাচিয়া ক্রয় করিতে চাহিবে, এ কথা কেহই ভাবেন নাই। সুতরাং

পাতিরামের লোকজন যখন নগদ বিক্রয় এজেন্সীর জন্য নগদ মূল্যে ওজন দরে পীণ্ কিনিতেছিল, ব্যবসায়ী মহলে তখন একটা হাসির হররা উঠে এবং এই সূত্রে পাতিরাম পাকড়ে 'নগদ বিদায়' নামে এই অঞ্চলে সব্চীন হইয়া পড়ে। প্রকাশ্যে বাজারের পীণ ও অপ্রকাশ্যে কারখানা সমূহে মজুত পীন উজোড় করিয়া পাতিরাম সেই খেরো বাঁধানো খাতায় যে দিন হিসাব লিখিল—এ বাবদে নগদ বিদায়ের পরিমাণ পঁয়তাল্লিশ হাজার আট শত ছাব্বিশ টাকা তেরো আনা, তাহার পরদিনই য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সূচনা সকল সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়া কলিকাতাবাসীকে সচকিত করিয়া দিল।

ঠিক এই সময়টিতে ঘটনাচক্রে সীতানাথ শীলের সহিত হইল পাতিরাম পাকড়ের শুভ সংযোগ। ভৃগু সংহিতার বচন শুনাইয়া সীতানাথ ক্লাইভ ষ্ট্রীট মাত করিলেও, পাতিরামকে কিন্তু কায়দায় আনিতে পারে নাই; তাহার গনণার চাল এখানে একেবারে বেতাল হইয়া মাঠে মারা গিয়াছিল।

পাতিরাম সেদিন তাহার বাহিরের ঘরের ছোট তক্তপোষটির উপর বিছানো বিছানায় বসিয়া হিসাবের খাতার পাতা উল্টাইতেছিল, এমন সময় আস্তে আস্তে সেই ঘরে সীতানাথের প্রবেশ। পরস্পরের নাম শুনা ও মুখ চেনা থাকিলেও আলাপ পরিচয়ের সুযোগ এ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। পাতিরাম দুই চক্ষু তুলিয়া বঙ্ক দৃষ্টিতে চাহিতেই সীতানাথ দুই হাত যুক্ত করিয়া ললাটে তুলিয়া সম্ভ্রমের সুরে কহিল—নমস্কার!

পাতিরামের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে অতি কোমল স্বরে কহিল,—ভৃগুরাজ যে, আসুন, আসুন,—বসুন।

নিকটেই কয়েকখানি লোহার চেয়ার পাতা ছিল—সীতানাথ তাহার একখানি অধিকার করিয়া বসিল। পাতিরামের বদ্ধদৃষ্টি সীতানাথের মুখের দিকে। চোখোচোখি হইতেই সীতানাথ কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল,—আপনার এখন একাদশ বৃহস্পতি চলেছে পাতিরাম বাবু, যাকে বলে—পূর্ণ জোয়ার—

বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া পাতিরাম কহিল,—বলেন কি? তারপর—তারপর—

অধিকতর উৎসাহিত হইয়া সীতানাথ কহিল,—জন্মকুণ্ডলী আছে আপনার কাছে? বার করুন ত দেখি,—সব শুনিয়ে দেব এখনি, যা হয়ে গেছে, যে সব হচ্ছে, পরে যা যা হবে—

বিস্ময় আরও গভীর করিয়া পাতিরাম কহিল,—বটে! সব শুনিয়ে দেবেন আপনি—পরে যা যা হবে, সে সবও?

—কেন, আপনি আমার গনণার কথা শোনেন নি?

—শুনিনি—এমন কথা বলতে পারি না, কিন্তু শোনার চেয়ে দেখাটাই আমি বেশী পছন্দ করি। আচ্ছা, আপনার যখন জ্যোতিষে এতই এলেম, বলুন ত, এখন থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে আপনার ভাগ্যের কি কি পরিবর্ত্তন হবে?

সীতানাথ অবাক, তাহার সম্বন্ধে এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন! এমন ত কেহ কোন দিন করে নাই। মনের ভাব চকিতে গোপন করিয়া সে উত্তর দিল,—আমার ভাগ্য পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে বছর কতক আগেই, এখন আর কি এমন পরিবর্ত্তন হবে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে!

কোনও মন্তব্য প্রকাশ না করিয়াই পাতিরাম পুনরায় প্রশ্ন করিল,

—আচ্ছা, বলুন ত, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমিই বা কি করব? তাজ্জব ব্যাপার! রোজা উপস্থিত ভূত ছাড়াইতে, কিন্তু ভূত নিজেই রোজার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে!

সীতানাথের মুখে কথা নাই; এভাবে তাহার চাল কোথাও কোন দিন ব্যর্থ হয় নাই। সে তখন আপন মনেই ভাবিতেছিল,—তাই ত!

পাতিরাম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতেই তাহার দিকে চাহিয়াছিল। এইবার কহিল,—আমি বলব, কি মতলব নিয়ে আপনি আমার কাছে এসেছেন?

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়; দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে পাতিরামের মুখের দিকে চাহিল, প্রশ্নে তাহা পূর্ণ; কিন্তু মুখে কোনও কথা ফুটিল না।

পাতিরাম কহিল,—আপনি এসেছেন টাকা ধার করতে। বলুন, আমার অনুমান ঠিক কি না?

মৌনভাব সবলে কাটাইয়া সীতানাথ উচ্ছ্বাসের সহিত কহিল,—আপনিও কি তাহলে ডুবে ডুবে জল খান পাতিরাম বাবু? জ্যোতিষ নিয়ে নাড়াচাড় করার অভ্যেসও তাহলে আছে?

—কস্মিনকালেও নয়।

—তাহলে, কি করে একথা বললেন?

—খুব সহজে। মানুষ নিয়ে নাড়াচাড়া যার কারবার, এটুকু তাকে জানতে হয়! মানুষের পায়ের শব্দ, তার চেহারা, বসবার কায়দা, মুখের ভাব, কথার ভঙ্গী—এগুলো থেকেই আমি বুঝতে পারি, কি মতলব নিয়ে সে এসেছে। আচ্ছা এইবার আপনি গণনা করে বলুন ত, ধার আপনি আমার কাছে পাবেন কি না, আর যদি পান—কত টাকা আমি দেব আপনাকে?

এ প্রশ্নেও ভৃগুরাজ মাত হইয়া গেল। বিহ্বলভাবে কহিল,—আমি পাঁচশ টাকা আপনার কাছে ধার চাইব, এই সঙ্কল্প নিয়েই এসেছিলুম কিন্তু মনে মনে গণনা করে দেখছি—আপনি আমাকে তিন শ টাকা দেবার সঙ্কল্প করেছেন এবং তাই দিবেন।

—মিছে কথা। আপনার পুঁথিপাঁথা বাড়ী গিয়েই সব গঙ্গারজলে ভাসিয়ে দেবেন। আমি আপনাকে হাজার টাকা দেব, আর এই টাকা নিয়েই আপনি সোনাগাছিতে ভামিণীবিবির বাড়ীতে গিয়ে ঢুকবেন।

স্তব্ধ বিস্ময়ে কয়েক সেকেণ্ড থাকিয়া, তাহার পর সে ভাব কাটাইয়া সীতানাথ কহিল,—আপনি কি উপহাস করছেন পাতিরাম বাবু?

কথাটা যে উপহাস করিবারই মত, পাতিরামের বাড়ীর অবস্থা ও তাহার গদীঘরের সাজ সজ্জা তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন করিতেছিল। আফিস অঞ্চলে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ীর নীচের একটা লম্বা হল ভাড়া লইয়া নগদ বিদায় এজেন্সীর কারবার ফাঁদা হইয়াছিল, সেখানে এক-তালার ঘরের ভিতর উপর্যুপরি কাঠের পাটাতন তুলিয়া তিন তালার সুবিধা লওয়া হইত। উপরের দুইটি তালায় থাকিত মাল, নীচের তালায় রীতিমত আফিস, টেবল, চেয়ার, আলমারী, পাখা, বাতি, কিছুরই অভাব ছিল না,—তবে নীচের তালার উপর কাঠের ছাদটি পাতিরাম নিজের মাথা মাপিয়াই বানাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল,—কিন্তু তিন হাতের উপর ইঞ্চি দুই দীর্ঘ দেহ বিশিষ্ট কেহ নগদ বিদায় এজেন্সীর 'সেলে' হঠাৎ প্রবেশ করিলেই কাঠের ছাদের সহিত দেহাধিকারীর মাথার চাঁদির সংঘর্ষ ঘটিত! কাযেই, ঘনিষ্ঠতাসূত্রে নিত্য

নিয়মিতভাবে নিজ নিজ গরজে যাহারাই নগদ বিদায় এজেন্সীতে যাতায়াত করিত, তাহারা প্রত্যেকেই মাথা নীচু করিবার অভ্যাসটুকু আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল।

তথাপি, আফিসের এই অভিনব ব্যবস্থা নগদ বিদায় এজেন্সীর মালিকের প্রতিষ্ঠা ও বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়া থাকে ; কিন্তু সহরোপকণ্ঠে তাহার ন্যায় অর্থশালী লোকের বাড়ীর অবস্থা ও গৃহস্থসুলভ হাল-চাল বিপরীত ধারণার পোষকতা করে।

জরাজীর্ণ তক্তপোষের উপর আস্তৃত শতছিন্ন কাঁথাখানির সর্ব্বাঙ্গ তৈলমলিন ধুলি ধুসর বোম্বাই চাঁদরে সম্পূর্ণ আবৃতও হয় নাই। তাকিয়াগুলির মূর্ত্তি ও অবস্থা শয্যার অনুরূপ। শূকর যে ভাবে অপরিসর জলাশয়ে কুর্দ্দন করিয়া কদর্য্য ও অব্যবহার্য্য করিয়া তুলে, শয্যার মালিকও সেইভাবে ঠাসিয়া ও তাহার মানসিক বিক্ষোপ বিছানা ও বালিশের উপর প্রয়োগ করিয়া তাহাদের শোভা আরো মনোলোভা করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং ঘরের শ্রীসম্পদে যাহার হাড়ীর হাল, সেই লোক এক কথায় হাজার টাকা বাহির করিয়া দিবে! ইহা কি সম্ভব!

পাতিরাম বোধ হয় সীতানাথের মনের দ্বিধা বুঝিতে পারিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ সে একটু আড় হইয়া তক্তপোষে পাতা কাঁথাখানির একটা প্রান্ত উল্‌টাইয়া দিতেই সীতানাথ স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখিল, নোট, টাকা ও রেজগীতে সেই স্থানটুক ভরিয়া রহিয়াছে। ক্ষিপ্রহস্তে সুতায় বাঁধা একটা বাণ্ডিল তুলিয়া সে সীতানাথের কোলের উপর নিক্ষেপ করিল। অভিভূতের মত সে তাড়াটি দুই হাতে ধরিয়া পাতিরামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিকৃতমুখে পাত্তিরাম কহিল,—কাল থেকে এগুলো এই খানেই পড়ে আছে, তুলে যে রাখবো সে হুঁসই ছিল না, জ্বালাতন, জ্বালাতন!—আপনি যে লক্ষ্মণে'র ফল ধরে বসে, গুণে দেখুন—

সীতানাথ কম্পিত হস্তে গণিয়া দেখিল, একশো টাকার দশ কেতা নোট, প্রত্যেক নোটের পশ্চাতে নগদ বিদায় এজেন্সীর রবার ষ্ট্যাম্পের ছাপ।

সীতানাথ কহিল,—হঠাৎ যে আমার ওপর আপনার এতটা করুণা—

পাতিরাম গম্ভীরভাবে উত্তর দিল,—আপনাদের মত সাধু সজ্জনের ওপরেই আমার করুণা চিরকালই এমনই। আপনারা যদি চান—পাঁচ, আমি দিই—দশ। কিন্তু মাগ-ছেলে নিয়ে যারা ঘরসংসার করে, তাদের সম্বন্ধে আমার ব্যবস্থা ঠিক উল্‌টো। তারা যা চায়, দিই তার সিঁকি; তাও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে।

কেন বলুন ত? আমাদের ওপরেই বা—

—তার কারণ বুঝতে পারলেন না! আপনাদের যা দেব, তার অন্তত: পঞ্চাশগুণ উসুল করতে পারব আপনাদের দ্বারায় নানা রকমে কিন্তু ওদের যা দেব, সুদেই যা উসুল হবে, তাই দিতে দিতেই পটল তুলবে। আরে, দেবে কোথা থেকে, ধর্ম্ম রেখেছে ওদের তমো: ডুবিয়ে; পাছে অন্যায় কিছু করলে সে যায় চটে, তাই খোঁয়াড়ের ভেতরেই কাল কাটায়, বেড়ার বাহিরে হাত দিতে চায় না; ওদের দিয়ে কোন কায আমি আদায় করব বলুন ত?

—আর, আমার মত নিষ্কর্ম্মা মানুষকে দিয়েই বা আপনি কোন মহাকাজ আদায় করবেন?

—যথেষ্ট, যথেষ্ট। সংসার না থেকেও আপনার যেমন অনন্ত খরচ, অষ্টপ্রহর টাকার দরকার,—সে যদি যোগাই আমি, আপনি আমার বেগার কিছু খাটবেন না ?

—নিশ্চয়, পাতিরাম বাবু, নিশ্চয়, আজ থেকে আপনিই আমাকে নিলেন ; আমি আপনার !

শুভক্ষণে শুভলগ্নে সহরোপকণ্ঠের এই খোলার ঘরটির ভিতর সহরের টি রত্নের হইল এইভাবে অপূর্ব্ব সমন্বয়, বিচিত্র সংযোগ। এই দিনই তিরাম তাহার খেরোবাঁধানো খাতায় যথাস্থানে বড় বড় হরফে লিখিয়া খিল,—সাতকড়ি মুখুজ্যের ছেলে রাধানাথ মুখুজ্যের মৃত্যুবান আজ ত পাইলাম।

পাতিরামের সহিত সীতানাথের যেদিন সংযোগ ঘটে, তাহার দিনই মুখার্জ্জী কোম্পানীর কার্য্যালয়ে রাধানাথ বাবুর সুসজ্জিত খাস রায় সীতানাথ একটা নূতন গণনায় সকলকে অবাক করিয়া দিয়াছে ! ধানাথ বাবুর করতলে এমন একটি নূতন রেখা এইমাত্র সীতানাথের দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, যাহার অর্থ হইতেছে—কোনও নীচ র সংস্রবে জাতকের বিপুল বিত্তলাভ।

বাবুর পারিষদেরা সীতানাথের কথার সমর্থনে শত মুখ হইলেও, াপরি ক্ষতির আঘাতে এবং সেই সূত্রে ঋণের দুশ্চিন্তা ও অর্থের তায় ম্রিয়মান রাধানাথের মুখে উৎসাহের কোনও চিহ্ন ফুটিয়া ল না, বরং হতাশের সুরেই তাঁহাকে বলিতে শুনা গেল,—তোমায় গুই আমাকে বড় রাজা করলে, এবার মুচি মুদ্দোফরাস আমার াত দেবে ফিরিয়ে ও সব ভুয়ো—সব ভুয়ো।

সীতানাথ সঙ্গে সঙ্গে জোর কণ্ঠে কহিল,—ভৃগুর গণনা কখনো ভুয়ো হয় না মুখুজ্জ্যে মশাই, রাজা আপনি একদিন হবেনই—অবশ্য যদি আপনার কুণ্ডলী ঠিক থাকে। কিন্তু সে কথা যাক্, এখন হালে যে রেখা আপনার হাতে ফুটেছে, এর ফল যদি না আপনি হাতে হাতে পান, তাহলে আমি ক্লাইভ ষ্ট্রীটেই আর পা দেব না কোন দিন।

রাধানাথের ম্লান মুখখানি একবার পুনরায় যেন দীপ্ত হইয়া উঠিল। ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—কিন্তু ফলটা আসবে কোন দিক দিয়ে ভৃগুরাজ! কেনাবেচা ত নেই বললেই হয়। ঘরে যে মাল মজুত, পড়তার চেয়েও তার বাজার দর গেছে নেমে; এর ওপর মাস তিনেক আগে যে মালের অর্ডার বিলেতে পাঠিয়েছিলুম, তার ইনভয়েস এসে গেছে। ডিউ প্রায় ছিয়াত্তোর হাজার। এইতেই হবে ব্যাঙ্কের পুঁজি নিঃশেষ! তার ওপর—লাভের দফা ত গয়া, বরং উলটে ঘর থেকে কিছু যাবে; এই ত অবস্থা! তরী ডুবু ডুবু, এ সময় এক বিধাতা ছাড়া উদ্ধার করতে আর কেউ পারে না।

সীতানাথ মুখে সমবেদনার ভাব ব্যক্ত করিয়া কহিল,—আপনার অবস্থা জানতে আমার কি বাকি আছে মুখুজ্জ্যে মশাই,—আসল চাবি-কাটিটাই ত আপনি প্রত্যয় করে আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। বুঝছি আমি সবই, কিন্তু এ কথাও এবার জোর দিয়েই বলছি,—দিন আপনার এসেছে. রাহু এসে বসেছে ঠিক জায়গায়; সি, আর, দাসের কুষ্ঠীতেও ঠিক এই ফল দেখা দিয়েছিল—ম্লেচ্ছের সাহায্যেই তিনি লাখো লাখো টাকা উপায় করেন। এই রাহুই তাঁকে রাজা করেছিল ব্যারিষ্টারীতে। আপনার বরাতও ফিরবে মুখুজ্জ্যে মশাই—ঠিক এমনই একটা কিছু উপলক্ষ ধরে।

এই ঘটনার ঘণ্টা দুই পরেই রাধানাথের নিকট এক দালাল আসিয়া উপস্থিত ; তাহার প্রস্তাব শুনিয়াই আফিসশুদ্ধ সকলের চক্ষুস্থির ! বিলাতে রাধানাথ বাবু যে মালের অর্ডার দিয়াছিলেন, সদ্য যাহার ইনভয়েস আসিয়াছে এবং দর নামিয়া যাওয়ায় তিনি এই মাল সম্পর্কে চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন, 'নগদ বিদায় এজেন্সী'র পাতিরাম পাকড়ে কিছু মুনফা দিয়া সেই মালের ইন্‌ভয়েস ক্রয় করিতে ইচ্ছুক,—সেই প্রস্তাব লইয়াই দালালের আবির্ভাব।

রাধানাথ অবাক, ভৃগুরাজের কথা হাতে হাতে ফলিয়া গেল। ইন-ভয়েসের ডিউ' টুকুর দায়িত্ব কেহ লইলেই যে ক্ষতিকর মালের স্বামীত্ব তিনি অনায়াসেই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাহার উপর কিছু মুনফা দিয়া সেই মাল খরিদ করিবার উমেদার উপস্থিত ; ভাগ্যপরিবর্ত্তনের ইহা অপেক্ষা আর কি শুভ-সূচনা হইতে পারে !

দালালের মধ্যস্থতাতেই অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে কথাবার্ত্তা পাকা ও চারি হাজার টাকা মুনফা স্বরূপ লইয়া ইনভয়েস্ বিক্রয়-কার্য্য সমাধা হইয়া গেল।

অপরাহ্নের দিকে সীতানাথ আসিতেই আজ তাহার খাতির দেখে কে ! সকলের মুখে এক কথা—মুখে যা বলে গেলেন ভৃগুরাজ, ঘণ্টা কয়েকের ভেতরেই তা ফলে গেলো হাতে-হাতে !

রাধানাথ বাবু শুধু কথাতেই তাহাকে তুষ্ট করিলেন না, তখনই তাহার নামে দুই শত টাকার একখানি চেক কাটিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন।

দুই দিন পরেই গুণমুগ্ধ অনুগৃহীতের নূতন প্রস্তাব,—রাহু যখন

অনুকূল তখন তাহার খোরাক যোগানো দরকার। মজুত মালগুলি ত
দীর্ঘকাল ধরিয়া গুদামে পড়িয়া আছে, মরিচা ধরাইয়া কি লাভ! নগদ
বিদায় এজেন্সীর অব্যবসায়ী আনাড়ী মালিকের ঘাড়ে চা পাইয়া ওগুলি
পাচার করিতে কি দোষ!

সীতানাথের যুক্তি রাধানাথের মর্ম্মস্পর্শ করিলেও তিনি সংসয়ের
সুরেই কহিলেন,—এ ব্যাপারে সে আনাড়ী হলেও, সে কি এমনই বোকা
যে গুদমে পড়া মরচে-ধরা মাল বেবাক তাকে গছিয়ে দেবে?

সীতানাথ দৃঢ় স্বরে কহিল,—আলবৎ! আদার ব্যাপারী এসেছে
যখন জাহাজের খবরদারী করতে, জাহাজ ডুবী ত হবেই! মেছো হাটা
ছেড়ে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মার্কেটে ঢুকেছে মহা মহারথীদের সঙ্গে টক্কর দিতে
আপনি মিছে সন্দেহ করছেন, রাহু যখন আপনার 'ফরে'; আপনি কথা
দিন, সব ঠিক করে দিচ্ছি—চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরেই।

তিনটি দিনেই মুখার্জ্জী কোম্পানীর বিশাল ষ্টোর সম্পূর্ণ উজোড়
হইয়া গেল। গুদামের উল্লেখযোগ্য যাবতীয় মালপত্রের সহিত যেখানে
যাহা কিছু লোহা লক্কর স্তূপীকৃতভাবে রাবিসের সামীল হইয়াছিল, সে
সমস্তই সাপ্টা-দরে পাতিরাম পাকড়ে সীতানাথের মধ্যস্থতায় কিনিয়া
লইল। খাতা পত্রে মালের আনুমানিক নিরিখ হয়—এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ
হাজার টাকা। পাতিরাম পাকড়ের পক্ষ হইতে তাহা দেড় লক্ষ টাকায়
খরিদ হইয়া গেল এবং সেই মরিচামণ্ডিত মালগুলির সহিত মুখার্জ্জী
কোম্পানীর প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যলক্ষ্মীও অশ্রুমুখী হইয়া নগদবিদায় এজেন্সী
ভাণ্ডারে ঢুকিয়াছিলেন, পরে তাহা আর দশজনের মত রাধানাথ বাবুকে
স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

আসন্ন ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতির অবস্থা হয় যেমন স্থির, নিথর,—ব্যবসায়ের বাজারেও তখন ঠিক সেইরূপ সংসয়সঙ্কুল ভাব।—সীতানাথ পরামর্শ দিল, কোনও বুদ্ধিমান এ সময় মাল ষ্টক করিবে না ; অর্ডারের মাল নগদ দামে বাজার হইতে কিনিয়া সরবরাহ করাই কর্ত্তব্য। রাধানাথও এ যুক্তির সমর্থন করিলেন। হাতে তখন প্রচুর নগদ টাকা,—দেনাপত্র শোধ করিয়াও যে অর্থ হাতে রহিল, তাহা অন্তের পর্ব্বত! মনও তখন প্রসন্ন।

এই সময় রাধানাথের করতলে আর একটি সৌভাগ্যের রেখা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল সূক্ষ্মদৃষ্টি সীতানাথ শীল। যে জাতকের করতলে এই রেখা ফুটিয়া উঠে, খেলা-ধূলার ভিতর দিয়া বিপুল অর্থলাভ তাহার অদৃষ্টে অবশ্যম্ভাবী।

রাধানাথের উদার চিত্তের উপর সীতানাথের এই ভবিষ্যদ্বাণীও সঙ্গে সঙ্গে প্রভাব বিস্তার করিল। পূর্ণ একটি মাসের মধ্যেই সকলে জানিতে পারিল,—ঘোড়া রোগের আবর্ত্তে পড়িয়া যাহারা রেসের ময়দানে প্রচুর টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলায় প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, রাধানাথ বাবুও হইয়াছেন তাঁহাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

হিতৈষিগণ নিষেধ করিলেন, পত্নী আপত্তি তুলিলেন, এমন কি বিশেষ সৌহৃদ্য না থাকা সত্ত্বেও দুই ভ্রাতা সংবাদ পাইয়া অনুযোগ করিয়া পত্র লিখিলেন, কিন্তু রাধানাথ বাবু অটল,—এই সূত্রে দুই ভ্রাতার সহিতও তাঁহার মর্ম্মন্তুদ বিচ্ছেদ হইয়া গেল। তিন ভ্রাতায় তিন স্থানী হইলেও, যে সম্প্রীতিটুকু ছিল, সীতানাথ উপলক্ষ হইয়া অতি নিপুণভাবে তাহা বিষময় করিয়া দিল।

## ৮

সাত মাস পরের কথা। যুদ্ধের গতি তখন ভীতিপ্রদ হইয়া সমুদ্রপথে বিদেশীয় দ্রব্য সামগ্রীর আমদানী নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। মালের চাহিদা সর্ব্বত্র, আমদানী নাই। লোহা লক্কড়, কাপড়, কাগজ, রঙ্‌, ঔষধ প্রভৃতির বাজারে দর বৃদ্ধির অন্ত নাই। এ বেলার হার ও বেলায় দ্বিগুণ হইয়া সঞ্চয়ীর তহবিল নিত্যই স্ফীত করিতেছে। আবর্জ্জনার স্তুপের মত যে সকল লোহালক্কর মরিচা ধরিয়া উপেক্ষিত হইয়াছিল, যুদ্ধের মাহাত্ম্যে তাহাদের মর্য্যাদা উঠিয়াছে এত উঁচুতে, যাহা আরব্য রজনীর গল্পের মত চমকপ্রদ। ঠনঠনিয়ার পুরানো লোহালক্করের দোকানগুলির সম্মুখে লক্ষপতির গাড়ী সারি দিয়া দাঁড়াইতে দেখা যায়,—দোকানদারেরা চাহিদার অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য্য দেখিয়া মাটী খুঁড়িয়া বহুকালের পুরাতন পরিত্যক্ত মাল সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাই সরবরাহ করিয়া প্রচুর অর্থলাভ করে।

সাতটি মাসের মধ্যেই ব্যবসায় জগতের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এমন কখনও দেখা যায় নাই। দেনার বোঝা ঘাড়ে করিয়া মালের বোঝা আঁকড়াইয়া যাহারা ধীর ভাবে বসিয়াছিল, তাহারা আজ লক্ষপতি। মুখার্জ্জী কোম্পানীই ছিলেন এই অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী, বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানগুলির গৌরব, সঞ্চিত মালের পরিমাণ ও বিদেশ হইতে আমদানী মালের প্রাচুর্য্য এ অঞ্চলে তাঁহাদের অতুল প্রতিষ্ঠা প্রচার করিত। কিন্তু সমস্ত সঞ্চয় হস্তান্তর করিয়া—রেসের মাঠে লব্ধ অর্থের অধিকাংশ

ারাইয়া তাহার দুর্ভাগ্য মালিক এই মাহেন্দ্রক্ষণে অন্যান্যের ভাগ্য
ারিবর্ত্তনের নির্ব্বাক দর্শক মাত্র।

সীতানাথ এখন পাতিরামের কর্ম্ম-সচীব, প্রিয় পারিষদ ও তাহার
গায়েন্দা বিভাগের সরদার। ভৃগুর বচন সন্তর্পণে বর্জ্জন করিয়া
স এখন ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মডার্ণ ভৃগুদেবতার সাকরেদী ব্যাপারে
ৎপর। সামনা সামনি দুইখানি কাষ্ঠময় হাতলদার কেদারা ও তাহার
ধ্যস্থলে একখানি টুল রাখিয়া তাহার উপর অঙ্গ ঢালিয়া
লিকাতার হার্ডোয়ার বাজারের ভাগ্যবিধাতা এক খানা অর্দ্ধমলিন
াটো ধুতি পরিয়া নগ্নদেহে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে ব্যবসায়ের খবর-
ারী করে এবং তাহারই অনতিদূরে তিন হাত পরিমিত খুপরীর মধ্যে
সিয়া মন্ত্রীবর নূতন প্রভুর দুইটি কর্ণে ও পদযুগলে একাধারে সংগৃহীত
মাচার ও তৈলাধার নিঃশেষ করিয়া দেয় ;—এ অবস্থায় কোনো দ্রব্যের
াহিদায় খরিদদার কেহ যদি আসে ও সে দরদস্তুরী সম্বন্ধে কটাক্ষ করে,
াহাহইলে তাহার লাঞ্ছনার আর অবধি থাকে না। পুলিশের দারোগার
াছে সদ্য ধৃত ঘটি-চোরও বোধ হয় সেভাবে কথার রূঢ় প্রহার সহ্য
রে না! আবার, যে বুদ্ধিমান এই পীঠস্থানে প্রবেশ করিয়াই নগদ
বদায় এজেন্সীর বিশ্বকর্ম্মা—হার্ডওয়্যারীর এই বিধাতার অতি প্রশংসায়
ুক্তকণ্ঠ হয়, তাহার খাতির ত অতিরিক্ত ভাবে হইবেই, উপরোক্ত
াহার জন্য দরও হয় স্বতন্ত্র। অথচ সমস্ত বাজারের পীন্ এইখানে
ংগৃহীত,—যে মাল সর্ব্বত্র দুষ্প্রাপ্য, এখানে তাহার রীতিমত প্রাচুর্য্য।
মগ্র মিল অঞ্চল এবং কলিকাতার বাজারে তখন চাহিদার কলরব—পীন্-
ীন্! কিন্তু পীনের অক্ষয় ভাণ্ডার তাহার কূট বুদ্ধিমত্তায় কোন দিন

নিঃশেষিত হয় না।—প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ পীন্ যেমন তাহার ভাণ্ডার হইতে বাহির হইয়া চড়াদরে বিভিন্ন মিলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, আবার তাহার অধিকাংশই নাম মাত্র দরে তাহারই ঘরে পুনঃ প্রবেশ করে!

গুদামে প্রচুর মাল মজুত সত্ত্বেও কতিপয় বিশেষ প্রয়োজনীয় মালের একটি মোটা রকমের 'অর্ডার' পাতিরাম বিলাতে পাঠাইয়াছিল এবং তাহার অসাধারণ ভাগ্য বলে সেই অর্ডার গৃহীত ও তাহা প্রেরিত হইবার সংবাদ ইতিমধ্যেই তাহার সমব্যবসায়ী মহলে ঈর্ষা ও বিস্ময়ের চাঞ্চল্য উপস্থিত করিয়াছে। ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় এই মালের জন্য তাহাকে পাঠাইতে হইয়াছে এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা; কিন্তু এই মালের উপর দালালরা তিন লক্ষ টাকা দর দিয়াছে! তথাপি পাতিরাম অটল। তাহার ধারণা, এই মালের দৌলতে সে হেলায় শ্রদ্ধায় দশ লক্ষ টাকা লাভ করিবে।

সমব্যবসায়ীদের ভাগ্য পরিবর্ত্তনই অবশেষে ভাগ্যান্বেষী রা বাবুর মোহজাল ছিন্ন করিয়া দিল। কিন্তু তখন তাঁহার সঞ্চিত অ অধিকাংশই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের প্রভাবটুকুই কোনও রকমে ঠাট বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। পা প্রায়শ্চিত্ত, বা ভুলের দণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য শেষ অবস্থায় তিনি সর্ব্বস্ব করিয়া শেষ পরীক্ষায় নামিলেন। কলিকাতার জায়গা জমি ও দর তখন দিনের পর দিন চড়িতেছিল। রাধানাথ বাবু অবশেষে সে সুযোগটুকু লইয়া কলিকাতার বাড়ী এক মাড়োয়ারী ধনীর হাতে এ লক্ষ টাকার বিক্রয় করিয়া পরিবারদের টালার বাড়ীতে পাঠাইয়া অতঃপর বাড়ীর মূল্যবান আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া এবং পরিবারব

অলঙ্কারপত্র বন্ধক রাখিয়া সর্ব্বসমেত দেড় লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিলেন।

এই সঞ্চিত টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া কতকগুলি জরুরী মাল আনাইয়া শেষ ভাগ্য পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

সেদিন দ্বিপ্রহরে বিলাতী 'কেবেল' ভয়াবহ বার্ত্তা আনিল—'সিটি অফ লিভারপুল' জলধিবক্ষে জার্ম্মাণীর সবমেরিন কর্ত্তৃক নিমজ্জিত হইয়াছে। এই জাহাজেই আসিতেছিল, পাতিরামের অর্ডারী মাল, যাহার উপর নির্ভর করিয়া সে দশ লক্ষ টাকা লাভের স্বপ্ন দেখিতেছিল! প্রচুর ব্যয় স্বীকার করিয়া সে সময় সকল কারবারীই 'ওয়াররিস্ক' ইনসিওর করাইয়া মাল আনাইতেছিল। কিন্তু পাতিরাম ইচ্ছা করিয়াই তাহা করে নাই। অনেকেই তাহাকে এ সম্বন্ধে উপদেশ দিত, সতর্ক করিতে চাহিত, কিন্তু পাতিরাম দৃঢ়তার সহিত বলিত,—আমার মালের বিনাশ নাই, সুতরাং মালের পড়তার ওপর ওসব বাজে খরচ চাপানো বৃথা।

এ পর্য্যন্ত তাহার কথাই সার্থক হইয়াছে, সত্যই তাহার কোন মালই মারা পড়ে নাই এবং অন্যান্য আমদানীকারকদের তুলনায় তাহার মালের পড়তা অনেক অল্প হওয়ায় সে সকলের অপেক্ষাই লাভবান হইয়াছে ; অথচ তাহার মত এমন দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হইতে আর কোন ব্যবসায়ীকেই দেখা যাইত না, বৃথাই তাহারা মনে মনে তাহাদিগের এই দুর্ব্বার প্রতিযোগিটির প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিত। কিন্তু আজ একি অঘটন ঘটিয়া গেল! বিলাতী কেবেলের খবরে এই নিদারুণ ক্ষতির বেদনা অপেক্ষা তাহার সমব্যবসায়ীদিগের পরিহাসই তাহার পক্ষে অধিকতর মর্ম্মন্তুদ হইল।

সীতানাথ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল,—উপায় ?

ক্ষণিকের বিহ্বলতা হইতে সবলে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া পাতিরাম কহিল,—উপায় আমাদের ধৈর্য্য, আর—

হাতের পাশেই টেবিলের উপর রক্ষিত ছোট হাত-বাক্সটি খুলিয়া বিলাতের ইন্‌ভয়েসটি দেখাইয়া কহিল,—এক ঘণ্টার ভেতরেই এইটে বিক্রীর ব্যবস্থা।

সঙ্গে সঙ্গে সীতারামের কানের কাছে মুখখানা রাখিয়া পাতিরাম অস্ফুট স্বরে যে নির্দ্দেশ দিল, তাহা শুনিয়া স্থির ভাবে ইন্‌ভয়েস খানি সন্তর্পণে লইয়া প্রভুর স্বার্থ সাধনে সীতানাথ দ্রুত পদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

৯

বহুদিন পরে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সীতানাথকে দেখিয়া রাধানাথের মুখে বিস্ময়ের রেখাগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাকে কোন প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়াই সীতানাথ কহিল,—আমি বেইমান নই মুখুয্যে মশাই, একদিন হয়ত আপনার ক্ষতির উপলক্ষ হয়েছিলাম, তাই আজ এসেছি সুদে আসলে সব উস্থল করতে। পাতিরাম পাকড়ের পাল্লায় পড়েছিলাম ; নিজের স্বার্থে নয়, আপনার জন্যই। এই ইনভয়েস এনেছি দেখুন। একদিন যেমন চার হাজার টাকা মুনফায় আপনি তাকে ইনভয়েস্ বেচে ছিলেন, অনেক চেষ্টায় মাত্র চার হাজার টাকা বেশী নিয়ে তার প্রায়-এসে-পড়া-মালের এই ইনভয়েস্ খানা আপনাকে

বিক্রী করতে তাকেও আজ রাজী করিয়েছি। এখনই ব্যবস্থা ক'‌‌রে
ফেলুন, আপনার ক্ষতিটা উসুল হয়ে যাক্, আমিও নিশ্চিন্ত হই।

রাধানাথের দুই চক্ষু আর্দ্র হইয়া গেল। এই সীতানাথ ছিল একদিন তাহার নিত্য সাথী, প্রিয়তম সহচর। পরে ঘটনাসূত্রে কত বড় অবিশ্বাসই ইহার সম্বন্ধে মনে মনে সে পোষণ করিয়াছে। অথচ, তাহার হিতের জন্য কি অপ্রত্যাশিত কার্য্য না আজ সে করিতে বসিয়াছে! হায়, মানুষের মন!

কণ্ঠের স্বর অতঃপর গাঢ় করিয়া রাধানাথ কহিল,—তুমি আমাকে মাপ কর সীতানাথ; কিন্তু ভাই, আমার কাছে মজুত আছে পুরোপুরি দেড় লাখ। এই টাকারই ড্রাফট বিলেতে পাঠাবার কথা। এখনও যে পাঠানো হয়নি, হয়ত এই চান্সটা অদৃষ্টে রয়েছে বলেই।

সীতানাথ কহিল,—নিশ্চয়ই, নইলে ঠিক সময়টিতে আমি আসবো কেন বলুন, আর ঐ অতবড় হুঁসিয়ার মানুষটা নিতান্ত আহাম্মুকের মত আমার কথাটায় হঠাৎ রাজী হবেই বা কেন?

রাধানাথ দ্বিধাবিজড়িত কণ্ঠে কহিল,—কিন্তু ব্যালেন্সটা—

তাহার মুখের এই কথাটা যেন লুফিয়া লইয়া সীতাথাথ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নির্দ্দেশ দিল,—তাতে কি হয়েছে! টাকার জন্য রাধানাথ মুখুয্যের কায আটকাবে না। ব্যালেন্স চল্লিশ হাজার, আর ঐ ইনভয়েসের ওপর মুনফার চার হাজার—এই চুয়াল্লিশ হাজারের একখানা 'অনডিম্যাণ্ড আই প্রমিস টু পে' লিখে দিন আপনি। তারপর মাল এলে, বিক্রী ক'রে টাকাটা চুকিয়ে দেবেন তখন।

এই যুক্তিটা শুনিবামাত্র রাধানাথের মস্তিষ্কের ভিতর আভিজাত্যের

অভিমান অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই আগুনের আলোকে অতীত ও ভবিষ্যতের বহু অবাঞ্ছিত চিত্র তাহার চক্ষুর উপর সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। সে লিখিয়া দিবে পাতিরাম পাকড়ের নামে অনডিম্যাণ্ড 'হ্যাণ্ডনোট'! চুলায় যাউক তাহার কারবার, লাভের মুখে পড়ুক ছাই,—পয়সাই কি দুনিয়ায় এত বড়! লোভে পড়িয়া সে আজ পিতা-পিতামহের নামে কলঙ্ক মাখাইয়া দিবে! তাহার পিতা একদিন যাহাকে উপেক্ষা করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন এবং বিদায় কালে যে নির্দ্দেশ তাহাকে জানাইয়া দেন, তাহাই সে আজ কালিকলমে আঁকিয়া প্রতিপন্ন করিবে—এই লোকটির নিকট হাত পাতিবার প্রয়োজন সত্যই তাহার কর্ম্মজীবনে উপস্থিত হইয়াছে! রাধানাথের মনে হইল, এইভাবে ইনভয়েস বিক্রয়ের মূলে নিশ্চয়ই পাতিরামের কোনও ক্রূঢ় উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সে তখন সহসা মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল— কি বললে, আমি লিখব হ্যাণ্ডনোট পাতিরাম পাকড়ের বরাবরে? কথাটা তুলতে তোমার মুখে আটকালো না সীতানাথ! কি তুমি আমাকে মনে করেছ শুনি?

সীতানাথ ভাবিয়াছিল, তাহার শেষের প্রস্তাবটি রাধানাথের আরও প্রীতিপ্রদ হইবে এবং ইহাতে সে বর্ত্তাইয়া যাইবে। এখন বুঝিল, জাত সাপ যতই নির্জ্জীব হউক, ল্যাজে ঘা পড়িলেই ফোঁস করিয়া উঠে; দংশন করিবার শক্তি না থাকিলেও 'চক্কর' তুলিতে দ্বিধা করে না। প্রস্তাবটা পাল্টাইয়া অন্যদিক দিয়া ঘুরাইয়া বলিবার জন্য সীতানাথ যেমন তাহার মুখটি খুলিবে, অমনই ক্রীং ক্রীং শব্দে রাধানাথবাবুর সুদৃশ্য সেক্রেটেরিয়েট টেবল সংলগ্ন টেলিফোনটি বাজিয়া উঠিল।

রিসিভারটি কানে লাগাইয়া রাধানাথবাবু কহিল,—হ্যালো, কাকে চান ?……সীতানাথ শীল ?……হ্যাঁ, আছে,……তাকেই দিচ্ছি।

সচকিতভাবে সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিল,—কি ব্যাপার ?

রাধানাথ কহিল,—ধরো, তোমাকেই কে ডাকছে; বোধহয় তোমার মনিব পাকড়েই হবে।

সীতানাথের বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিতেছিল, তাহার মাত্রা বুঝি আরও বাড়িল। রাধানাথবাবুর হাত হইতে রিসিভারটা কম্পিত হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কে ?……হ্যাঁ আমি সীতানাথ…না এখনো হয় নি—একটু গোল বেঁধেছে……আচ্ছা—এখুনি যাচ্ছি—

রিসিভারটি যথাস্থানে রাখিয়া সীতানাথ কহিল,—বলেন কেন ? ছোটলোকের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা গেল ! হুকুম হল—শীগ্‌গীর এসো—কিছু বলবার আছে, ফোনে হবে না—এখানেই বলবো !—আবার ছোটো।—যাক্, আমি হ্যাণ্ডনোটের কথাটাও তুলে বলবো—ওসব হবে টবে না। আমি এলুম বলে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে টেবলের উপর হইতে বিলাতী ইনভয়েস খানি খপ্ করিয়া তুলিয়া লইয়া সীতানাথ ঝড়ের মত বেগে বাহির হইয়া গেল।

রাধানাথবাবু ব্যাপারটার আগাগোড়া তলাইয়া বুঝিবার জন্য স্থিরভাবে মস্তিষ্ক চালনা করিতেছে, এমন সময় সেই কক্ষে ধীরে-ধীরে প্রবেশ করিল তাহার বাল্য সুহৃদ ও কর্ম্মক্ষেত্রের সহযোগী কৃত্তিবাস কোলে। আজ তাহার সাজ সজ্জা য়ুরোপীয়ের মত, মাথায় সোলার হ্যাট, মণিবন্ধে রিষ্টওয়াচ, চোখে চশমা, মুখে হাভেনার মোটা চুরুট, হাতে ছড়ি।

টুপীটি খুলিয়া য়ুরোপীয় কায়দায় অঙ্গভঙ্গী করিয়া কৃত্তিবাস কহিল,—হ্যালো মিষ্টার মুখার্জ্জী—গুড্ ইভনিং—হা ডু-ডু-ডু—

রাধনাথ প্রথমটা চিনিতেই পারে নাই লোকটা কে! কিন্তু বেপরোয়াভাবে তাহাকে একেবারে পাশের চেয়ার খানায় বসিতে দেখিয়া সে সবিস্ময়ে কহিল,—কৃত্তি—তুমি? বেশ যা হোক! খুব লোক ত তুমি—

চুরুটটায় একটা টান দিয়া কৃত্তিবাস কহিল,—একথা তুমি একশো বার বলতে পারো; আর, এটা শোনবার জন্য আমি তৈরী হয়েই এসেছি। যদিও পীঠে কুলো বেধে আসিনি, কিন্তু আমার গত কটা বছরের ডেসপ্যারেট য়্যাডভেঞ্চার শুনলে তুমি নিশ্চয়ই অতীতের সব কথাই ভুলে যাবে, এমন কি সাত খুন পর্য্যন্ত মাপ্ করবে—এ ভরসা আমার আছে।

রাধানাথ মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল,—আমাকে ভাঁওতা দিয়ে কারবারটা পাকড়েকে বেচে দিলে। টাকাগুলো নিজেই সব নিয়ে একেবারে গায়েব হলে, আমার পাওনাগণ্ডা একটা পয়সাও দিলে না—

কৃত্তি কহিল,—ই'য়েস, আই য়্যাডমিট্, ব্যাট—

রাধানাথ এবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কৃত্তির মৃদু কণ্ঠের বক্তব্যটুকু ভাসাইয়া দিয়া কহিল,—আমার পাওনা ক'হাজার টাকার জন্য আমি থোড়াই পরোয়া করি! কিন্তু জানো, কত বড় সর্ব্বনাশ তুমি করেছ—ঐ ইতরটাকে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের রাস্তা দেখিয়ে—হার্ডওয়ারী মার্কেটের সুড়ুক সন্ধান দিয়ে? ওর মাছের বাজারে তুমি ত ঢুকতে গিয়েছিলে, কিন্তু সেখানে আঁস-বঁটীর জলে নাকানি-চোপানী খাইয়ে তোমাকে তাড়িয়ে

তবে ছাড়লে, আর তুমি এমনি আহাম্মুখ যে, তাকেই সর্ব্বস্ব সঁপে দিয়ে সরে পড়লে! জানো—মেছো হাটার সেই ভোঁদোড়টা আজ হার্ডোয়ার মার্কেটের কুমীর হয়ে বসেছে?

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কৃত্তিবাস মৃদু হাসিয়া কহিল,—জানি। যদিও সেই থেকে টুরে বেরিয়েছিলুম এবং হপ্তাখানেক ই'ল ফিরিছি, কিন্তু এসেই কলকেতা মার্কেটের সমস্ত খবরই নখদর্পণে ছকে নিয়েছি। তা ছাড়া—তোমার জন্যও এত সব খবর আর সুযোগ সংগ্রহ করে এনেছি, যাতে তোমার সব ক্ষতিই উসুল হয়ে যাবে, আর ডুবু-ডুবু জাহাজখানা ফের পাকা ডুবুরীর মত ভুস্ করে ভেসে উঠবে। হতাশ হয়ো না বন্ধু, Don't afraid, আমি সবই বুঝেছি—অনুভব করছি, The wearer only knows where the shoe pinches.

রাধানাথ এবার সহজকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—কোথায় ছিলে এতদিন?

কৃত্তিবাস কহিল,—সে একটা ইতিহাস, বলতে সময় লাগবে; ধীরে সুস্থে অন্য সময় বলবো। শুধু সংক্ষেপেই মোটামুটি হিসেবটা দিচ্ছি—মেসোপটেমিয়া থেকে বিলেত মায় ফ্রান্স পর্য্যন্ত টুর করে এসেছি, এই কটা বছরে—

বিস্ময়ের সুরে রাধানাথ কহিল,—বল কি? য়ুরোপ ঘুরে এসেছ?

কৃত্তিবাস কহিল,—শুধুই ঘুরে আসিনি, অনেক অভিজ্ঞতা এবং হার্ডওয়ারী বিজনেসের হড়াহদ্দ অর্থাৎ গোপন রহস্য সমস্তই সংগ্রহ করে এনেছি। ফের চুটিয়ে কারবার করছি।

—ক্যাপিট্যাল? সেটাও নিশ্চয় সংগ্রহ করে এনেছ?

—না। নিজের পয়সা বার ক'রে এযুগে যারা ব্যবসা ফাঁদে, তারা

আমার ভাষায় আহাম্মুখ। পরের পয়সা বার ক'রে—নিজের পকে ভারি করাই হচ্ছে আসল কারবার। তার ফন্দী আমি আবিষ্কা করেছি, বুঝলে ?

—কিন্তু কার পকেট মেরে নিজের পকেট ভরবার সঙ্কল্প করেছ, শুনি

—আপাততঃ আমাদের বাল্যবন্ধু—পাকড়ের। মূলধনটা তার কা থেকেই আদায় করবো ভেবেছি। তারপর, যার শীল যার নোড়া- তারই ভাঙ্গবো দাঁতের গোড়া।

—পাকড়ের সঙ্গে তাহলে দেখা করেই আসছো ?

—না ; এখনো সে মুখো হইনি। প্রথমে তার কাছেই যা ভেবেছিলুম, কিন্তু সেটা আপাততঃ মুলতুবী রেখে তোমা কাছেই এসেছি।

রাধানাথ কহিল,—আমার সৌভাগ্য। কিন্তু একটু আগে পাক আমার কাছে লোক পাঠিয়েছিল যে।

কৃত্তিবাস বিস্ময়ের সুরে কহিল,—বল কি! তাহলে পাকড়ের স ভাব হয়ে গেছে—লেন দেন চলছে বোধ হয় ?

রাধানাথ কহিল,—ঠিক ডাইরেক্ট নয়, ঘুরিয়ে ; অর্থাৎ মধ্যস্থ দিয়ে সেই মধ্যস্থটি একটা 'দাঁও' নিয়ে এসেছিল।

কৃত্তিবাস কহিল,—বটে! তা দাঁওটা মেরেছ নিশ্চয়ই ?

রাধানাথ কহিল,—না, বাধা পড়ে গেল হঠাৎ। ব্যাপারটা হচ্ছে- একটা মোটা টাকার চালান তার বিলেত থেকে আসছে—সিটি অ লিভারপুল জাহাজে—

—কি জাহাজ বললে ?

—সিটি অফ লিভারপুল!—ব্যাটল্‌ফীল্ডের গোলার আওয়াজ শুনে শ্রবণশক্তিটাও তুর্ব্বল হয়েছে নাকি হে?

কৃত্তিবাস মনের চাঞ্চল্য দমন করিয়া কহিল,—না, তাহলে কথাটা খপ্‌ করে ধরতুম না! আচ্ছা—তোমার কথাটাই আগে শেষ কর।

রাধানাথ কহিল,—মালটা যে আসছে, সেটা বাজার শুদ্ধ সবাই জানে। আর ঐ মাল বেচে পাকড়ে যে মোটা রকমের একটা দাঁও মারবে, তাতে কিছুমাত্র ভুল নেই। চার হাজার টাকা মুনফা নিয়ে মালের ইনভয়েসটা আমাকে বেচবার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। কিন্তু একটা কথায় আমার মেজাজটা হঠাৎ বিগড়ে গেল, আর সেটা কেনা হল না।

কৃত্তিবাস এবার গম্ভীর হইয়া কহিল,—একটা সাংঘাতিক বুলেট তাহলে তোমার রগ ঘেঁসে বেরিয়ে গেছে বল! দেখছি, সত্যিই এবার তোমার জিতের পালা রাধু!

সন্দিগ্ধকণ্ঠে রাধানাথ কহিল,—এ কথার মানে?

সহজকণ্ঠেই কৃত্তিবাস উত্তর দিল,—সিটি অফ্‌ লিভারপুল' জার্ম্মাণীর গোলায় প্যাসিফিকের বুকে তলিয়ে গেছে; পাকড়ের মাল গুলোরও সেই সঙ্গে সলিল সমাধি হয়েছে।

রাধানাথের মনে হইল, সিটি অভ লিভারপুলের সহিত সে ও বুঝি জলধিতলে তলাইয়া যাইতেছিল, সহসা কে যেন তাহাকে জলের উপরে তুলিয়া দিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া সে কহিল,—তুমি ঠিক শুনেছ? খবর সত্য?

কৃত্তিবাস কহিল,—ফোন্‌ করে খবর নিতে পারো; আর একটু পরেই

ইভনিং এম্পায়ারে এ খবর ছাপার হরফেই দেখতে পাবে। হায় বেচারী —পাকড়ে! দাঁওটা চালিয়েও বাগাতে পারলে না!

রাধানাথ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল,—কি সর্ব্বনাশ করতে বসেছিলুম! উঃ—কি সাংঘাতিক লোকরে বাবা! এই জন্যই বাড়ী বয়ে এসে সাধাসাধি! ওঃ—ভাগ্যিস্ রাজী হইনি, তাহলে ত রাস্তায় দাঁড়াতে হ'ত!

কৃত্তিবাস একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আমার কিন্তু হরিষে বিষাদ হচ্ছে।

রাধানাথ প্রশ্ন করিল,—কেন?

কৃত্তিবাস কহিল,—অনেক মাথা খেলিয়ে আমিও একটা দাঁও মারবার ফিকিরে এসেছিলুম হে! লাখ দুই টাকা ওর ফাঁসিয়ে দিতুম, আর সেইটিকে ক্যাপিটেল করে, নতুন কারবার ফেঁদে বসতুম। কিন্তু এখন ভাবছি, এত বড় ঘা খেয়ে, আর কি ও হাত ঝাড়বে!

—ব্যাপারখানা কি? কি আবার নতুন মতলব ফেঁদেছিলে?

—বলবো পরে, তোমার বাড়ীতে গিয়ে, এখানে নয়।

ক্রীং-ক্রীং-ক্রীং—টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

রিসিভার ধরিয়া রাধানাথ প্রশ্ন করিল,—কে?

উত্তর আসিল,—আমি সীতানাথ শীল। প্রণাম রাধানাথ বাবু! দেখুন, মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে আপনার কাছেই গিয়েছিলুম, কিন্তু আপনি তাঁকে ঠাঁই দিলেন না! আমার অমন প্রস্তাবটা ঠেলে ফেলে নিজের পায়েই কুড়ুল মারলেন।

সীতানাথের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে রাগে রাধানাথের পা হইতে

মাথা পর্য্যন্ত বুঝি একটা অব্যক্ত জ্বালা ধরাইয়া দিল। বক্তাকে নিকটে পাইলে, সে হয়ত হাতের রিসিভারটা ছুঁড়িয়া তাহার মুখে মারিয়া ইহজীবনের মত বাকশক্তি রুদ্ধ করিয়া দিত। মনের রাগটুকু মুখে প্রকাশ করিয়া সে কহিল,—আর বুজরুকী করতে হবে না; আমাকে ফাঁসাতে এসেছিলে তুমি ঐ পাজীটার পরামর্শে; কিন্তু আমি জেনেছি, সিটি অফ লিভারপুল মারা গেছে—

সীতানাথ উত্তর দিল—আপনি মিছে আমার ওপর রাগ করেছেন। আপনি এখন যেটা শুনেছেন, আপনার কাছে যাবার অনেক আগেই আমি তা শুনেছি। সত্যিই সিটি অফ লিবারপুল ডুবে গেছে। কিন্তু তাতে আপনার কিছু এসে যেত না, বরং মা-লক্ষ্মীই তাতে আপনার দোরে বাঁধা পড়তেন—

রাধানাথ কহিল,—দেখছি, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। আরে, বোকারাম, ঐ জাহাজেই ত ইনভয়েসের মাল আসছিল—যেটা আমাকে বেচবার ফন্দীতে এসেছিলে!

সীতানাথ উত্তর দিল,—সবাই তাই জানতো, এমন কি পাকড়ে পর্য্যন্ত। কিন্তু এর পরের খবরটা শুধু আমারই জানা ছিল, সেটা চেপে রেখেই আপনার কাছে গিয়েছিলুম—আপনার ভাগ্যটা ফিরিয়ে দেবার কিন্তু তা আর হল না। সেইটিই এখন জানাচ্ছি শুনুন :—সিটি অফ লিভারপুল-ম্যাসাকারের 'কেবেল' পাবার একটু পরেই বিলেতের পার্টির কাছ থেকে আলাদা যে 'কেবেল' খানা এসেছে, সেটা হচ্ছে এই—

আপনার অর্ডারী মালগুলি যথারীতি ওয়ার-রিস্ক ইনসিওর হয় নাই, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে এই কোম্পানীর কোন দায়িত্ব

রহিল না। পূর্ব্বপ্রেরিত ইনভয়েসে এ কথা উল্লেখ করা হয় নাই বলিয়া এই 'কেবেলে' সেই ভুল সংশোধন করা হইতেছে। আর ইহাও জানানো আবশ্যক মনে করা যাইতেছে যে, 'সিটি অফ লিভারপুলে' স্থান না হওয়ায় আপনার মালগুলি 'কিংএডোয়াড' জাহাজে পাঠানো হইয়াছে।—শুনলেন খবর?

খবরটি শুনিয়াই রাধানাথের হাত হইতে রিসিভারটি সশব্দে টেবলে উপর পড়িয়া কৃত্তিবাসকেও চমকিত করিয়া দিল।

## ১০

সীতানাথ টেলিফোনে শেষের যে খবরটি দিয়াছিল, তাহা যে নির্ঘা সত্য, সেই দিনের সান্ধ্য পত্রিকা "এম্পায়ারে" প্রকাশিত চমকপ্র সংবাদেই তাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া গেল।

রাধানাথ বুঝিল, সে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়াছে। যদি ব্যাংকে টাকার জন্য হ্যাণ্ডনোটখানা লিখিয়া দিয়া ইনভয়েসটা কিনিয়া ফেলিত!

কিন্তু কৃত্তিবাস তাহাকে বুঝাইয়া দিল,—তুমি দেখছি ঐ চীজকে এখনো ভালো করে চেনো নি! ও সেই পাত্রই বটে! শেষের খবরা পাবার আগেই, তোমার মাথায় কাঁঠালটা ভাঙবার চেষ্টা করেছিল। তা যদি না হবে, সীতানাথকে ডেকে পাঠালে কেন? এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, এখানে সে-ই সীতানাথকে ওটা বেচতে পাঠিয়েছিল, তারপর শেষে

কেবেলখানা যেই এসে পড়ে, ওমনি ফোন্ করে তার দূতটিকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিলে। ও কি কম ধড়িবাজ!

রাধানাথ এতক্ষণে কথাটার সমর্থন করিল ও মৃদুস্বরে কহিল,—ঠিক।

কৃত্তিবাস কহিল,—মনে নেই তোমার, ইস্কুলে আমরা ওকে খেঁপাতুম "পাতিরাম পাকড়ে, না পেয়ে আঁকড়ে!" এখন দেখছি, ছড়াটা হুবহু সত্যি হয়ে গেছে।

রাধানাথ জোরে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—ও যে এ রকম ক'রে বাজারশুদ্ধ সবাইকে দাবিয়ে দেবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। মানুষ যে এত বড় ফন্দীবাজ সত্যি সত্যিই হতে পারে, সেটা কখনো ভাবিনি। বুদ্ধির দোষে আমি আজ সমুদ্রে ভাসছি, আর বুদ্ধির জোরে ও আজ মনুমেণ্টের মত জেঁকে বসেছে—কলকেতার বুকে।

কৃত্তিবাস কহিল,—ওর গোড়া থেকেই লক্ষ্য হচ্ছে—আর সবাইকে দাবিয়ে দিয়ে জেঁকে বসবে, তা সে চালাকী করেই হোক, আর অধর্ম্ম করেই হোক; আমরা ত তা পারিনি!

রাধানাথ এবার তর্জ্জন করিয়া কহিল,—থাক্, তুমি আর টস্ দেখিয়ো না, ভারি ধর্ম্মাত্মা হয়েছেন আজ! বলে—জন্ম গেল ছেলে খেয়ে, আজ হয়েছেন সাধু! তুমিই ত খাল কেটে কুমীরকে ঢুকিয়েছ; নইলে, হার্ডওয়ারী মার্কেটের রাস্তা ও চিনতো? তুমি যদি তোমার কারবারটা ওকে বেচে না দিতে—কোনদিন ও এখানে পাত্তা পেতো?

কৃত্তিবাস আজ দমিল না, সঙ্গে সঙ্গেই কথাটার এইভাবে উত্তর দিল, —কিন্তু তার গোড়াতেও তুমি! কথায় আছে খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে,

কাল হল তার এঁড়ে গোরু কিনে! করছিল ও-বেচারা মাছের কারবার তাতে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠেছে খবর পেয়ে, তুমি কেন সে দিকে নজর দিতে গেলে? এর মূলকাঠি ত তুমি, তারপর আমি না হয় তোমার সঙ্গে জয়েন করেছিলুম। কিন্তু তুমি আড়ালে থেকে, শিখণ্ডীর মত আমাকে আগিয়ে দিলে। আমি নাস্তানাবুদ হয়ে সর্ব্বস্ব খোয়ালুম; তখন কি করি বল, চাচা আপন বাঁচা নীতিই নিতে হল! তুমিই বা তখন কতটুকু উদার হয়েছিলে? যে উদারতা ও দেখালে, তুমি কেন সেটুকু দেখাও নি? তুমি তখন নিজের কোলেই ঝোল টানতে চেয়েছিলে; সে অবস্থায় আমারই বা দোষ কি? আর তুমি ত জানই, চিরদিনই আমি সুবিধাবাদী।

রাধানাথ কহিল,—কিন্তু কারবারটা ওকে বেচে কি এমন সুবিধাটা তোমার হয়েছিল শুনি? তোমার টাটে বসেই, আটঘাট সব বেঁধে মাস খানেকের মধ্যেই সুড়ুক সন্ধান সব জেনে নিয়ে আর কাজটুকু গুছিয়ে কারবারের নামটা পর্য্যন্ত ও পালটে দিলে! কেন দিয়েছিল জান? পাছে তোমার পৈতৃক কারবারটির নামটুকুও বজায় থাকে, পাছে ভবিষ্যতে কেউ বলে বা জানতে পারে—আসলে এই কারবারের টাটখানা অমুক কোলের!

কৃত্তিবাস কহিল,—সে আমি জানি, আর তার জন্য আমার কোন দুঃখই নেই। য়ুরোপ ঘুরে এসে যে আইডিয়া আমি পেয়েছি, হাতে কলমে যে সব জেনে এসেছি, তাতে ঐ নগদ বিদায় এজেন্সীর নাকের ওপর যদি আর একটা হার্ডওয়ারী গম্বুজ বানিয়ে তার ওপর থেকে তোপ না দাগি—তাহলে আমার নাম কৃত্তিবাসই নয়।

রাধানাথ গম্ভীর ভাবেই কহিল,—ভালো।

অতঃপর একদা পাতিরামের বাড়ীতে কৃত্তিবাসের আকস্মিক আবির্ভাব পাতিরামকেও চমৎকৃত করিয়া দিল।

বাড়ীর বাহিরে সেই সুপরিচিত ঘরখানির ভিতরে তক্তপোষে বিছানো মলিন বিছানাটির উপর বসিয়া পাতিরাম তাহার এখানকার এজলাসের কায চালাইতেছিল। বাহিরের উঠানটির বাঁধানো চাতাল ভরিয়া বিভিন্ন সমাজের, খাতকশ্রেণী তৃষিত চাতকের মত বাঞ্ছিত বস্তুটির আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত বক্ষে বসিয়া আছে। এখানে পাতিরামের সাধারণ তেজারতির কারবার চলে। নিরক্ষর মজুর শ্রেণীর বা ছোট খাটো কারবার চালাইয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, খত বা হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া টীপ সহি লইয়া পাতিরাম এখানে তাহাদিগকে পাঁচ হইতে একশো পর্য্যন্ত টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে। নূতন কর্জ্জ লইতে বা কর্জ্জের সুদ দিতে সকালের দিকে এই স্থানে প্রত্যহ চল্লিশ পঞ্চাশটি প্রার্থী ও খাতকের সমাগম হইতে দেখা যায়।

কৃত্তিবাস এখানেও সাহেব সাজিয়া আসিয়াছিল এবং প্রথমেই তাহার দিকে উঠানে সমবেত খাতকগণের নজর পড়িতেই তাহারা সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল। কয়েকজনের মুখ হইতে এক সঙ্গেই একটা চাপা স্বর বাহির হইয়া আসিল,—সাহেব—সাহেব!

পাতিরামও প্রথমটা আগন্তুককে দেখিয়া একটু বিস্মিতই হইল। তাহার আফিসে প্রত্যহ এরূপ অনেক সাহেবেরই আনাগোনা হইয়া থাকে, তাহার বাড়ী বাহিয়া আসিল এই লোকটা কে! কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখখানা হাসিতে ভরিয়া গেল, অভ্যর্থনার ভঙ্গীতেই সে কহিল,—আরে

এসো, প্রথমটা ভড়কেই গিয়েছিলুম তোমাকে দেখে—গরীবের কুঁড়েতে কোথা থেকে আর কি মনে করে সাহেব লোক এসে সেঁধুলো! কিন্তু বেশীক্ষণ চোখে ধুলো দিয়ে রাখতে পারোনি, ধরে ফেলিছি। ওরে বে আছিস্, চেয়ার খানা খালি করে দে, সাহেব দাঁড়িয়ে আছে দেখছিস্ না!

তক্তপোসের পাশেই একখানা চেয়ারের উপর কতকগুলি বই ও খাতাপত্র স্তূপীকৃত হইয়াছিল। পরিচারক তুলসী তাড়াতাড়ি আসিয়া সেগুলি অনত্র রাখিয়া চেয়ারখানা খালি করিয়া দিল।

কৃত্তিবাস উঠানে দাঁড়াইয়া পাতিরামের খাতকদিগকে দেখিতেছিল সহসা তাহার চোখের উপর মেছোহাটার স্মৃতি ভাসিয়া উঠিল। বুঝিল সমান শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা সে সর্ব্বত্র কায়েম রাখিয়াছে। এতগুলি লোক বসিয়া আছে, টুঁ শব্দটি কাহারও মুখে নাই।

পাতিরাম ডাকিল,—ওহে সাহেব, ভেতরে এসো।

উঠানে উপবিষ্ট সঙ্কোচকুণ্ঠিত মানুষগুলির পাশ কাটাইয়া কৃত্তিবাস সামনের ছোট ঘরখানির ভিতর প্রবেশ করিতেই পাতিরাম চেয়ারখানি দেখাইয়া দিয়া কহিল,—ব'স।

কৃত্তিবাস চেয়ারে বসিয়া মুখে একটু হাসি আনিয়া কহিল,—ভেবে ছিলুম চিনতে পারবে না।

পাতিরাম কহিল,—বিলক্ষণ! ইস্কুলে পড়া কথামালার গল্পটা ভুলে গেলে? ভোল বদলালে সবাই ভোলে না। মনে নেই—দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছ প'রে ময়ূরগুলোকেও ঠকাতে পারেনি, কাকগুলোকেও নয়; ঠকেছিল সে নিজেই।

কৃত্তিবাসের মুখখানা এক নিমেষে যেন অন্ধকার হইয়া গেল। একটি কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

বক্রদৃষ্টিতে কৃত্তিবাসের মুখের ভাবটুকু দেখিয়া লইয়া পাতিরাম উঠানের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া হাঁকিল,—গুইরাম ধাড়া—

ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া উঠানে সমবেত লোকগুলির পুরোবর্ত্তী প্রৌঢ়বয়স্ক মানুষটি দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

পাতিরাম দৃষ্টি ফিরাইয়া কৃত্তিবাসের দিকে ফেলিয়া কহিল,—সাহেবকে একটু বসতে হচ্ছে ; দেখতেই ত পাচ্ছ, পালখানেক খদ্দের এসে জমেছে, আমি টপাটপ কাযগুলো সেরে নিয়েই তোমার সঙ্গে আলাপ করছি। ক্ষতি হবে কি ?

শুষ্ককণ্ঠে কৃত্তিবাস কহিল,—না ; একটা জরুরী কথা নিয়েই আমি এসেছি, নিরিবিলিতেই তোমাকে বলবো ; তুমি তোমার কার্যগুলো সেরে নাও।

পাতিরাম হাঁক দিল,—ওরে তুলসে, সায়েবের জন্যে ভালো করে চা তৈরী করিয়ে আন্ ; আর তার সঙ্গে, কেক, সিঙ্গাড়া, নিম্‌কী আর গোটাকতক রসগোল্লা ; এই—নে !

আশে পাশে, বালিশের নীচে, চারিধারেই নোট, টাকা ও রেজগী অগোছাল অবস্থায় পড়িয়াছিল। একটা টাকা তুলিয়া পাতিরাম তুলসীর দিকে ফেলিয়া দিল।

কৃত্তিবাস প্রতিবাদের একটা কৃত্রিম ভঙ্গী প্রকাশ করিয়া কহিল,—না-না, ওসবের দরকার নেই—

পাতিরাম কহিল,—খুব দরকার আছে, খালি পেটে কথার জুত হয় না, বিশেষ সায়েব লোকের পক্ষে।

কৃত্তিবাস চুপ করিয়া রহিল। পাতিরাম দ্বারদেশে দণ্ডায়মান গুইরাম ধাড়ার দিকে চাহিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিল,—বেধো কাঠের মতন ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই কায হয়ে যাবে কেমন? আমার ত আর এখানে কায কর্ম্ম কিছু নেই,—তোমাদের পেট ভরানো ছাড়া! জ্বালাতন—জ্বালাতন!

গুইরাম বেচারী ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, তাহার কি ত্রুটি, এখন কি তাহার কর্ত্তব্য! যাই হোক, কোঁচার কাপড়ে যে কাগজ খানা মুড়িয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেখানা খুলিয়া পাতিরামের দিকে আগাইয়া দিল।

চীলে যেমন ছেলের হাত হইতে খাবার ছোঁ মারিয়া লয়, ঠিক সেইভাবে সেখানা লইয়া বিকৃতকণ্ঠে পাতিরাম কহিল,—হারামজাদা কোথাকার! একবারে পিণ্ডি চটকে এনেছে খত খানার। ক টাকার খত

গুইরাম হাত জোড় করিয়া কহিল,—পাঁচ কুড়ি পাঁচ আগাম দেবার—

তর্জ্জনের সুরে বাধা দিয়া পাতিরাম কহিল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে সব জানা আছে। যেটা জিজ্ঞাসা করবো, সেই কথার জবাব শুধু দিবি সব বায়নাক্কা শোনবার আমার সময় নেই।

খতখানা খুলিয়া তাহার উপর চকিতে দৃষ্টিটুকু বুলাইয়া পাতিরা কহিল,—এগিয়ে আয়, বুড়ো আঙ্গুলটা দে—

কাছেই টীপ সহি লইবার কালি মাখা পাথরখানা পড়িয়াছিল গুইরামের আঙ্গুলটির ছাপ দলিলখানির যথাস্থানে নিজের হাতে চাপি

দিয়া পাতিরাম তাহাকে রেহাই দিল। সঙ্গে সঙ্গে দশ টাকার সাত খানি নোট এবং টাকায় ও রেজগীতে নয় টাকা এগারো আনা গুইরামের হাতে দিয়া কহিল,—এ মাসের স্থদ টাকায় এক আনা ক'রে হিসেবে আগাম কেটে নিয়েছি, বুঝলি? মাসের গোড়াতেই স্থদটি এমনি করে আগাম দিয়ে গেলে, এরপর দুপুর রেতে টাকার জন্যে এলেও ফিরতে হবে না।

ঘাড় নাড়িয়া কথাটায় সায় দিয়া গুইরাম চলিয়া গেল। এবার ডাক পড়িল,—হরিহর পাঁজা—

এইভাবে এক জনের পর একজনকে ডাকিয়া এবং নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জোরে প্রত্যেককে দাবাইয়া পাতিরামের হাতের কাযগুলি শেষ করিতে দুইটি ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল।

কৃত্তিবাস ইতিমধ্যে চা ও তৎসহ নানাবিধ জলযোগে পরিতৃপ্ত হইয়া আগ্রহ সহকারে এই অদ্ভুত মানুষটির কার্য্যপদ্ধতি দেখিতেছিল।

আদান প্রদান শেষ হইলে, দলিলগুলি গুড়াইয়া তক্তপোষের পার্শ্বে মেঝে ও দেওয়ালের সহিত গাঁথা লোহার সিন্দুকটির ভিতর নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিল। বিছানার নানা অংশে আস্তৃত নোট, টাকা, রেজকীগুলিও সিন্দুকের স্থনির্দ্দিষ্ট আধারে আশ্রয় পাইল।

কৃত্তিবাস নিবদ্ধ দৃষ্টিতেই দেখিল, খাতকের হাতের টীপ সহি হইতে আরম্ভ করিয়া টাকার আদান প্রদান ও লোহার সিন্দুকের ভিতর সংস্থান সম্বন্ধে পাতিরাম কোনও অনুচরের সহায়তা গ্রহণ করিল না, স্বহস্তেই এই কাযগুলি সম্পন্ন করিল।

উঠানটি জনশূন্য হইলে পাতিরাম একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া

কহিল,—আঃ, বাঁচা গেল! বল কেন, রোজ সকালে আড়াই ঘণ্টা ধরে এই কর্ম্মভোগ চলে।

কৃত্তিবাস হাসিয়া কহিল,—কিন্তু ব্যাপার যা দেখছি, তাতে লাভের যোগও কম নয়।

কথাটা পাতিরামের ভাল লাগিল না, ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিল,—কি ভেবে কথাটা বলছ?

কৃত্তিবাস কহিল,—ভেবে কেন, স্বচক্ষে দেখে। টাকা যা ধার দিলে তার আগাম সুদ বলে কেটে নিয়ে সিন্দুকে যা তুললে—দেড়শোর ওপর হবে।, আড়াই ঘণ্টার মধ্যে এই উপার্জ্জন; টাকায় আনা হিসাবে সুদ,—তুমি সত্যিই বাহাদুর!

পাতিরাম মুচকি হাসিয়া কহিল,—এটা হচ্ছে দর্শনডালি, দেখতে শুনতেই বেশ! শেষ পর্য্যন্ত টাকা আদায় করতে ঝকমারির চূড়ান্ত! শুধু হাতে টাকা দিতে হলে, সুদটা একটু চড়িয়েই নিতে হয়, তাতে দোষ নেই। হরে দরে শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু সেই হাঁটু জলেই দাঁড়ায়। কেউ ফেরার হয়, কেউ কলা দেখায়, কেউ বা পটল তুলে আমাকেও পুতুল বানিয়ে দেয়। যা যায়, সব কি আসে ভাব? ঘর থেকে ত বেরিয়ে গেল আড়াই ঘণ্টার ভেতরে আড়াইটি হাজারের ওপর, এলো কুল্লে দেড়শো! বাকিটা যে আসবে, মারা যাবে না, তার কোন কথা আছে? আর ও কাগজগুলো ত কলা পাতার সামীল, কি ওর দাম আছে? বরাত—বরাত! দুর্ভোগ!

কৃত্তিবাস তখন মনে মনে মহলা দিতেছিল, কেমন করিয়া তাহার কথাগুলি পাতিরামের কানে তুলিয়া চমক লাগাইয়া দিবে। সে এবার

সুযোগ বুঝিয়া খপ করিয়া কহিল,—তা মিছে নয়, মহাজনী করা মার্চ্চেন্টদের পোষায় না, তাদের টাকা খাটাবার রাস্তা আলাদা। তেমনই একটা রাস্তার খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এসেছি।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টি এই সন্দেহ জনক মানুষটির মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া পাতিরাম প্রশ্ন করিল,—ব্যাপারখানা কি ?

কৃত্তিবাস কহিল,—একটা জমিদারী কিনবে ? খুব দাঁওয়ে যাচ্ছে।

—জমিদারী ! কোথায় হে ?

—কোথায় আবার, এই খাস কলকেতায়। অর্থাৎ যথায় আছি ব'সে এবং তুমি কর বসবাস।

—ঠাট্টা করছ নাকি ?

—ঠাট্টা করব তোমার সঙ্গে ? কি দরকার !

—কথাটা খুলেই তাহলে বল।

কৃত্তিবাস কথাটা তখন খুলিয়াই বলিল। পাতিরামের সহিত ইতিপূর্ব্বে প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া যদিও সে নাস্তানাবুদ হইয়াছিল, কিন্তু সে সম্পর্কেই এই অসাধারণ মানুষটির প্রকৃতির দুইটি দিকই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল। মানুষ মাত্রেরই যে দুর্ব্বলতাটুকু প্রচ্ছন্ন-ভাবে থাকে। পাতিরামের সম্পর্কে সেটুকুও কৃত্তিবাসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল। সুতরাং সেই দিকেও লক্ষ্য রাখিয়া কৃত্তিবাস তাহার প্রস্তাবটি এমন কায়দায় প্রকাশ করিয়া ফেলিল যে, পাতিরামের মত সন্দিগ্ধচেতা মানুষকেও বিষয়টি তাহার একান্ত অনুকূল ভাবিয়া লুফিয়া লইতে হইল।

প্রস্তাবটা এই যে, সমগ্র নিকিরিপাড়া অঞ্চলটির ইজারাদার হইতেছেন

কৃত্তিবাসের মামা সৃষ্টিধর দাস। কিন্তু এই বহু লাভজনক ইজারাদারী সম্প্রতি তিনি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক, যে হেতু হঠাৎ তাঁহার লাখ তিনেক টাকার দরকার হইয়াছে। দেড় লাখ যোগাড় হইয়াছে, বাকি দেড় লাখ টাকা এই ইজারাদারীটা বেচিয়া সংগ্রহ করিতে চান; কিন্তু সম্পত্তিটার যেরূপ আয়, আর যদি ইহার পিছনে মাথা খেলানো যায়, লাভের পরিমাণকে অন্ততঃ ত্রিশ পার্সেণ্ট বাড়াইয়া তুলা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

প্রস্তাবটা বুঝি পাতিরামকে স্তব্ধ করিয়া দিল। ইহা যে তাহার বহুদিনের স্বপ্ন, অন্তরের প্রচণ্ড আশা ও আকাঙ্ক্ষা। যে দিন সে এই পল্লীর বারোয়ারীতলায় পঞ্চায়েতগণের সমক্ষে নিষ্ঠুরভাবে লাঞ্ছিত হয় সেইদিনই সে মনে মনে এই আকাঙ্খা পোষণ করিয়াছিল—যদি কখনো এই অঞ্চলের মালিক হতে পারি, তখন এই অপমানের শোধ তুলবো। তাহার পর কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পাতিরামের চক্ষুর উপর এখনও সেই দিনটির কথা যেন জ্বল্ জ্বল করিতেছে। তাহার খেরোবাঁধা সেই মোট খাতা খানার প্রথমেই সেই দিনটির কথা ও কাহিনী অনেক খানি স্থান জুড়িয়া রাখিয়াছে এখনও পল্লীর অধিকাংশ মাতব্বর পাতিরামের সহিত ভাল করিয়া কথা কহে না, দায়দফায় যদিও অনেকে পাতিরামের কাছে হাত পাতিতে এখন আর দ্বিধা করে না; কিন্তু সমাজের দিক দিয়া তাহারা যেন পাতিরামকে এড়াইতে পারিলেই বাঁচে। পাতিরাম সমস্ত বুঝিয়াও চুপ করিয়া থাকে, ইহাদের সম্বন্ধে তাহার সত্যকার মনোবৃত্তিটুকু কিরূপ তাহা সে অতিবড় অন্তরঙ্গের নিকটও কোনদিন প্রকাশ করে নাই

দায়দফায় ইহাদিগকে ঋণপাশে বাঁধিয়াও পাতিরাম কোনক্ষেত্রেই কায়দা করিতে পারে নাই। শীতলা মন্দিরের পুরোহিত চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিগ্রহ ইহাদের সকলকেই এমনই সতর্ক ও সচেতন করিয়া রখিয়াছিল যে, ঋণের দড়ি গলায় পরিলেও, শেষ পর্য্যন্ত যুপকাষ্ঠে মাথা দিবার পূর্ব্বেই যেমন করিয়াই হউক তাহারা বন্ধনমুক্ত হইত।

পাতিরাম জানে, এই অঞ্চলটির ইজারাদারীসূত্রে কৃত্তিবাসের মামাদের এখানে কি প্রভাব প্রতিপত্তি ও কি রকম খাতির! আজ সেই সম্মান প্রতিপত্তি লাভের সুযোগ হাতছানি দিয়া পাতিরামকে ডাকিতেছে এবং অগ্রদূত হইয়া আসিয়াছে তাহার একসময়কার সহপাঠী কৃত্তিবাস কোলে।

মনের ভাবটুকু মনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে যে লোকটির সতর্কতার অন্ত ছিল না, অতি উল্লাস আজ বুঝি তাহার সে সতর্কতাটুকু শিথিল করিয়া দিল! পাতিরাম সাগ্রহে জানাইল,—আমি রাজী; ঐ টাকাই আমি দেবঁ। আজ যদি হয় ত কাল নয়,—বুঝলে?

কৃত্তিবাস বুঝিল, মাছ নিঃসন্দেহে টোপ গিলিয়াছে। সে অমনি একটা ঢোঁক গিলিয়া কহিল,—ভাগ্যিস্ খবরটা আমি আনলুম, নইলে ত ফসকে যেতো—আর রাধুই এটা লুফে নিত!

রাধু অর্থাৎ রাধানাথের নাম উঠিতেই পাতিরাম দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল,—রাধু বাবু! সে এ খবর শুনেছে নাকি?

কৃত্তিবাস কণ্ঠের স্বরে জোর দিয়া কহিল,—শোনেনি আবার? ওর বাবার ছিল বরাবরের টাঁক, রাধু কি ছাড়তে পারে? আরে সেই ত আমাকে পাকড়ে বললে—কাযটা চুপি সাড়ে করে দাও, ভাই, চিরকাল

কেনা হয়ে থাকবো। হাতে এখন টাকা আছে, তাহলে আর বিলেতে পাঠাইনা মালের জন্যে—

শুষ্ককণ্ঠে পাতিরাম প্রশ্ন করিল,—তাহলে, রাধুবাবু পেছনে লেগে আছে বল?

কৃত্তিবাস মুখখানা এবার বিকৃত করিয়া উত্তর দিল,—থাকলেই বা লেগে, তাতে কি হয়েছে! ওকে আমি সেই মাছের ব্যাপারে চিনে নিয়েছি। এগিয়ে দিয়ে তার পর গেল পেছিয়ে, কারবারটার পাট পর্য্যন্ত ঘুচিয়ে ছাড়লে! আমি কি সে সব ভুলিছি নাকি! আর সে সময় তুমি যা করেছ, তাও ত এই খানটায় লেখা আছে; এখন আমি তাঁর কোলে ঝোল মাখবো, সেই ছেলেই আমি বটে!

পাতিরাম জিজ্ঞাসা করিল,—তাকে কি জবাব দিলে?

কৃত্তিবাস উত্তর দিল,—জলের মতন বুঝিয়ে দিলুম,—টাকাগুলো খপ করে বিলেতে পাঠিয়ো না, ধরে থাকো;. আমি দেখিনা কতদূর নামাতে পারি। সে এখন এই আসাতেই বসে আছে। বাছাধন চান সস্তায় কিস্তি মারতে, আর বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে শুধু হাতেই কৃত্তিকে দিয়ে কায সারতে চান। বড় লোক নামেই, দেবার থোবার বেলায় হাত দিয়ে জল গলাতে চায় না; ছ্যা-ছ্যা—

পাতিরাম কহিল,—এখন কাযের কথা কও; আমার ইচ্ছাটা কি জানো, লোক জানাজানি হবার আগেই কাযটা হাসিল হয়ে যায়। তোমার খাঁইটা কি রকম, তাই এবার বল!

বিস্ময়ের সুরে কৃত্তিবাস কহিল,—আমার! খাঁই? তোমার কাছে! নাঃ, আমি কিছু চাই না, কাণা কড়িও নয়; সম্পত্তিটা তোমার হাতে

গেলেই আমি সুখী। সে দিনের সাহায্যের কথাটা আমি এখনো ভুলি নি।

পাতিরাম কহিল,—সে কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। এখন আসল কথাটা আমার শোনো,—তোমার কথার ওপর বিশ্বাস করে আমি এ ব্যাপারের সমস্ত ভার তোমার ওপরেই দিলুম। আমি কিছু দেখবো না; দলিল হলেই টাকাটা ফেলে দেবো, আর তোমাকে এর জন্যে আলাদা দেবো—

কৃত্তিবাস তাড়াতাড়ি কহিল,—আমার কিছু চাই না।

পাতিরাম দৃঢ়স্বরে কহিল,—চাই। কায হয়ে গেলে আমি তোমাকে হাজার টাকা আলাদা দেব।

কৃত্তিবাস আমতা আমতা করিয়া কহিল,—কিন্তু আমি কোন প্রত্যাশা করে আসিনি, তুমি বিশ্বাস করো।

পাতিরাম কহিল,—সেইজন্যই ওটা তোমাকে পান খেতে দিচ্ছি; এমন কিছু বেশী নয়।

কৃত্তিবাস কহিল,—তাহলে আজই বায়না করলে ভালো হয়।

পাতিরাম কহিল,—বেশ; করে ফেলো বায়না; আমি তোমার হাতেই পাঁচ হাজারের এক কেতা চেক লিখে দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ পরেই চেকখানা লইয়া কৃত্তিবাস যখন বিদায় লইল, সে সময় তাহার মুখের ভঙ্গীটুকু বোধ হয় পাতিরাম লক্ষ্য করে নাই।

## ১১

অতি বুদ্ধিমানকে সময় বিশেষে এমন নির্ব্বোধের মত কায করিতে দেখা যায় যে, তাহার কার্য্যপদ্ধতির ত্রুটি বালকেরও বিস্ময় উৎপাদন করে। যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্ববিদিত বড় বড় জেনারলদেরও এমন মারাত্মক ভুল প্রকাশ পাইয়াছে, ইতিহাসে যাহা পাঠ করিয়া আমরাও চমৎকৃত হইয়া থাকি।

ছোটো খাটো লেনদেনে দলিলের কাযে যে পাতিরামের অনুসন্ধিৎসার প্রাচুর্য্য বিস্ময়াবহ ছিল, লক্ষাধিক টাকার ব্যাপারে তাহার কোন নিদর্শনই পাওয়া গেল না। পাছে সহরের কোন অভিজাতশ্রেণীর প্রার্থী খবরটুকু জানিতে পারে কিম্বা রাধানাথ বাবু কোনরূপ চাল চালিয়া বসে, সেই ভয়ে ব্যাপকভাবে বিশেষ কোন তদন্ত না করিয়াই সে তাড়াতাড়ি ক্রয় বাণিজ্যটি সম্পন্ন করিয়া ফেলিল।

কথাটা কিন্তু পাড়ায় রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। সকলেই একদিন স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনিল, পাতিরাম পাকড়ে নিকিড়িপারার ইজারাদারী রাতারাতি কিনিয়া ফেলিয়াছে। তখনই পাড়ার ভিতর একটা বিভীষিকার ছায়া পড়িল, নানাস্থানে কানাকানি সুরু হইয়া গেল।

সেদিন পাতিরাম তাহার খাতকদের সহিত লেনদেনের কায শেষ করিয়া খাতাপত্র গুছাইতেছে, এমন সময় এক ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে তাহার ছোট ঘরখানির সম্মুখে উঠানটির উপর আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া অতি বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। একদিন যে শ্রদ্ধাভাজনটির প্রতি সে এই

খানেই অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করিয়াছে, শৈশবের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে যাঁহার প্রতি সে নিজের প্রকৃতি বিরুদ্ধ অবাঞ্ছিত অনাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল. তাহার ফলে যিনি আজ সর্ব্বহারা, পল্লীর এই দেবায়তনটিই যাঁহার একমাত্র আশ্রয় স্থল, সেই শান্তমূর্ত্তি সৌম ব্রাহ্মণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বহুদিন পরে আজ অকস্মাৎ তাহারই গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত !

পাতিরামের চমক ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ হাসিমুখে প্রশ্ন করিলেন,—আমাকে হঠাৎ দেখে অবাক হয়ে গেছ বোধ হয় ?

পাতিরাম তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিল,—প্রণাম ! আপনার পায়ের ধুলো যে পড়বে, সে আশা সত্যই করিনি। বসুন—

একখানা চেয়ার পাতিরাম দেখাইয়া দিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় হাসিয়া কহিলেন,—কল্যাণ হোক তোমার ; কিন্তু বসবার এখন অবসর নেই বাবা ! মন্দিরের কায পড়ে রয়েছে। একটা প্রয়োজনীয় কথা কর্ত্তব্যের অনুরোধেই তোমাকে বলবো বলে এসেছি।

পাতিরাম কহিল,—বলুন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—তুমি নাকি নিকিরিপাড়ার ইজারাদারী কিনছ ? কথাটা কি সত্য ?

পাতিরাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখের পানে চাহিয়া উত্তর দিল,—কিনছি কেন, কিনে ফেলেছি ; তিন দিন হল দলিল রেজিষ্টারী হয়ে গিয়েছে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—বেচল' কে ? এখনকার ইজারাদার না খোদ জমিদার ?

পাতিরাম রুক্ষকণ্ঠে কহিল,—সে খোঁজে আপনার দরকার ?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় হাসিয়া উত্তর দিলেন,—দরকার এই টুকু পাতিরাম, একদিন তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেছিলে। তোমার কাছে সে সময় অত সহজে টাকা না পেলে আমার দায় উদ্ধার হত না। তার পরিণাম অবশ্য আমার দিক দিয়ে যাই হোক না কেন. তোমার উন্নতিই আমার কামনা। এখনকার ইজারাদার আর জমিদার দুতরফই আমার জানিত লোক, দুপক্ষের হালচাল সবই আমি জানি। যদি তুমি ইজারাদারের কাছ থেকে এ সম্পত্তির ইজারা নিয়ে থাক, সব টাকাই তোমার জলে পড়েছে, তুমি তাহলে রীতিমত ঠকেছ।

পাতিরাম অসহিষ্ণুভাবে উত্তর দিল,—বুঝেছি, খবরটা শুনেই পাড়ার মাতব্বরদের বুকে ঢেঁকি পড়েছে; তাই তাঁরা আপনাকে. পাঠিয়েছে তা ভালোই তো, ঠকেই যদি থাকি, কি হয়েছে তাতে? এর পাড়ার লোকের মাথা ব্যথা কেন?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—পাড়ার লোক আমাকে পাঠায়নি পাতিরাম, খবরটা শুনে আমি নিজেই এসেছিলুম বাবা! তা যাক, তুমি যা ভাল মনে করে করেছ, তাইতেই তোমার ভাল হোক। আর আমার কিছু বলবার নেই।

যেমন ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তেমনই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। পাতিরাম তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বারের দিকে আগাইয়া গেল; দুই হাতে দরজার দুইপাটি কপাট ধরিয়া নিবদ্ধ দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে পুনরায় ডাকিতে তাহার কণ্ঠ দিয়া একটি কথাও বাহির হইতে চাহিল না।

কয়েক দিন পরেই পাতিরাম খরিদ করা ইজারাদারীর অধিকার

াবাস্ত করিতে যে তোড় জোড় আরম্ভ করিয়া দিল, তাহাতে সমস্ত নিকিরিপাড়া বুঝি কাঁপিয়া উঠিল। এই পল্লীর বিখ্যাত মন্দিরটির সম্মুখে বারোয়ারীতলার প্রশস্ত অঙ্গনটির উপর গাড়ী গাড়ী ইট চুন বালি প্রভৃতি আসিয়া পড়িতেছিল। জনরবে ইহার উদ্দেশ্য এইভাবে প্রচারিত হইল যে, এইখানেই উঠিবে পাতিরাম পাকড়ের বসতবাটীর পাকা ইমারত। যে লোক 'আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ' হইয়াছে, সে এবার তিনতলার ছাদে বসিয়া সমস্ত নিকিরিপাড়ার খবরদারী করিবে।

কিন্তু যে শুভদিনটি উপলক্ষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে ইমারতের ভিত্তি স্থাপনের কথা, সেইদিন প্রত্যূষে মূল জমিদার হাটখোলার হাতীবাবুদের তরফ হইতে তাহাদের ম্যানেজার বহুসংখ্যক লাঠিয়াল ও পুলিস-প্রহরী সমভিব্যাহারে অকস্মাৎ অকুস্থলে উপস্থিত হইয়া পাতিরাম পাকড়ের এই ইটগাড়া কার্য্যে বাধা দিল।

পাতিরাম যদিও প্রথমে অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু স্থির বুদ্ধি ম্যানেজার উচ্চ আদালতের ইনজংসনের আদেশ দেখাইয়া সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে স্তব্ধ করিয়া দিল।

সমবেত সকলেই স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনিল,—ভূতপূর্ব্ব ইজারাদারের ইজারার মেয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছে; পাতিরাম পাকড়েকে তাহার ইজারাদারী বিক্রয় করিবার কোনও এক্তিয়ার নাই। পাতিরাম তদন্ত না করিয়া নিজের দায়িত্বেই এই বেকুবি করিয়াছে। আদালতের আদেশ অনুসারে হাতীবাবুর সরকার নিকিরিপাড়া মহলের উপর দখল লইতে আসিয়াছে, পাতিরাম পাকড়ের ইহাতে কোন স্বত্ব-স্বামিত্ব নাই। সে এই মহলের একজন সাধারণ প্রজামাত্র, তাহার অধিক কিছু নহে।

পাতিরাম নিরুত্তরে নিজের বাড়ীর দিকে এমন ভঙ্গীতে চলিয়া গেল, সে যেন সমবেত দর্শকদেরই একজন, তাহাদের মতই এই চাঞ্চল্যকর ব্যাপারটা দেখিতে আসিয়াছিল; তাহার মুখের উপর বিক্ষোভ বা নৈরাশ্যের চিহ্ন মাত্রও নাই!

কথায় আছে—'সেয়না ঠকিলে বাপকেও বলে না।' পাতিরামের অবস্থাও সেইরূপ দাঁড়াইল। সে বুঝিয়া দেখিল যে, রীতিমতই ঠকিয়াছে এবং তাহাকে ঠকাইবার জন্য যদিও কৃত্তিবাস মুখপাত স্বরূপ দেখা দিয়াছিল, কিন্তু তাহার পশ্চাতে তাহার বিরুদ্ধবাদী আরও অনেকেই আছে। এই দলটির চাঁই হইতেছে—রাধানাথ মুখোপাধ্যায়। সুতরাং পাতিরামের যত কিছু রাগ ও বিদ্বেষ এই অভিজাত বংশীয় যুবকটির উপরে গিয়াই পড়িল। সেইদিনই পাতিরাম তাহার লাল খেরো বাঁধা মোটা খাতাটির পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে লিখিল,—বাজে খরচ এক তিপান্ন হাজার টাকা। এই খরচা করাইল, সহর কলিকাতার শিক্ষিত ভদ্র সমাজ; যথা—রাধানাথ মুখুজ্জ্যে, কৃত্তিবাস কোলে, সৃষ্টিধর দাস। উসুল চাই এই বাবদ পুরা তিন লাখ। উসুল করিবে ইহারা এবং হাটখোলার হাতীবাবুদের সরকার।

নিজের বিখ্যাত খাতায় এই খরচার কথা লিখিয়াই পাতিরাম এত বড় ক্ষতি স্থির হইয়া সহ্য করিল। এই ব্যাপার লইয়া কোন সোরগোল তুলিল না, চীৎকারে বাড়ী ও পাড়া মাথায় করিল না, সহর ব্যাপিয় ঢাক পিটিল না, এমন কি, আদালতে ও খবরের কাগজে কোনও রূপ ইন্ধনও যোগান দিল না। সিভিল ও ক্রিমিন্যাল কোর্টের আইন প্রতারকদিগকে দুমুখো বিধানের উভয় ধার দিয়া জবাই করিবার

সারত সমেত সমস্ত টাকা পাতিরামের সিন্ধুকে ফিরাইয়া আনিবার
ত নির্ঘাত ব্যবস্থাই দিলেন, কিন্তু পাতিরাম কিছুতেই সায় দিল না,
ীর হইয়াই কহিল,—যেতে দিন, ওতে কিছু হবে না; ওপথে
মার টাকা ফিরবে না।

সে কি! তাহলে নালিশ করবেন না?

না; টাকা যখন পালায়, তাকে পাকড়াবার জন্য আবার তার
হনে টাকা পাঠানো মস্ত ভুল, তখন প্রয়োজন শুধু মাথার।

তার মানে?

মানে এই, মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি বা'র করা; কেন না, টাকা যে রাস্তা
পালায়, সেই রাস্তা দিয়েই তাকে ফিরিয়ে আনতে হয়।

ানো মামলাবিদরা এই অদ্ভুত মানুষটির মুখের কথা শুনিয়া অবাক!
টা বলে কি? হঠাৎ এই ভাবে ঘা খাইয়া লক্ষাধিক টাকার ক্ষতির
ত পাইয়া নিশ্চয়ই ইহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে,—নতুবা প্রতিকার
না, নালিশ করিতে সর্ব্বস্ব পণ করে না, প্রতিহিংসায় অধীর
উঠে না! অদ্ভুত!

কিন্তু আইনবীরদের উৎসাহবহ্নির শিখা তথাপি নির্ব্বাপিত হইতে
না! আদালতের নজীর তুলিয়া বুঝাইতে চাহিলেন,—এমন সঙ্গীন
, সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব নাই, আসামীপক্ষও শাঁসালো; এ ক্ষেত্রে
বে উপেক্ষা গভীর লজ্জা ও পরিতাপের কথা যে! লোকে হাসিবে,
আস্কারা পাইবে, কীল খাইয়া তাহা অম্লান বদনে সহ্য করিলে
বলিবে—কাওয়ার্ড, কাপুরুষ!

পাতিরাম অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিল,—তা বলুক; ওতে আমার

লাভও নেই, ক্ষতিও নেই ; আমার নজর কিসে শুনবেন,—"কত এ আর কতই বা গেলো!—আজ যেটা গিয়েছে, সেটা যাতে ফিরে আ তার ডবল হয়ে, সেই চেষ্টাই আমাকে করতে হবে। খোয়া টাকা ও ফেরাতে পারি ভাল, না পারি ব'য়ে গেল ; কিন্তু এর জন্য আপনা কাছে বুদ্ধি ধার করবার কোন দরকারই আমি মনে করছি ন তবে এ কথাও বলছি, আপনাদের যদি টাকার দরকার হয়, টি নিয়ে আসবেন, হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার দিতে এখনো আমি পেছপা নই ; মনেও ভাববেন না যেন, একটা লোকসান খেয়ে পাতি পাকড়ে পড়ে গেছে! আর ঐ এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ওতো আমার ভগবান তুলেই রেখেছেন মশাই—বছর ফিরতে ফিরতেই ডবল করে ফিরিয়ে দেবেন।

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে বিস্মিত হিতৈষীরা কহিলেন,—আচ্ছা, পাব মশাই. আমরা তাহলে এখন যাই ; তবে ভগবানের ব্যবস্থাটা আমাদের জানাতে ভুলবেন না।

পাতিরাম হাসিয়া কহিল,—জানাবার দরকার হবে না, নিজে জানতে পারবেন ; কথার পীঠে একটা কথা আপনাদের এখনই জা দিচ্ছি শুনুন ;—একবার ট্রামে আমার পকেট থেকে একটা মনিব চুরি যায় ; তাতে ছিল দশ টাকার খান তিনেক নোট, আর কতক পয়সা। ভগবানকে জানালুম। তারপর সাতটি দিনের ভেত আমার হাতে এলো একটা কম এক ডজন মনিব্যাগ, সে গু পেটের ভেতরে ছিল নোটে টাকায় রেজগীতে প্রায় পাঁচশো।

বলেন কি,—কি ক'রে এলো?

ভগবান দিয়ে গেলো !—ব্যাগটা পকেট থেকে খোয়া যেতেই জানিয়ে দিলুম শোধ এর নেবই। রোজ গোনা দশখানা হিঙ্গের কচুরি ছিল আমার তখন জল খাবার, আর ভাতের সঙ্গে দু'বেলায় পাঁচ খানা করে দশখানা ইলিশ ভাজা; সেইদিন থেকেই সখের ঐ দুটো খাবারই ছেড়ে দিলুম—হারানো মনিব্যাগের টাকা ফিরে না পাওয়া পর্যান্ত; ভগবান কি আর থাকতে পারেন! পাঁচ সাতটা ছোঁড়া আমার কাছে দিন রাত পড়ে থাকে, তাদের অসাধ্য কিছুই নেই; ভগবান তাদেরই লিলিয়ে দিলেন আর কি! তার ফলে, যে রাস্তা দিয়ে আমার ব্যাগটি উধাও হয়েছিলেন, সেই রাস্তা ধরেই আরও দশটিকে নিয়ে ফিরে এলেন! অবশ্য আমার সেই ব্যাগটিই যে হুবহু আসবে, এমন আব্দার আমি ভগবানের কাছে করিনি,—ব্যাগ নিয়ে ত আর কথা নয়;—ব্যাগের ভেতরে থাকে যে, বস্তুটি, তাই নিয়ে মাথা ব্যাথা; তার ব্যবস্থা হলেই ব্যস্! আচ্ছা, নমস্কার!

এই অদ্ভুত মানুষটির মুখের দিকে ক্ষণকাল অপলক নয়নে চাহিয়া মুখের-কথা-প্রয়োগ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ স্তব্ধ বিস্ময়েই স্থান ত্যাগ করিলেন।

১২

সান্তানাথ মুরুব্বীর মত মুখভঙ্গী করিয়া কহিল,—আশ্চর্য্য, আমার কাছেও কথাটা চেপে রেখেছিলেন! যদি খুলে সব বলতেন, তাহলে—

বাধা দিয়া পাতিরাম প্রশ্ন করিল,—কি করতে?

—সব দিক দিয়ে সার্চ্চ করতুম; হাতীবাবুদের সেরেস্তায় খবর নিতুম।

—ছুটোছুটিই সার হত তাতে, কাষ কিছুই হ'ত না।

—বলেন কি?

—হ্যাঁ, তাই। আট ঘাট বেধেই ওরা কাযে নেমেছিল। তুমি কি ভেবেছ, হাতীবাবুদের সেরেস্তার সঙ্গে এদের যোগ সাজস ছিল না? আসলে কি জান?

—কি?

—একটা চক্রান্ত হয়েছিল। এক বোকা বেকুব ব্যবসা খুলে বুদ্ধির জোরে টাকা উপায় করছে, সেই টাকাটা কোন রকমে বাগিয়ে ভাগ বাঁটোয়ারা করা চাই। তাই সবাই মিলে কোমর বেঁধেছিল।

—এখন তাহলে কি করতে চান?

—পেছনের কথা নিয়ে মাথা ধরাতে কিম্বা সময় নষ্ট করতে চাই না; হাতে কলমে জানিয়ে দিতে চাই—আসলে বোকা কে, আর শেষ পর্য্যন্ত ঐ টাকাটা কোথায় গিয়ে ওঠে।

—আপনি কি আশা করেন, টাকাটা ফিরে পাবেন?

দৃঢ়স্বরে পাতিরাম কহিল,—নিশ্চয়ই; জানো না, বানের জল ঢুকে গাঁয়ের পুকুর ডোবাগুলো পর্য্যন্ত ভরিয়ে দেয়, তারপর ফেরবার সময় পুকুর ডোবার জমানো জল পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যায়? আমার টাকাটাও ঐ বেনো জল জেনো। এই দিক দিয়েই এখন যা কিছু তদ্বির করতে হবে—বুঝেছ।

অতঃপর পাতিরামের খাসকামরার দরজাটি বন্ধ করিয়া এই তদ্বির

সম্পর্কে পরামর্শ বৈঠক বসিল। বৈঠকের বক্তা পাতিরাম, শ্রোতা সীতানাথ।

ঘণ্টা দুই পরে রুদ্ধ ঘরের দরজা যখন উন্মুক্ত হইল, তখন দেখা গেল, দুইখানি মুখই দিব্য প্রসন্ন; কোন জটিল সমস্যার আলোচনা যেন বহু বিতর্কের পর এই মাত্র সুন্দর ভাবেই সমাধান হইয়াছে।

আফিসের পালটা পাতিরাম বরাবর নিকিরি পাড়ার ভিতর ঢুকিয়া শীতলা মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া একখানা পুঁথি পড়িতেছিলেন। ভক্তবৃন্দের সমাগম তখনও হয় নাই।

পুঁথির পাতায় চক্ষু দুটি নিবদ্ধ থাকায় চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাতিরামের উপস্থিতি জানিতে পারেন নাই। পাতিরামের কণ্ঠস্বর তাঁহাকে সহসা সচেতন করিয়া দিল।

—প্রণাম হই চক্রবর্ত্তী মশাই!

দুই চক্ষুর দৃষ্টি পাতিরামের মুখের উপর ফেলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—মন্দিরে মহামায়া রয়েছেন পাতিরাম, আগে তাঁকে প্রণাম কর!

পাতিরাম কহিল,—আপনাকে প্রণাম করলেই তাঁকে প্রণাম করা হবে, আর সে প্রণাম তিনি নেবেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভাল করিয়াই পাতিরামকে চিনিয়াছিলেন। বুঝিলেন, ইহার সহিত তর্ক করিয়া কোন লাভ নাই। মুখখানি গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—তারপর, কি মনে করে?

পাতিরাম বেশ সহজকণ্ঠেই কহিল,—সেদিন আপনার কথাটা

হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম. আজ তাই মাপ চাইতে এসেছি চক্রবর্ত্তী মশাই !

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—কোন প্রয়োজনই এর ছিল না, পাতিরাম ! তখন সে কথা মেনে নিলেও ফল হত না ; আইনকে রুখতে ত পারতে না।

পাতিরাম কহিল,—আচ্ছা চক্রবর্ত্তী মশাই, আপনি কি এই কেনা বেচার কথাটা আগে থাকতেই জানতেন ?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—কাস পাকা হবার আগে ত জানিনি. পরেই জেনেছিলুম। তখনই তোমাকে জানিয়েছিলুম।

পাতিরাম কহিল,—এখন যদি ওদের সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই, বলবেন আমাকে ?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—যেটুকু জানি অবশ্যই বলবো, তবে এটুকুও বলে রাখছি, এ ব্যাপারে আদালতে দাঁড়িয়ে সাক্ষীসাবুদ দিতে পারবো না।

পাতিরাম কহিল,—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন চক্রবর্ত্তী মশাই, এ ব্যাপার কিছুতেই আদালত পর্য্যন্ত গড়াবে না।

—কি তুমি জানতে চাও ?

—ঐ সৃষ্টিধর দাস। কেন আমার সঙ্গে এ রকম ছল চাতুরী করলে ?

—অভাবের দায়ে। বর বাড়ী, বিষয় আসয়, নাম ডাক, দপদপা সবই আছে, অভাব শুধু টাকার ; দেনায় তলা পর্য্যন্ত চুঁয়ে আছে। দাঁও যদি পায়, বোকার মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গবে না কেন ?

—আচ্ছা, কৃত্তিবাস কোলেকে আপনি জানেন? ঐ সৃষ্টিধর দাসের ...নে? .

—খুব জানি। ভয়ঙ্কর ছেলে। অথচ, এই ভাগনেটার ওপরেই ...ার টানটাই বেশী।

—আর কোন ভাগনে আছে নাকি?

—আছে একজন; তবে সে গরীব। তার বাবা জাত ব্যবসা ...নি ব'লে সৃষ্টিধর এদের সঙ্গে সম্পর্কই ছেঁটে ফেলে। তবে শুনেছি, ...টা নাকি লায়েক হয়েছে, পাসটাসও করেছে। বোধ হয় এখনো ...ছে।

—কোথায় তারা থাকে বলতে পারেন, আর নাম টাম গুলো—

—টালিগঞ্জে এদের বাড়ী, গেরস্ত ঘর। সৃষ্টিধরের এই ভগিনীপোতের ...চিনিবাস, আর ছেলেটির নাম শ্রীবাস।

—আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব চক্রবর্ত্তী মশাই।

—বল?

—ঐ হাটখোলার হাতী বাবুদের খবরটা—

—ওরা মস্ত লোক, তবে এদেরই জাত ভাই, পালটি ঘর। বনেদী ...লোক। জেলায় জেলায় তালুক, তা ছাড়া ফ্যালাও কারবার। ...দের পেছনে দেনাও নেই, আর কাউকে ঠকিয়ে নেবার মত ...লবও নেই।

—কিন্তু জাতভাই যখন, আর যোগাযোগও রয়েছে, সেক্ষেত্রে—

—যা ভাবছ তুমি, তা নয়। ও যোগাযোগ বাজে; আর ওরা হচ্ছে ...মস্ত মানুষ, বাড়ন্ত ঘর, ছেলেমেয়ে দুদিক দিয়েই। ওরা কখন অন্যায়

করতে পারে না। তবে সেরেস্তার আমলাদের যদি কিছু থাইয়ে থা
সে কথা আলাদা।

পাতিরাম খবরগুলি বুঝি তাহার মনের ভিতরে স্মৃতির অক্ষ
লিখিয়া লইল। পাতিরামের স্মৃতিপটে একবার যাহার রেখা পড়ি
কস্মিনকালেও তাহা মুছিত না। অতঃপর প্রসন্ন ভাবেই পাতির
কহিল,—আচ্ছা, তাহলে এখন চললুম চক্রবর্ত্তী মশাই, প্রণাম।

হাত তুলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—কল্যাণ হোক।

## ১৩

যাহারা ভাবিয়াছিল, দেড় লক্ষ টাকার ঘা খাইয়া পাতিরাম ভাঙ্গি
পড়িবে, তাহারাই একদিন সবিস্ময়ে দেখিল, নিকিড়াপাড়ার সম্মুখে স
রাস্তাটির উপর পাশাপাশি একই রকমের দুইখানা ইমারত তৈয়ারি
কাষ পাতিরাম আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সমস্ত অঞ্চলটা সরগরম করি
ইমারতের কায চলিয়াছে।

পাতিরামের সংসারে দ্রৌপদীই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা। মায়ের উ
সংসারটির ভার ছাড়িয়া দিয়া পাতিরাম নিশ্চিন্ত। যদিও মা ও ছেলে
লইয়া সংসার, কিন্তু দ্রৌপদীর দরাজ অন্তর তাহার আয়তনটি অনে
বাড়াইয়া দিয়াছে ; ছোট বাড়ীখানিতে লোক এখন ধরে না। অসহ
নিরাশ্রয় নিরুপায় আত্মীয় স্বজন এখন এই অতি স্বচ্ছল সংসারটির আ

লইয়া নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাইতেছে। এ বিষয়ে মায়ের সহিত ছেলের মনোবৃত্তির আশ্চর্য্য রকম ঐক্যই দেখা যাইত।

দ্রৌপদী যে দিন ছেলেকে বলে,—পয়সা ত অনেকেই পয়দা করে বাবা, কিন্তু সত্যিকারের কাযে সে পয়সাকে খাটাতে সবাই কি পারে? ঈশ্বর ত তোমাকে আঁচলা পুরে দিচ্ছেন, আমার ইচ্ছে—তুমি তার সদ্ব্যয় কর।

পাতিরাম মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করে,—তুমি কি চাও মা? কি ভাবে খরচ করতে তোমার মন চায় বল?

মা তখন জানাইয়া দেয়,—আমার কি ইচ্ছে হয় জান বাবা, চোখের ওপর যাদের কষ্ট দেখি, যতটুকু পারি তা মিটিয়ে দিই। যে সব আপনার জন দুঃখু কষ্ট পায়, খাবার সংস্থান নেই, পরের বাড়ীতে প'ড়ে লাথি ঝাঁটা খায়, তাদের আশ্রয় দিই, কাছে এনে রাখি। পয়সার এর চেয়ে আর সদ্ব্যয় কি আছে বাবা?

পাতিরাম তখন মায়ের পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া বলে,—এইত আমার মায়ের কথা। তোমার মন যা চাইবে, তাই তুমি করবে মা! আমার ঠাকুর দেবতা, ঈশ্বর ধর্ম্ম, যা কিছু সবই তুমি।

মা সেদিন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করে,—আমি বলছি বাবা, টাকা পয়সার কষ্ট তুমি কখনও পাবে না।

পাতিরামের মা প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করিতে যাইত। যে ঘাটে সে স্নান করিত, বড় ঘরের মেয়েরাও সে ঘাটে নিত্য নিয়মিত ভাবেই স্নানে আসিত। ইদানীং পাতিরামের নাম ডাক হওয়ায় সবাই দ্রৌপদীকে চিনিত, আলাপ পরিচয়ও ছিল। স্নানের ঘাটে উড়িষ্যা

প্রদেশের যে সব ব্রাহ্মণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিপনী সাজাইয়া স্নানের ঘাট গুলি গুলজার করিয়া রাখিত, তাহাদের নিকট দ্রৌপদীর আদর খাতিরের অন্ত ছিল না। দ্রৌপদীর এতটা সম্মান প্রতিপত্তি নিত্য স্নানার্থিনী অন্যান্য মহিলাদের ভাল লাগিত না। এই দলের চাঁই ছিল নন্দর মা; এই নামেই এই মহিলাটি স্নানের ঘাটে সুপরিচিতা। যে হেতু, তাহার ছেলেরা সকলেই কৃতবিদ্য, বড় বড় চাকুরে, মাসকাবারে অনেক টাকা উপায় করে। তবে বড় ছেলে নন্দর নাম ডাকই বেশী, সে সরকারী আফিসের চারশো টাকা মাইনের চাকর। ছেলেদের গরবে নন্দর মা মেয়েমহলে যেন ফাটিয়া পড়ে। বিনাইয়া বিনাইয়া টাকা পয়সার দেদার খরচের কথা অন্তত বাইশগুণ বাড়াইয়া কত প্রকারেই প্রকাশ করে। কেহ হয়ত বিশ্বাস করে, কেহ কেহ বা মুখ টিপিয়া হাসে, আবার কেহ বা পাণ্টা জবাবে নিজের সংসারের খরচের কথা তুলিয়া টেক্কা দিবার প্রয়াস পায়। আসলে কিন্তু নন্দর মার হাত দিয়া গরীব দুঃখীর হাতে এমন কিছু পড়ে না—যাহা দেখিয়া দশজনে বলিতে পারে যে, দাতব্যখাতেও তাহার উল্লেখযোগ্য খরচা কিছু আছে! এ দিক দিয়া বরং সকলের উপরে জায়গা করিয়া লইয়াছে পাতিরামের মা দ্রৌপদী। অথচ এ সম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া একটি দিনের জন্যও কোন কথা সে বলিয়াছে?

একদা ঘটনা চক্রে স্নানের ঘাটে পাতিরামের মায়ের সহিত নন্দর মার সংঘর্ষ বাধিল। দোষটা অবশ্য নন্দর মার। সেটা অগ্রহায়ণ মাস, শীতটা সবে পড়িয়াছে। কিন্তু সেই শীতেই পাতিরামের মা গায়ে আঁচোলটি দিয়া ঘাটের পাণ্ডা ঠাকুরদের আশীর্ব্বাদ কুড়াইতেছিল। নন্দর মার

টা সহ্য হইল না। সে তখন কাপড় ছাড়িয়া সঙ্গী চাকরটার হাত হইতে আঁচলাদার শালখানা লইয়া গায়ে জড়াইতেছিল। সেই অবস্থায় সে ঘাটশুদ্ধ সবাই শুনিতে পায় এমনই স্বরে দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া বসিল,—ও মা, এই শীতে তুমি আঁচোল গায়ে দিয়ে চলেছ হরিরামের মা! কেন, ছেলে ত যা হোক দু পয়সা উপায় করে শুনিছি; বুড়ো মাকে একখানি বিলিতি কম্বলও কিনে দিতে পারে না? কী বা দাম! এক টাকার বেশী নয়। না দেয়, ব'লো—নন্দকে বলে আমি আনিয়ে দেব, তুমি না হয় দু আনা চার আনা করে শোধ দিও।

অন্যান্য মেয়েরা কাট হইয়া এই ধনগর্ব্বিতা বৃদ্ধাটির স্পর্দ্ধিত কথাগুলি শুনিল। কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হইল সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া একটু হাসিয়া উত্তর দিল,—দোষ ত ছেলের নয় দিদি, দোষ আমারই, আমি ত তাকে বলিনি।

নন্দর মা ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—বলবে আবার কি? কাপড় চোপড়ের কথা মাকে বলতে হয় নাকি ছেলেকে? আমার ত আর গায়ের কাপড়ের দুঃখু নেই, তোরঙ্গ ঠাসা কত রকমের কত সব কাপড়ই রয়েছে, তা সত্ত্বেও শীত পড়তে না পড়তেই তিন ছেলে তিন খানা শাল কিনে এনে দিলে। আমি বললুম—কেন বাবা, তোমরা আর কিনলে, এক বস্তা কাপড় ত পচছে। ছেলেরা বললে—তা পচুক। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আর বছর বছর নতুন পর। এই শালখানা নন্দ দিয়েছে; কাশ্মীর থেকে নাকি আনিয়েছে, সে ব'লে একশো টাকায় পেয়েছে, নইলে বাজারে এর দাম দেড়শোর কম নয়।

এত কথা বলিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না, কিন্তু পাতিরামের মাকে আজ খাঁটো করিবার জন্য নন্দর মা যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কথা শুনিতে পরিচিতা অপরিচিতা অনেকগুলি মেয়ে তাহাকে ইতিমধ্যে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল।

এক অপরিচিতা তরুণী নন্দর মা'র গায়ের শালখানির প্রান্তদেশ ধরিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। সে সুযোগ পাইয়া সহসা বলিয়া ফেলিল —দেখুন, আপনার এই শালের দাম যদি একশো টাকা হয়, আর কাশ্মীরী শাল বলেই যদি আপনার ছেলে এটা কিনে থাকেন, তাহলে তিনি ঠকেছেন!

মেয়েটির এই কয়টি কথা যেন বারুদে অগ্নি সংযোগ করিল। নন্দর মা তর্জ্জন করিয়া কহিল,—তুমি কেগা বাছা, চেন আমি কে। আমার ছেলে ঠকে আসবে? বলে, লাট সাহেব পর্যান্ত আমার ছেলেকে খাতির করে চলে, তাকে ঠকাবে শাল বেচে! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। শাল কখনো দেখছ চোখে, যে ব্যাখ্যানা করছ?

মেয়েটি কিন্তু দমিল না, বেশ সপ্রতীভভাবে কহিল,—আপনি খোঁচা দিয়ে কথা বলছেন কেন বলুন ত? যা আপনি বলবেন, তাই ঠিক; আর আমাদের কথা মিছে? সাত টাকা দামের জার্ম্মাণীর শাল আপনার ছেলে যদি কাশ্মীরী বলে কিনে আনে, আর সে কথা লাট সাহেব মানে, সকলকেই যে সেটা মানতে হবে তার মানে কি?

জোঁকের মুখে যেন নুন পড়িল; নন্দর মার মুখখানা এ কথায় এক নিমেষে যেন ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সে এবার সুর একটু নরম করিয়া কহিল,—তুমি বাছা থাম, আমি ত তোমার সঙ্গে তর্ক করতে

াসিনি এখানে। আমি ত জানতুম না, তুমি শাল তৈরী
র— .

মেয়েটি উত্তর দিল,—তৈরী না করলেও ঘাঁটাঘাঁটি করি ; আমার
দা এই শালের এজেণ্ট ; এর মার্কা আমার চেনা। ক দিন ধরেই
াপনার মুখে লাখ পঞ্চাশী শুনছিলুম কিনা, তাই আজ জোঁকের
খে নূনটুকু দিতে হলো। মিছে বড়াই এমন করে লোকের সামনে আর
রবেন না, তাতে আড়ালে লোকে হাসে।

মেয়েটি আর দাঁড়াইল না, হন্ হন্ করিয়া ঘাটের উপরে মন্দিরের
দকে চলিয়া গেল।

দ্রৌপদী এই সময় কহিল,—কথা কি জান দিদি, নতুন ফলটা
মাসটা যেমন দেবতা ব্রাহ্মণকে দিয়ে তবে মুখে দিতে হয়, তেমনই
তুন কাপড় চোপড়ও তাঁদের না পরিয়ে গায়ে জড়ানো ঠিক নয়।
াই হোক, তুমি আজ মনে করিয়ে দিলে দিদি, তোমার ভাল
হাক, আমি আজই ছেলেকে বলবো, কালকেই যেন আমাকে গায়ের
কাপড় আনিয়ে দেয়।

নন্দর মা কথাটার কোন উত্তর দিল না, তাহার মুখখানা মেঘময়
হইয়া উঠিয়াছিল।

মন্দিরে পূর্ব্বোক্ত মেয়েটির সহিত দ্রৌপদীর পুনরায় সাক্ষাৎ হইল।
দেবী দর্শনের পর উভয়েই এক সঙ্গে বাহিরে আসিল।

মেয়েটি দ্রৌপদীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আপনাকে ত
এঘাটে এসে অবধি দেখছি। দিতে থুতে আপনি খুব ভালবাসেন না ?

দ্রৌপদী সঙ্কুচিতভাবে কহিল,—নিজের মুখে কিছু দিতে যেমন ভাল

লাগে, তেমনই পরের হাতে কিছু দিতেও মনে ইচ্ছে হয়। কিন্তু হলে কি হবে, আসলে কিছুই পারি নে যে মা!

মেয়েটি তাহার বড় বড় চোখ দুটি উজ্জ্বল করিয়া কহিল,—কিন্তু আপনি করেন, অন্যের পক্ষে তা পর্ব্বত। ঐ আমাকে মাগীটার কথা শুনে অবধি আমার গা যেন জ্বালা দিত। কেবল বড়মানুষী কথা, ছেলেরা কত টাকা আনে, কতগুলো চাকর বাকর কন্না করে, কি রকম রাজভোগ খান, কত খরচ—বিনিয়ে বিনিয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে কেবলই এই সব দশ জনকে শোনাবে।

দ্রৌপদী হাসিয়া বলিল,—তা শোনালই বা, কি হয়েছে মা তাতে?

মেয়েটি উত্তর দিল,—ঐ যে বললুম না—তাতে হাড় অবধি জ্বলে যে রাগে: পয়সা আছে ত নিজের বাড়ীতেই রাখ না বাপু, বড় মানুষ আছিস ত জাঁক করে জানিয়ে কি লাভ শুনি? আবার এমনি তাজ্জব মুখ বুজিয়ে এই জাঁকানো কথাগুলো শোনবার লোকও আছে! এদিকে দেখি, ঘাটের পাণ্ডার হাতে রোজতারিখে একটি আধলার বেশী বরাদ্দ নেই! ভিখিরীগুলোর পাতা কাপড়ে হাত কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে যে কটা চাল দেয়, তার আদ্ধেক খুঁদ, আর গুনতিতে পঞ্চাশটা দানার বেশী হবে না। ইনি আবার ঘাটে বসে বড়মানুষী কলান—জানাতে চান উনি কেউ কেটা নন! মরণ আর কি!

দ্রৌপদী বাধা দিয়া কহিল,—থাক মা থাক, কি দরকার পরের কথায়; কারুর মুখে ত আমরা হাত চাপা দিয়ে রাখতে পারি না মা!

মেয়েটি উত্তেজিতভাবে কহিল,—অন্যায় কথা বললে, মুখে হাত চাপা দিতে হবেই ত! ঐ ত দেখলেন, সাত টাকার একখানা শালকে একশো

টাকার কাশ্মিরী শাল ব'লে বড়াই করছিল! দিলুম থোঁতা মুখ ভোঁতা করে! আবার লাটসাহেবের নাম ধরে কথা বলে! তবু যদি না অন্য গুণ সব জানতুম। ফের যদি কথা কইত, দিতুম হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙ্গে।

দ্রৌপদী এবার থ হইয়া মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি কহিল,—তাহলে শুনুন, সেই গুণটির কথাও বলি। ঐ ত অত বড়মানুষী করেন; লাটসাহেব ওর ছেলেদের মেনে চলে। এদিকে রাস্তার ঐ মোড়ে আনাজপত্তর কেনবার সময় মাগীর কি হাত সাফাই গো! দরদস্তুরী নিয়ে ঝগড়া ত আছেই, তার ওপর চুরি; যাকে বলে—দেখতো তোর, না দেখ্‌তো মোর—

দ্রৌপদী বিচলিতভাবে বলিয়া উঠিল,—মহাভারত! মহাভারত! আমি সব জানি মা; আরও অনেকেই জানে। কিন্তু কি দরকার মা পর চর্চ্চায়। তোমার কিন্তু মা খুব সাহস. এমন স্পষ্ট কথা তোমার বয়সী কোন মেয়ের মুখে এ পর্য্যন্ত শুনিনি। তোমাদের বাড়ী কোথায় মা? নতুন এসেছ বোধ হয়?

মেয়েটি কহিল,—হ্যাঁ। আমরা আগে পাঞ্জাবে থাকতুম! এখন কলকেতায় এসেছি। ঐ যে চৌমাথার ওপর হলদে রঙ্গের বাড়ীটা, ঐখানেই আমরা থাকি।

দ্রৌপদী বিস্ময়ের সুরে কহিল,—ঐ বাড়ী? ও মা, রাস্তা দিয়া যেতে যেতে দেখেছি, লোকজন ত হামেশাই গিস্ গিস্ করে। সবাই বলে এক বড় মহাজন এসেছে। তাহলে তোমার বাবাই বোধ হয়—

মেয়েটি দিব্য সহজকণ্ঠে বলিল,—ওদেশে আমার বাবাকে সবাই বলতো—শেঠজী। এদেশে বলে—মহাজন। কলকেতায় যত সব শাল

আলোয়ানের দোকান আছে, আমার বাবা তাদের মাল যোগান দেন। সহরের ভেতরটা বড্ডো ঘিঞ্জি বলে, বাবা ফাঁকা দেখে এইখানেই তাঁর গদী করেছেন।

দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার বাবার নামটি কি মা ?

মেয়েটি ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা মুখখানি তুলিয়া কহিল,—বাবার নাম মনসারাম, আমার নাম পার্ব্বতী, আর আমাদের কারবারটির নাম মনসারাম পর্ব্বতরাম।

দ্রৌপদী স্তব্ধভাবে মেয়েটির কৌতুকোজ্জ্বল মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল।

পরক্ষণেই মেয়েটি হাসিয়া কহিল,—বাবা আমাকে ছেলেবেলা থেকে পর্ব্বত বলে ডাকেন কিনা; আর আমি যখন বছর তিনেকের মেয়ে, তখনই পাঞ্জাবী শালওলাদের চাকরী ছেড়ে দিয়ে নিজেই এই কারবারটি ফাঁদেন। ছেলে ত নেই, অংশীদারও নেন নি, অথচ ওদেশে দুনামে কারবার ফাঁদা একটা রেওয়াজ, তাই বাবা তাঁর মেয়ে পার্ব্বতীকে পর্ব্বতরাম করে কারবার ফেঁদেছেন। দেখতে দেখতে কারবারটার বয়স বারো বছরের ওপর হয়ে গেলো; বাবা বলেন, আমার নামের নাকি পয় আছে।—শেষের কথাগুলি বলিয়াই মেয়েটি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দ্রৌপদী অবাক হইয়া মেয়েটির কথা শুনিতেছিল। তাহার কথা বলিবার ধরণ, কাপড় পরিবার কায়দা, পাথরে কোঁদা মূর্ত্তির মত নিখুঁত নিটোল চেহারা, আর এক পীঠ চুল—তাহার দুই চক্ষুকেও বুঝি চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। পাঞ্জাবের নাম সে শুনিয়াছে, পাঞ্জাবী পুরুষদেরও

দেখিয়াছে ; কিন্তু সে দেশের মেয়ে বুঝি এই প্রথম তাহার নজরে পড়িল। শুধু নজরে পড়া কেন, আলাপ পর্য্যন্ত হইয়া গেল। সেই সঙ্গে মনে যে সন্দেহটুকু জাগিতেছিল, তাহা বলি বলি করিয়াও সে ব্যক্ত করিতে পারিতেছিল না। সেই সংশয়টুকু এই যে, ইহারা কি সত্যই খাস পাঞ্জাবী, কিম্বা বাঙ্গালী? বাঙ্গলা মুলুক থেকেও ত অনেকে পাঞ্জাবে গিয়া কারবার করে, চাকরী বাকরী করে, ইহারাও কি তাই?

হঠাৎ পার্ব্বতীর কথা দ্রৌপদীর চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া দিল,—ঐ আমাদের বাড়ী। আসবেন দয়া করে? একটু জিরিয়ে যাবেন!

দ্রৌপদী কহিল,—আজ নয় মা, আর একদিন আসবো। ছেলে বেরুবে কি না, আমি না গেলে—

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল,—আপনার বাড়ী এখান থেকে কত দূর হবে?

দ্রৌপদী কহিল,—আরও খানিকটা যেতে হবে মা। নিকিরিপাড়ায় আমরা থাকি।

কথায় কথায় ইহারা চৌরাস্তার কাছেই আসিয়া পড়িয়াছিল। এখানটা খুব গুলজার। রাস্তার উপরেই হরিদ্রাবর্ণের বাড়ীখানা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। বাড়ীখানার সম্মুখেই কয়েকখানা বাড়ীর গাড়ী সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে; রাস্তার উপরেই সামনের প্রকাণ্ড ঘরখানির ভিতর বহুলোকের ভীড়।

বাড়ীর ভিতরে যাইবার পথটি ছিল স্বতন্ত্র; বড় রাস্তার উপরে ফুটপাথটির ধার দিয়া ছোট গলিটি সেখানে গিয়া মিশিয়াছে।

পার্ব্বতী গলির পথে পা বাড়াইয়া কহিল,—কাল কিন্তু আসা চা
ছেলেকে ব'লে আসবেন—যেতে একটু দেরী হবে।

দ্রৌপদী হাসিয়া কহিল,—তাই হবে মা।

পাতিরাম বাড়ীতে মায়েরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। মায়ের অনুমা
ও সেই সঙ্গে পদধুলি না লইয়া সে কদাপি বাড়ীর বাহির হয় না। মা
দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—আজ যে এত দেরী হল মা?

দ্রৌপদী ঘাটের কথা সংক্ষেপে বলিয়া আবদারের সুরে ছেলে
জানাইল,—আমি নন্দর মাকে বলেছি বাবা, শীত যখন সত্যিই পড়ে
ছেলেকে বলবো কালই যেন আমাকে গায়ের কাপড় পরায়।

কথাটা বলিয়াই সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাহি
সে দৃষ্টির অর্থ উপলব্ধি করিতে ছেলের বিলম্ব হইল না; সেও তৎক্ষণা
উত্তর দিল,—ঠিক জবাবই তুমি দিয়েছ মা, তুমি ত বড়লোকের মা ন
গরীব ছেলের মা, সেই হালেই কাল গায়ের কাপড় গায়ে দেবে,
সত্যি সত্যিই শীত ভাঙ্গে।

দ্রৌপদী প্রসন্ন দৃষ্টি ছেলের মুখের উপর ফেলিয়া কহিল,—হ্যাঁ, ঐ
মেয়েটির কথা বলছিলুম, যে নন্দর মা'র গায়ের শালখানার ভূর ভে
দিলে, তার বাবা নাকি খুব বড় কারবারী, শাল র‍্যাপার দোলাই
তৈরী করায়। ঐ যে বাজারের চৌ-মাথায় হলদে রঙ্গের
—ঐ খানেই ওরা নতুন এসেছে। বাড়ীর সামনে বাবা কত যে
আর বাইরের ঘরে কত লোকজন, কি আর বলবো—

পাতিরাম কহিল,—আমি জানি মা, ওদের মস্ত বড় কারবার—

দ্রৌপদী আগ্রহের সুরে কহিল,—তুমি জান তাহলে! আচ্ছা

ওরা বাঙ্গালী, না পাঞ্জাবী? মেয়েটির কথাবার্ত্তা সবই বাঙ্গালীর মত, কিন্তু কাপড় পড়ার কায়দা আর চেহারা দেখলে মনে হয় যেন পাঞ্জাবী।

পাতিরাম হাসিমুখে জানাইল,—না মা, শুনিছি, ওরা বাঙ্গালী; তবে অনেকদিন পাঞ্জাবে থেকে, আদব কায়দা পাঞ্জাবীদের মতই হয়ে থাকবে। এখন পায়ের ধূলো দাও মা, বেলা হয়ে গেল—

পাতিরাম গড় হইয়া মায়ের দুই পায়ের ধূলি লইয়া মাথায় দিল, দেবতার দ্বারে ভক্ত যে ভাবে মাথা ঠেকাইয়া ইষ্টকামনা করে, সেইরূপ নিষ্ঠা সহকারেই পাতিরাম মায়ের নিকট আশীষ চাহিল।

মা ছেলের চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিল,—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক বাবা! এসো।

পরদিন প্রত্যূষে নিত্য নিয়মিত স্নানার্থিনীরা সকলেই ঘাটে উপস্থিত। স্নানের সঙ্গে গল্প ও বিবিধ আলোচনার অন্ত নাই। পূর্ব্বদিন পার্ব্বতীর নিকট রীতিমত অপদস্থ হইয়াও নন্দরমার চৈতন্য হয় নাই। এই শ্রেণীর মেয়েদের অহমিকা বুদ্ধিবৃত্তিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে, নিজের তাল প্রমাণ দোষ ত্রুটি ইহারা উপলব্ধি করিতে পারে না পরের তিল প্রমাণ ত্রুটিকেই তালে পরিণত করিতে চাহে। সুতরাং এদিনও নন্দর মা পাতিরামের মা ও পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া কত কথাই তাহার সঙ্গিনীদিগকে শুনাইতেছিল। কথাগুলি এ পক্ষের কাণে আসিয়া বাজিলেও পার্ব্বতী শুধু এক একবার নিরুত্তরে সেদিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু এই হাসি বুঝি নন্দর মা'র গায়ে তীরের ফলার মত বিঁধিতেছিল।

ঘাটের সিঁড়ির উপরে সুপ্রশস্তটির একধারে দুইব্যক্তি কাপড়ে বাঁধা দুইটি গাঁটরি লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। কাপড় ছাড়িয়া দ্রৌপদী ও পার্ব্বতী চৌতারায় আসিয়া দাঁড়াইতেই, নন্দর মুখখানা মচকাইয়া একটি অঙ্গুলি হেলাইয়া উভয়কে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল,—দেখনা চেয়ে—মাণিক যোড় !

কথাটা পার্ব্বতীর কাণে গেল। সে তখন গলার স্বর একটু উঁচু করিয়া কহিল,—আপনারা সকলে দেখুন, পাতিরাম বাবুর মা আজ শীতের কাপড় গায়ে দেবেন।

যদিও কথায় কথায় এই প্রসঙ্গ কাল উঠিয়াছিল, কিন্তু কথাটা বোধ হয় সকলের মনে ছিল না, কিম্বা ইহাতে কোনরূপ গুরুত্ব আছে এমন কথাও কাহারও মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু পার্ব্বতীর এই ঘোষণা সকলকেই যেন এক লহমায় এ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিল। অনেকগুলি কৌতূহলী চক্ষু চঞ্চল হইয়া চাতালের দিকে পড়িল।

পার্ব্বতীর কথায় দ্রৌপদীর মুখখানা লজ্জায় বিবর্ণ হইয়া গেল। লোক দেখাইয়া কোন কিছু সৎকর্ম্ম করা তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সে চাপা স্বরে পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া কহিল,—ছি, মা! ও কথা বললে ত্যামাক দেখান হয়।—দাওতো মা দুখানা কাপড়, আগে দিয়ে আসি।

কাপড়ের বস্তা আগলাইয়া যে দুইটি লোক বসিয়াছিল, দ্রৌপদী ও পার্ব্বতীকে দেখিয়াই তাহারা প্রস্তুত হইতেছিল। পার্ব্বতীর নির্দ্দেশ মত দুইখানি শাল তাহার হাতে দিল। সকলেই দেখিল, নন্দর যে শাল গায়ে জড়াইয়াছে, এই দুইখানি শালের পাড়, আঁচলা

ারুকায অবিকল সেই রকম। শাল দুখানি লইয়া দ্রৌপদী মন্দিরের
কে চলিয়া গেল।

পার্ব্বতী ঘাটের সকলকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—এ দুখানা আগাম
নয়ে গেলেন মন্দিরে—মন্দিরের ঠাকুর আর পুরুত ঠাকুরের জন্যে।
ার এইগুলো এনেছেন, ঘাটের পাণ্ডা ঠাকুরদের জন্যে—এঁদের গায়ে
রিয়ে দেবেন বলে। তারপর, ঘাটের ধারে যতগুলো ভিখিরী-দেবতা
দী গায়ে বসে শীতে হি-হি করে কাঁপছে, এগুলো উঠবে তাদের
ায়ে।

ঘাটশুদ্ধ সকলেই পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া
থাগুলি শুনিতেছিল। এমন অদ্ভুত কথা কেহ কি কখন শুনিয়াছে?
মন করিয়া শীতের কাপড় গায়ে দেওয়া কেহ কি কখন দেখিয়াছে?
হা সত্য, না স্বপ্ন!

দ্রৌপদী যখন মন্দির হইতে বাহিরে আসিল, মন্দিরের ভিতর
ইতে তাহার উদ্দেশে পুরোহিতের জয়ধ্বনি ঘাটেও ভাসিয়া আসিতেছিল।
াহাকে দেখিয়াই পার্ব্বতী কহিল,—এবার আপনি বাছা শীতের কাপড়-
লো ভালো করেই গায়ে দিন—

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই যখন বস্তা দুইটি নিঃশেষ হইয়া গেল এবং
কই পর্য্যায়ের কারুকার্য্য খচিত পশমীনা শালগুলি ঘাটের সকল
াণ্ডা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্নিহিত প্রায় পঞ্চাশটি ভিক্ষাজীবির
য়ে উঠিল, তখন দ্রৌপদীর গায়ে দিতে একখানিও অবশিষ্ট
ল না।

পার্ব্বতী অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে পূরন্ত গণ্ডদেশে অঙ্গুষ্ঠটি ঠেকাইয়া কহিয়া

উঠিল,—অ-মা, সব শাল যে ফুরিয়ে গেল পাতিরামের মা, আপনি কি গায়ে দেবেন বলুনত ! সেই আঁচলই আপনার সার হ'ল বাছা !

দ্রৌপদী ভাব গদগদ স্বরে উত্তর দিল,—মেয়েদের শীত কাটাবার এই ত আসল কাপড় মা !

বহুকণ্ঠের ধ্বনি উঠিল,—মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, জয়জয় কার হোক—ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করুন !

পার্ব্বতী কহিল,—বড়মানুষীর ড্যামাক যারা করে, তার আজ দেখে শিখুক—সত্যিকারের বড় লোক কাকে বলে। নিজে খেলে আর পরলে বড় মানুষী করা হয় না ; বড় মানুষী দেখালেন পাতিরামের মা।

নন্দর মা মুখখানা কালো করিয়া চাকরকে লইয়া চলিয়া গেল তাহার মুখে আর কথা নাই।

## ১৪

হেড আফিসে পাতিরামের খাস কামরায় সীতানাথ তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। অনেকগুলি খবর সে সংগ্রহ করিয়াছে এবং কতকগুলি খবর আপনা হইতেই আসিয়াছে। অবিলম্বে যথাবিহিত আলোচনা প্রয়োজন।

ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়েই প্রত্যহ পাতিরাম তাহার খাস কামরায় আসিয়া বসে। বিভিন্ন প্রয়োজন লইয়া বিভিন্ন শ্রেণীর বহু উমেদার সাগ্রহে তাহার প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

এদিন প্রায় আধঘণ্টা দেরী করিয়া পাতিরাম আফিসে ঢুকিল। ঘরের সম্মুখে বৃহৎ বারান্দাটির উপর সারি বন্দী বেঞ্চিগুলির উপর বসিয়া প্রার্থীরা আকাঙ্খিত মানুষটির প্রতীক্ষা করিতেছিল। দীর্ঘ সোপান শ্রেণী পার হইয়া পাতিরামকে বারান্দায় আসিতে দেখিয়াই তাহারা ধড়মড় করিয়া একসঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল, সকলেই ত্রস্ত, সশ্রদ্ধ ও নত মস্তক।

মাথা একটু হেলাইয়া সকলের শ্রদ্ধাভিবাদনের নীরব প্রত্যুত্তর দিয়া পাতিরাম তাহার খাস কামরায় ঢুকিল। সীতানাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল,—দেরী দেখে আমি ভারি ভাবছিলুম।

পাতিরাম তাহার চেয়ারে বসিয়া, গায়ের মোটা চাদরখানা পীঠের দিকে রাখিয়া বলিল,—শীত পড়েছে কিনা, মা আজ গরম কাপড় পরলেন, তাই দেরী হয়ে গেল। মা'র কাযের জন্য দেরী যদি হয়, তাতে আফশোষ নেই। যাক, কাযগুলো তাড়াতাড়ি সেরে ফেলো; অনেকগুলো লোক বসে আছে দেখলুম।

সীতানাথ বলিল,—টালিগঞ্জে যে তীরটা তাগ্ করে ছুঁড়েছিলুম, লেগে গেছে।

পাতিরামের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল,—দরখাস্ত করেছে বুঝি?

সীতানাথ উত্তর দিল,—দরখাস্ত নিয়ে নিজেই হাজীর হয়েছে।

—কে, শ্রীবাস বিশ্বাস?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নিজেই এসেছে। যেটুকু খবর ওদের সম্বন্ধে পেয়েছিলুম, সবই সত্যি। সংসারটি ছোট হলেও কষ্টের অন্ত নেই; ছেলে পড়িয়ে যা পায়, তাই সম্বল; দুবেলার সংস্থানও হয় না।

পাতিরাম মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল,—অথচ, কংস-মামা চুপচাপ, কোন খোঁজ খবর নেয় না! ঐ নচ্ছার কীর্ত্তেটাই তার সর্ব্বস্ব। আচ্ছা, ও এখন বসুক, এদের কাযগুলো সেরে, সবশেষে ওকে ডাকবে।

সীতানাথ বলিল,—সেই ভালো। হঁ্যা, আর একটা খবর আছে।

পাতিরাম চক্ষুতে প্রশ্ন ভরিয়া সীতানাথের দিকে চাহিল।

সীতানাথ টেবলের উপর হইতে একখানা মনোগ্রাম ছাপা সুবৃহৎ লেফাফা তুলিয়া কহিল,—কৃত্তিবাস কোলে এক মাইফেলে আপনাকে নেমন্তন্ন করেছে। তারই চিঠি। সীতানাথ লেফাফাখানা প্রভুর দিকে আগাইয়া দিল।

অস্পৃশ্য ময়লা দেখিলে মানুষ যে ভাবে পিছাইয়া যায়, সেইরূপ ভঙ্গীতে হাতখানা সরাইয়া লইয়া পাতিরাম কহিল,—কীর্ত্তের কার্ড। নেমন্তন্ন করেছে। খামে বুঝি তারই মনোগ্রাম ছাপা?

সীতানাথ কথাটায় সায় দিয়া কহিল,—হঁ্যা।

পাতিরাম মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল,—জোচ্চুরির টাকায় নবাবী সুরু করেছে দেখছি। ভালো, ভালো! চিঠিখানা পড়তো—

সীতানাথ লেফাফার ভিতর হইতে কার্ডখানা বাহির করিয়া পড়িল,—

আগামী ১১ই নভেম্বর শনিবার সায়াহ্নে ৫ নং দমদমা রোড়ের মেনকা-মঞ্জিলে সঙ্গীতোৎসব হইবে, সেই বৈঠকে যোগ দিতে উদ্যোক্তারা প্রীতি লাভ করিবে। নিবেদক—কৃত্তিবাস কেলি

পাতিরাম কহিল,—কোলে দেখছি কেলি হয়েছে; এর পর যে দিন কুলি হবে, সেদিন—

কথাটা শেষ না করিয়াই পাতিরাম কহিল,—আচ্ছা, কার্ড খানা রাখো, এর পর ভাবা যাবে।

অতঃপর পাতিরামের কায আরম্ভ হইল। আফিস, ব্যবসায় বা কার্য্য সম্পর্কে প্রত্যহ বহুলোকই হেড আফিসে আসিয়া থাকে। অফিসে লোকজন থাকা সত্ত্বেও পাতিরাম নিজে তাহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া যথাযথ নির্দ্দেশ প্রদান করে। ইহাই তাহার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা। এক একজন সাক্ষাৎপ্রার্থীকে ডাকিয়া—অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার বক্তব্য শুনিয়া—সে সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা প্রদান সম্পর্কে পাতিরামের দক্ষতা অসাধারণ। এদিনও ঘণ্টা খানেকের মধ্যে অন্যান্য লোকের সহিত কথাবার্ত্তার পর সর্ব্বশেষে পাতিরামের খাস কামরায় যাহার ডাক পড়িল, তাহার নাম—শ্রীবাস বিশ্বাস।

সুগঠিত উন্নত দেহ, শ্রীমান, তরুণ যুবা; মুখখানির উপর সহসা দৃষ্টি পড়িলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে এবং মনে হয় বুঝি এখনও তাহাতে কোনরূপ অনাচারের কালিমা পড়ে নাই। দুই চক্ষু আয়ত, মাথার চুলগুলি এমন ছোট করিয়া ছাঁটা যে, চিরুণী তাহার ভিতরে প্রবেশ করিবার সুযোগটুকুও পায় নাই। গায়ের কামিজ ও পরণের কাপড়খানি দেখিলেই মনে হয়, সেগুলি বহুদিন রজকের ভাঁটিতে উঠে নাই, বাড়ীতেই কাচিয়া সাফ করা হইয়াছে; অথচ ইহাতেই বেশ পরিচ্ছন্নতা ও ছেলেটির রুচির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইহার আপাদ মস্তক দেখিয়াই পাতিরাম মনে মনে এই সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিয়া লইল।

অতঃপর মুখখানা রীতিমত গম্ভীর করিয়া পাতিরাম প্রথমেই প্রশ্ন করিল,—তোমারই নাম শ্রীবাস বিশ্বাস?

বিনীত কণ্ঠে শ্রীবাস উত্তর দিল,– আজ্ঞে হ্যাঁ।

—জাতি ?

—পরামাণিক।

—বাপের নাম ?

—৺চিনিরাম পরামাণিক।

—পেশা ?

শ্রীবাস অসঙ্কোচেই উত্তর দিল,—পৈতৃক পেশা ক্ষৌরকার্য্যই বলতে হয়। কিন্তু বাবার সঙ্গে সঙ্গে সে পাঠ উঠে গেছে। তিনি আমাকে কলেজে পড়ান, জাতিগত পেশাটা শেখাননি। তাই না আজ একুল ওকুল দুকুল হারিয়ে বেকার হয়ে বসে আছি স্যার !

—লেখাপড়া কতদূর করেছ ?

—বি, এ পর্য্যন্ত পড়েছি, কিন্তু পাশ করতে পারিনি।

—বিবাহ করেছ ?

—আজ্ঞে না।

—সংসারে কে কে আছে ?

—এক বিধবা পিসি, আর দুটি ছোট ছোট বোন। একটির বয়স দশ, আর একটির বয়স সাত। এদের নিয়েই সংসার।

—কি করে সংসার চলছে ?

—ছেলে পড়িয়ে গুটি দশেক টাকা পাই, তাতেই কোন রকমে একবেলা চলে যায়। বাড়ীখানা নিজেদের, খোলার বাড়ী, তার দুখানা ঘর ভাড়া দিয়ে যেটুকু পাওয়া যায়, তা থেকে ট্যাক্সটা কোন রকমে ওঠে।

পাতিরামের মুখখানা যেন সহসা প্রসন্ন হইয়া উঠিল ; কোমল কণ্ঠে

হিল,—তুমি যে কিছু ভাঁড়িয়ে বা রেখে—ঢেকে কথাগুলো বলো নি, এতে আমি খুসী হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে আমার নিবনাও হবে, তোমাকে দিয়ে কাজ আমার ঠিক চলবে। যাক্, এখন কি পেলে তোমার পোষাবে শুনি ?

শ্রীবাস কহিল,—দেখুন স্যার, বড় কষ্টেই মানুষ হয়েছি। বাবা যে কি করে আমাকে এতদূর লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, সেটা যখন ভাবি, মকে উঠি ; আর তখনি মনটা মুসড়ে যায়—লেখাপড়া শিখেও কিছু রতে পারিনি—বাবার কষ্ট ঘোচাবার সুযোগ পাইনি এই ভেবে। নি যখন চলে গেছেন, আর সংসারটা এক রকম করে চলে যাচ্ছে, খন খাঁই আমার বেশী নেই। আমার যতটুকু বিদ্যা আর ক্ষমতা—াই দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গেই আপনার কায আমি করবো! আমার কায র্ম্ম ও যোগ্যতা দেখে আপনি হাত তুলে যা দেবেন, আমি তাই হাসিমুখে

পাতিরাম কহিল,—স্পষ্ট কথাই তুমি বলেছ শ্রীবাস ; বেশ, আমিও মাকে কথা দিচ্ছি—যদি তুমি তোমার ঐ কথাগুলো ঠিক বজায় তে পারো—তাহলে তোমার সংসার সম্বন্ধে কিছুই তোমাকে ভাবতে না, সমস্ত ভারই আমি নেব। শুধু তাই নয়, তোমার ভাগ্যোদয়ও ত হয়, সে চেষ্টাও আমি করবো।

চাকরীর দরখাস্ত লইয়া কত জায়গাতেই শ্রীবাস গিয়াছে, কত কের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে, কত কথোপকথন হইয়াছে, কিন্তু ন আন্তরিকতার সহিত কেহ তাহার সহিত কথা কয় নাই এবং এমন

আশ্বাসও কেহ তাহাকে দেয় নাই। সে অবাক হইয়াই এই অদ্ভুত মানুষটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পাতিরাম অতঃপর কহিল,—আজ থেকেই তুমি কাযে বসে যাও সীতানাথ তোমাকে সব দেখিয়ে দেবে। আর যাবার সময় ক্যাশ থেকে আগাম পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে যাবে। উপস্থিত যে সব খরচ পত্র সেগুলো ওতে সেরে নেবে।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শ্রীবাস কহিল,—স্যার! এ যে আমার পক্ষে—

আনন্দের আবেগে তাহার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন ও কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া গেল

পাতিরাম সহজ কণ্ঠে কহিল,—তোমার প্রয়োজন বুঝেই এ ব্যবস্থা আমাকে করতে হল হে! পেছনে অভাব থাকলে কায করবে কেমন করে? তাতে যে আমারই ক্ষতি হবে।

সীতানাথ এই সময় প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া তাড়াতাড়ি কহিল,—আসুন শ্রীবাস বাবু, আপনার বসবার জায়গাটা দেখিয়ে দিই।

শ্রীবাস যুক্ত করে এই সম্মানভাজন সদাশয় ব্যক্তিটিকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানাইয়া সীতানাথের অনুগমন করিল।

## ১৫

সেদিন একটু বেলাবেলিই পাতিরাম অফিস হইতে ফিরিল এবং ফিরিবার পথে মনসারাম পর্ব্বতরামের গদীর সম্মুখে আসিয়া থামিল।

দেউড়ীতে এক পশ্চিমা দারোয়ান বসিয়াছিল। পাতিরামকে দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেলাম বাজাইল। একসঙ্গে অনেকগুলি শাল খরিদ সম্পর্কে সে এই বড়দরের খরিদারটিকে চিনিতে পারিয়াছিল।

পাতিরাম প্রশ্ন করিল,—মনসারামবাবু বাড়ী আছেন?

দরোয়ান জানাইল,—তিনি বড়বাজারে গেছেন, আপনার কিছু কায আছে কি?

পাতিরাম কহিল,—কিছু লেনদেনের ব্যাপার আছে।

দারোয়ান সসম্ভ্রমে কহিল,—বাবু না থাকলেও কায আটকাবে না, আপনি বসুন।

দরোয়ান তাড়াতাড়ি গদীঘরের দরোজা খুলিয়া তাহাকে বসিবার অনুরোধ জানাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

ঘরখানি ছোট হইলেও দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘর যোড়া একখানা পুরু ফরাস বিছানো, তাহার উপর কতিপয় মোটা মোটা তাকিয়া; এক ধারে একটি সুদৃশ্য ডেস্ক, তাহার দক্ষিণে দেওয়াল সংলগ্ন একটি সুশ্রী আয়রণ চেষ্ট। ডেস্কটির সম্মুখে একখানি কার্পেটের আসন আস্তৃত। সেটি যেন গদীর মালিকের বসিবার স্থানটুকু নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। দেওয়ালে কয়েকখানি ছবি, প্রত্যেকটিতেই পুরাণ-বর্ণিত দেবদেবীর লীলা রূপায়িত। ভিতরের দরজাটির উপর একখানা রঙ্গীণ পরদা টাঙ্গানো।

ফরাসের উপর বসিয়া পাতিরাম এই ক্ষুদ্র গদীঘরখানির রূপসজ্জা দেখিতে লাগিল। আগের দিন কিছুক্ষণের জন্য পাতিরাম এই ঘরে আসিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু তখন একই ধরণের ও দামের অনেকগুলি শাল পছন্দ করিতে তাহার নিপুণ দৃষ্টি তাহাদের ব্যাপারীর দিকেই নিবদ্ধ ছিল।

শীতবস্ত্রের ব্যাপারে পাতিরামের কোন অভিজ্ঞতা না থাকিলে পাতিরাম সে সময় তাহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এই গদীর মালিক মনসারামে মুখখানার উপর নিবদ্ধ করিয়াই বুঝিয়াছিল যে, লোকটির উপর অনায়াসে নির্ভর করা চলে এবং ইহার সহিত ব্যাপারে সে ঠকিবেনা। তাই সময় কোন দরদস্তরী না করিয়াই, শুধু নিজের অভিপ্রায়টুকু জানাই মনসারামের হাতে একশো টাকার পাঁচখানি নোট সে অগ্রিম প্রদা করে। মনসারাম তাহার রসিদ দিতে চাহিলে পাতিরাম ঈষৎ হাসি উত্তর দিয়াছিল,—কোন দরকার নেই, সব টাকাই ত আমি চুকিয়ে দি না। কাল সকালেই আপনি ষাটখানি কাপড় গঙ্গার ঘাটে আপন লোক দিয়ে পাঠাবেন ; রঙ্গে বা ডিজাইনে এদিক ওদিক হলে ক্ষতি নে কিন্তু দামটি আর কোয়ালিটি সমান হওয়া চাই। আপনি বিলটা ক রাখবেন, কাল বিকেলে আফিসের পান্টা বাকি টাকাটা মিটি দিয়ে যাবো।

শীতবস্ত্রের সেই হিসাবটি মিলাইতেই পাতিরাম মনসারামের গদী আসিয়াছে। অফিসে যাইবার সময় মায়ের মুখেই সে শুনিয়াছে মনসারাম তাহার ফরমাস মত মাল ঠিক সময়েই সরবরাহ করিয়াছে মনসারামের মেয়ে পার্ব্বতী নিজেই তুই জন লোকের মাথায় চাপাই শীতবস্ত্রের তুইটি গাঁট গঙ্গার ঘাটে লইয়া যায়। কাপড়গুলি দেখি ঘাটশুদ্ধ সকলেই ধন্য ধন্য করিয়াছে। একবাক্যে সকলেই বলিয়াছে এমনটি তাহারা কখনো দেখে নাই। কাপড়গুলির দাম লইয়াও ঘ অনেকে অনেক কথা বলিয়াছে। কাহারও মতে এমন কাপড় করা বারো চোদ্দ টাকার কমে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ অনুমান করে

সুবিধায় লাট কিনেছে, তাহলেও আট দশ টাকার কমে এ জিনিষ জন্মায় না। তার ওপর যারা বেচেছে—লাভ ত নিয়েছে ইত্যাদি।

পাতিরাম হাসিমুখে মাকে শুধু প্রশ্ন করে,—লোকের কথা থাক, তুমি খুসী হয়েছ কি না তাই বল?

মা গদ গদ স্বরে উত্তর দিল,—এর জবাব মুখে আমি কি দেব বল্, যদি সে সময় গঙ্গার ঘাটে যেতিস বাবা, তাহলে নিজের চোখে দেখে বুঝতে পারতিস্, কি রকম ঘটা করে তোর মা গরম কাপড় গায়ে দিয়েছে। তুইত একদিন শীতের কাপড় আমাকে পরালি পত্তা, কিন্তু এর দৌলতে সাত জন্ম আমাকে আর শীতের ভাবনা ভাবতে হবে না। আর এই আশীর্ব্বাদ করি বাবা, ভগবান যেন জন্ম জন্ম এমনি করে বিলিয়ে দেবার দৌলত আর মন তোকে দেন।

অর্ডার লইবার সময় মনসারাম পাতিরামকে বলিয়াছিল,—আপনার অভিপ্রায় আমি বুঝেছি, কাপড় আমি সেইভাবেই পছন্দ করে দেব, আপনি শুধু দামের একটা আভাস দিয়ে যান।

পাতিরাম তাহাতে উত্তর দিয়াছিল,—কাপড় রঙ্গচঙ্গে হবে, চারধারে সমান কায থাকবে, আর শীত ভাঙ্গবে। তার জন্য ফর্দ্দি প্রতি দশ টাকা পর্য্যন্ত দিতেও আমার আপত্তি নেই।

মায়ের মুখে লোকের প্রশংসা শুনিয়া দাম সম্বন্ধে তাহাদের অনুমানের আভাস পাইয়া পাতিরাম বুঝিয়াছিল যে, মায়ের শীতের কাপড় পরিবার এই উৎসবে তাহাকে আরও শত মুদ্রা মনসারামের গদীতে দাখিল করিতে হইবে। হিসাবটি পরিষ্কার করিবার জন্য সে প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিল। কলিকাতা মহানগরীর বুকের উপর বসিয়া বরাবরই পাতিরাম পাওনা

দারের মর্যাদা ভোগ করিয়া আসিতেছে, অপর কেহ তাহার পাওনাদা
হইবার স্পর্দ্ধা রাখে—এ চিন্তাও পাতিরামের পক্ষে অসহ্য। সুতরা
কাপড়ের হিসাবটি মিটাইবার পক্ষে তাহার এই তৎপরতা স্বাভাবিক।

ভিতরের দিকের পরদাটি হঠাৎ দুলিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই তাহ
ভিতর হইতে এক অপরিচিতা তরুণীকে ফরাসের উপর উঠিতে দেখি
পাতিরাম একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। তরুণী কিন্তু দিব্য সপ্রতিভভা
কোমল করপল্লবদুটি যুক্ত করিয়া ললাটে ঠেকাইয়া হাসিমুখে প্রশ্ন করি
—আপনিই বোধ হয় পাতিরাম বাবু?

পাতিরাম অবাক! কক্ষমধ্যে সহসা যে এভাবে অপরিচিতা তরুণী
আবির্ভাব হইবে ও তাহার উদ্দেশে এরূপ প্রশ্ন উঠিবে, তাহা সে কল্পনা
করে নাই। কিন্তু ব্যবসায়ক্ষেত্রে কঠোর জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া যে
লোক কোনদিন চিত্তগত সঙ্কোচ বা সরমকে প্রশ্রয় দেয় নাই এব
নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া কখনও যাহার পদস্খলন হয় নাই
কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা সম্পর্কে অধিকক্ষণ অভিভূত থাকাও তাহার পক্ষে
সম্ভবপর নহে। সুতরাং প্রাথমিক সঙ্কোচটুকু সবলে কাটাইয়া পাতিরা
তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং প্রতিনমস্কার জানাইয়া সসম্ভ্রমে উত্ত
দিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই নাম পাতিরাম পাকড়ে।

মৃদু হাসিয়া তরুণী কহিল,—আপনি উঠলেন কেন, বসুন।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে ডেস্কের সম্মুখে আস্তৃত কার্পেটের আসন খানি
উপর বসিয়া পড়িল; অগত্যা পাতিরামকেও নিরুত্তরে আ-ন গ্রহণ করি
হইল।

অতঃপর তরুণীর সপ্রশ্ন দৃষ্টি পাতিরামের উপর পড়িতেই সে ম

ন অস্বস্তি বোধ করিয়া কহিল,—মনসারাম বাবুর সঙ্গে দেখা করবার জ্ঞই আমি এসেছিলাম।

তরুণী কহিল,—বাবা আপনাকে আসতে বলেছিলেন আমি তা জানি। াপনার আসবার একটু আগেই একটা জরুরী বরাত পেয়ে বড় বাজারে াকে যেতে হয়েছে। কিন্তু তিনি না থাকলেও আপনার কায আটকাবে না।

পাতিরাম বুঝিল, তরুণী মনসারামের কন্যা। ইহার নিকটেই সে সাব রাখিয়া গিয়াছে। কতকটা আশ্বস্ত হইয়া পাতিরাম কহিল,—

তাহলে আমার কাযটি আপনিই মিটিয়ে দিন। সকালের কাপড়ের াসেবে আমাকে আর কত টাকা দিতে হবে বলুন ত?

পার্ব্বতী মুখখানা একটু গম্ভীর করিয়া কহিল,—দুশো টাকা।

পাতিরাম তৎক্ষণাৎ মণিব্যাগ হইতে একশত টাকার দুই কেতা াট বাহির করিয়া পার্ব্বতীর দিকে আগাইয়া দিল।

পার্ব্বতী এবার ফিক করিয়া হাসিয়া কহিল,—দেবার পালা এবার াদের, আপনার নয়। দুশো টাকা আপনিই ফেরৎ পাবেন আমাদের া থেকে।

আঁচোলে বাঁধা দীর্ঘ চাবিটি দিয়া ক্ষিপ্র হস্তে পার্ব্বতী লোহার খুলিয়া খামে মোড়া একটা পুলিন্দা বাহির করিল ও উপরে া নামটি পড়িয়া পাতিরাম যেস্থানে তাহার নোট দুইখানি রাখিয়া য়াভিভূতভাবে চাহিয়াছিল—একটু ঝুঁকিয়া সেইখানেই নিক্ষেপ ল।

পাতিরাম খামখানি তুলিয়া দেখিল, উপরে বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা য়াছে—পাতিরাম বাবুর হিসাব।

খামখানি খুলিতেই একশত টাকার দুইখানি নোট ও তৎসহ এ টুকরা বাদামী কাগজে লিখা ফর্দ্দ বাহির হইয়া পড়িল। ফর্দ্দে পাতিরা পাকড়ের নামে পাঁচ শত টাকা জমা এবং ৬০ ফর্দ্দী শালের মূ পাঁচ টাকা হিসাবে তিন শত টাকা খরচ লিখিয়া বিক্রী দুই শত টা ফেরৎ দিবার নির্দ্দেশ আছে।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া পাতিরাম পার্ব্বতীর দিকে চাহি কত লোকের সহিত সে লেন দেন করিয়াছে, কত বিভিন্ন প্রকারে ক্রয় বিক্রয়ও হইয়াছে, কিন্তু এই ধরণের ঘটনা তাহার কর্ম্মজীব কদাচ ঘটে নাই! হিসাবের এতটা তারতম্য কি কখনও সম্ভব, অথব মেয়েটি তাহার সহিত রহস্য করিতেছে?

বিস্ময়ের সুরে পাতিরাম কহিল,—অদ্ভুত ব্যাপার ত! আমা আরও দু'শো টাকা দিতে হবে ভেবে আমি তৈরী হয়েই এসেছি এখন আপনারাই দুশো টাকা ফেরৎ দিচ্ছেন আমাকে? ফর্দ্দে ভু নেই ত? এতটা ফারাক কি করে হতে পারে তা ত ভে পাচ্ছি না।

পার্ব্বতী হাসিমুখে উত্তর দিল,—কাকের মাংস কাকে খায় না এ কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? আপনিও ব্যাবসাদার, আমরাও ব্য করে খাই। তা ছাড়া, আপনার মাকে যে রকম ঘটা করে শীতে কাপড় আপনি পরিয়েছেন, আমরা সেটা সরবরাহ করতে পঞ্চা পারসেণ্ট লাভের লোভটুকু যদি ছেড়ে দিয়ে থাকি, তাতে বিস্ময়ের থাকতে পারে পাতিরাম বাবু?

পাতিরাম স্তব্ধভাবে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা কহিল

ঝিছি, এ কাণ্ড আপনার। এখন মনে হচ্ছে—আমার মা আপনার প্রশংসায় শতমুখ হয়েছিলেন। কিন্তু ব্যবসা করতে বসে, আর আমার ...রের সংস্পর্শে এসে আপনারা এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন, এটা আমার আদৌ ...চ্ছা নয়!

পার্ব্বতী কহিল,—ক্ষতি আমাদের হয়নি পাতিরাম বাবু! কেন আপনি এত উতলা হচ্ছেন। আসলে আমাদের হাত মোটেই পড়েনি, আপনি এ স্থির জানবেন।

পাতিরাম কহিল,—মায়ের মুখে শুনেছি, যে কাপড় আপনারা দিয়েছেন, ঘাটের লোকজন তা দেখে বলেছে—কোনটিই বারো টাকার কম নয়!

পার্ব্বতী কহিল,—এই জন্যই ত পাঞ্জাবীরা এসে বাঙ্গলার পয়সা এত সহজে লুটে নিয়ে যাচ্ছে পাতিরাম বাবু! এসব কাপড় ঠিক পাঞ্জাবে জন্মায় না—জাপাণী থেকে আসে; কিন্তু পাঞ্জাবীরা এমন কায়দা করে ...র ব্যাপার চালিয়ে আসছে যে, এর আসল শাঁসটুকু শোষে পাঞ্জাবের লোক, আর ছোবড়াগুলো চিবোয় কলকেতার কারবারীরা।

পাতিরাম প্রতিবাদের ভঙ্গীতে কহিল,—কেন, কলকেতার দোকানদারদের ভেতর অনেকেই ত আজকাল জানাচ্ছেন পাঞ্জাবে যে, তাঁদের ফ্যাক্টরী আছে, সেই ফ্যাক্টরীর তৈরী মাল তাঁরা বেচেন, তবে?

মুখটিপিয়া হাসিয়া পার্ব্বতী উত্তর দিল,—তাঁরা দুধের সাধ ঘোলে মেটাচ্ছেন! ফ্যাক্টরীর কথা মিছে; তবে কেউ কেউ এক আধ খানা কামরা ভাড়া করে তাতে এক এক সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছেন। কালে ভদ্রে কখনো আসেন, সেখানে থেকে মালপত্র গস্ত করেন, এই

পর্য্যন্ত ! তাতে তাঁদেরও পেট ও ভরে না, আর বাঙ্গলার লোকের অভাব ঘোচে না। অথচ বছরে যে কোটী কোটী টাকার শীতের কাপড় বিক্রী হয়, তার পৌনে ষোল আনা গ্রাহক এই বাঙ্গলার লোক ! কি এমন লাভের ব্যবসাটির হাড়হদ্দ জানবার জন্য কজন বাঙ্গালীর ঝোঁক আছে বলতে পারেন ?

পাতিরাম স্তব্ধভাবেই এই অদ্ভুত মেয়েটির মুখের কথা শুনিতেছিল ব্যবসায় সম্পর্কে যে সকল কথা তাহার মত ঝানু ব্যবসায়ীর পক্ষে অভিনব, কথা প্রসঙ্গে এই মেয়েটিকে তাহারই রহস্যোদ্ঘাটন করিতে দেখিয়া সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, এখনও তাহার শিখিবার ও আয়ত্ত করিবার অনেক কিছুই আছে সে ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিল, বাঙ্গালী এখনও ব্যবসায় ক্ষেত্রে কতটা পিছাইয়া রহিয়াছে। সত্যিই ত, প্রতি বৎসর বাঙ্গালী কোটী কোটী টাকার শীতের কাপড় কিনিয়া শীতনিবারণ করে, কিন্তু এই কাপড়ের ব্যাপারে তাহারা একেবারে অনভিজ্ঞ। বালিকার প্রত্যেক কথাটি কি কঠোর সত্যে অনুরঞ্জিত !

পাতিরাম এবার উচ্ছুসিত কণ্ঠে কহিল,—আপনার কথাগুলি সত্য। আমরা না পড়েই পণ্ডিত হতে চাই, সব বিষয়েই আমরা ওস্তাদ হয়েছি বলে গর্ব্ব করি। এতে ভিন্ন দেশের লোক আমাদের আহাম্মুকি দেখে হাসে আর আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে কাম গুছোয়। তার —দৃষ্টান্ত ত আপনি হাতে হাতেই দেখিয়ে দিলেন। তবুও আমার বুকখানা এই ভেবে গর্ব্বে ফুলে উঠছে যে, অন্তত একজন বাঙ্গালী পাঞ্জাবে গিয়ে এই ব্যবসাটির কলকাঠি বুঝে নিতে পেরেছেন।

পার্ব্বতী কহিল,—কিন্তু এই কলকাঠিটি হাতাবার জন্য আমার বাবাকে যে কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে—কত বাধা বিঘ্ন উপদ্রবের ভেতর দিয়ে যে তিনি মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছেন, সে সব বলতে গেলে এমন কত ঘণ্টাই কেটে যাবে! আজ ত বাবার এই কারবার দেখছেন, কিন্তু তাঁর ব্যবসার হাতে খড়ি—মাছ বিক্রী।

—মাছ বিক্রী?

—হ্যাঁ। আমাদের বাড়ী ছিল বসিরহাটে। বাবা আমার বরাবরই একগুঁয়ে, জ্ঞাতিদের সঙ্গে তাঁর বনতো না; শেষে তারা এক যোট হয়ে বাবাকে একঘরে করেন। বাবা তখন রাগ ক'রে আমার মাকে নিয়ে বরাবর অমৃতসরে চলে যান—ভাগ্য ফেরাতে। মার গায়ে কিছু গয়না ছিল, সেগুলো বেচে সেখানে মাছের দোকান করেন। পোনা মাছ সস্তায় কিনে—তাই কেটে ব্যাসন মাখিয়ে বেচতেন। মা অবশ্য সব যোগান দিতেন যেমনে ভাজা মাছ চড়া দামে পাঞ্জাবীরা কিনে খেতো. প্রত্যহ এত কাটতি হ'ত, যে শেষ পর্য্যন্ত অনেকে ফিরে যেতো। যখন এই মাছভাজার ব্যবসা চলছিলো, তখনো আমি জন্মায়নি। শুনেছি, বাবার ব্যবসার উন্নতি দেখে পাঞ্জাবীরা দল পাকাতে সুরু করে। একজন পাঞ্জাবীকে দিয়ে তারাও ঠিক ঐ ধরণের এক দোকান খুলে ফেলে তার দোকান খুলতেই বাবার দোকান সবাই মিলে বয়কট করলে। একদিনেই বাবার দোকান বন্ধ হয়ে গেল। বাবার মাথায়ও তখনি রোক চেপে বসলো,—লোকসানের পথে না গিয়ে অন্য রাস্তায় নেমে এর পাণ্টা জবাব দিতে কোমর বাঁধলেন। পাঞ্জাবে থাকতেই বাবা ওদের ভাষাটা শিখেছিলেন। দোকানপাট তুলে দিয়ে পেটের দায় জানিয়ে এক শালওয়ালার দোকানে

চাকরী নিলেন। এই শালওয়ালা এক সময়ে বাবার মাছের দোকানে একজন বড় রকমের গ্রাহক ছিলেন, আর ইনিই দল পাকিয়ে নিজে লোককে মাছের দোকান খুলে দিয়ে বাবার দোকানটি তুলে দেবা উপলক্ষ হন। বাবাও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন—এর প্রতিশোধ তিনি নিবেন। সাতটি বছর চাকরী করেই বাবা এই ব্যবসার যা কিছু সুড়ুঙ্গ সন্ধান সমস্তই জেনে নেন। শুধু তাই নয়, অদৃষ্টের চাকা এমন ভাবে ঘুরে যায় যে, বাবা যেখানে চাকরী করতেন, সেইখানেই মালিক হয়ে বসেন, আর মালিককে বাবার দয়ার ওপর নির্ভর করে দোকান ছেড়ে দিতে হয়। আজও সে লোক বেঁচে আছে আর বাবার দেওয়া মাসোহারায় তাঁর দিন চলছে।

নিবিষ্টমনে পার্ব্বতিরাম এই কাহিনী শুনিতেছিল। সহসা তাহার মুখদিয়া একটি প্রশ্ন আগ্রহের স্বরে বাহির হইল,—আপনার মা এখনো বেঁচে আছেন?

জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া পার্ব্বতী উত্তর দিল,—বাবার এ ব্যবসার যখন পূর্ণ জোয়ার চলেছে, একদিনের অসুখে মা তখন হঠাৎ মারা পড়েন। সাতবৎসর হতে চলল—আমরা তাঁকে হারিয়েছি।

—আপনার ভাই আছেন?

—না। আমিই বাবার একমাত্র সন্তান। তবে বাবা আমাকে ছেলের মতই শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলেছেন। আমার নাম পার্ব্বতী বলে, বাবা তাঁর ফার্ম্মের নাম রেখেছেন—মনসারাম পর্ব্বতরাম।

—আপনারা তা হলে—

—জাতে কি জানতে চাইছেন? আমরা জেলে—তাঁতি জেলে

সবেগে পাতিরাম সোজা হইয়া বসিল, তাহার চক্ষুর উপর হইতে ব্যবধানের একটা আবরণ কে যেন অদৃশ্য হস্তে সরাইয়া দিল !

## ১৬

দমদমা রোডের উপর ছোট একখানি বাগান বাড়ী। জনৈক ধনাঢ্য আহীর বাড়ীখানি সুবিধায় ক্রয় করিয়া ভাল রকমের ভাড়াটিয়া খুঁজিতে থাকে। কৃত্তিবাস কোলেও এই সময় এই অঞ্চলে ছোট খাটো একখানি বাগানবাড়ী খুঁজিতেছিল। উদ্দেশ্য, দীর্ঘকালের লীজ লইয়া সেই বাড়ীতে তাহার প্রিয়তমা রক্ষিতা মেনকা বাঈএর সহিত আত্মীয় স্বজনের অগোচরে প্রেমলীলা চালাইবে। বাড়ীখানি দেখিয়াই প্রেমিক যুগলের অত্যন্ত পছন্দ হইল। অবিলম্বে কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেল এবং আমূল সংস্কার ও সজ্জিত হইয়া বাড়ীখানি 'মেনকা-মঞ্জিল' নামে প্রতিষ্ঠা পাইল।

মেনকা নবযুবতী ও রূপবতী। তাহার রূপলাবণ্য ও স্বাস্থ্যপুষ্ট সুগঠিত দেহখানির একটা আকর্ষণও আছে। বহু পুরুষপতঙ্গ মেনকার রূপবহ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উন্মত্ত। বিডন ষ্ট্রীটের কোন একটা নামজাদা থিয়েটারের সে নৃত্যগীত পটিয়সী অভিনেত্রী। নৃত্যগীত বহুল চটুল ভূমিকার অভিনয়ে তাহার প্রতিষ্ঠাও প্রচুর। কৃত্তিবাস কোলে দমদমার ভাড়া করা এই সুসজ্জিত বাগান বাড়ীর সহিত মাসিক শতাধিক টাকার দক্ষিণার ব্যবস্থা করিয়া বহু বুভুক্ষুর গ্রাস হইতে ছিনাইয়া

মেনকাকে তাহার আয়ত্তাধীনে রাখিয়াছে। এজন্য সে মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করে এবং প্রায়ই মেনকা-মঞ্জিলে গান বাজনার আসর বসাইয়া সেই আসরে তাহার বন্ধুবর্গকে আনাইয়া—সে যে কত বড় ভাগ্যবান, তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়া থাকে। এইভাবে আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি ভিন্নও কোন গুরুতর কায গুছাইবার প্রয়োজন হইলে সে মেনকা মঞ্জিলে বিশেষ জলসার আয়োজন করিত এবং সেই আসরে সুকণ্ঠী ও সুদর্শন মেনকা বাইকে নাচাইয়া গাহয়াইয়া অভ্যাগত ব্যক্তি বিশেষের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া, কার্য্যোদ্ধার করিতেও লজ্জা অনুভব করিত না।

ইদানীং পাতিরামের শ্রীবৃদ্ধি কৃত্তিবাসের চক্ষুতে যেন শূল ফুটাইতে ছিল। নারী সম্পর্কে সে যে কত বড় ভাগ্যবান—এ পরিচয় তাহার অন্যান্য বন্ধুরা পাইলেও, পাতিরাম এ সম্বন্ধে অন্ধকারেই পড়িয়াছিল এ পর্য্যন্ত কত উৎসবই এ মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার সুপরিচিত প্রায় সকল বন্ধুই তাহাতে আমন্ত্রিত হইয়া ও যোগদান করিয়া তাহাকে ধন্য করিয়াছে, কিন্তু কোনও উৎসবেই পাতিরামকে নিমন্ত্রিত করা হয় নাই। সেই ত্রুটিটুকু সংশোধন করিতেই এদিনের উৎসবে সে সর্ব্বাগ্রে পাতিরামের আফিসে নিমন্ত্রণের কার্ড পাঠাইয়াছিল।

পাতিরাম যখন আস্তে আস্তে মেনকা-মঞ্জিলের সঙ্গীত আসরে উপস্থিত হইল, উৎসব তখন শেষ হইয়া, আসিয়াছে। অভ্যাগতগণ ক্রমশঃ বিদায় লইয়া গৃহ ফিরিতেছে।

পাতিরামকে দেখিয়াই কৃত্তিবাস ছুটিয়া আসিল, হাতখানা ধরিয়া সজোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়া কহিল,—এত দেরী করে এলে ভাই মজলিস ত এখন ভাঙবার জো—

একে একে নিবিছে দেউটি,
সারঙ্গ রবার বীণা নীরব সকলি—

নিকটেই একটা প্রকাণ্ড তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া রাধানাথ বাবু গড়গড়ার সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—তাতে কি, তোমার মেনকা ত রয়েছে, ও যে একাই একশো—

সীতানাথ হাসিয়া কহিল,—যা বলেছেন! একশ্চন্দ্র তমোহন্তি, ন চ তারা গনৈরপি—

পাতিরাম সহজকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—চাঁদটি এখানে কে? আর তারাই বা কারা?

কৃত্তিবাস ইতিমধ্যে আসরের মধ্যস্থলে উপবিষ্টা উজ্জ্বল বাসনা সালঙ্কার মেনকার কাছে গিয়া কানে কানে কি বলিতেছিল, সে সহসা উঠিয়া একেবারে পাতিরামের ঠিক পার্শ্বে আসিয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে কহিল,—চাঁদ হচ্ছেন আপনি পাতিরাম বাবু, আপনার উদয় হতেই তারার দল ম্রিয়মান হয়ে সরে পড়তে চান আর কি! আসুন—আরাই এবার আসর গুলজার করি।—কথাগুলি বলিয়াই মেনকা খপ করিয়া পাতিরামের একখানি হাত ধরিয়া টান দিল।

পাতিরাম সজোরে হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া কহিল,—ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এসেছি যখন, আসর গুলজার ত করবই; টানাটানিটা কি এত লোকের সামনে ভালো?

যে কয়জন তখনও আসেপাশে বসিয়াছিল, তাহাদের চোখে চোখে একটা ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, কাহারও কাহারও ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির ঝিলিক দেখা দিল।

কৃত্তিবাস পাতিরামকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—মেনকার নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ, ষ্টেজে দেখেও থাকবে। যাকে বলে—অলরাউণ্ড য়্যাকট্রেস! নাচ গান য়্যাক্টিং সব বিষয়েই ওস্তাদ, সাক্ষাৎ জিনিয়াস্—বরন্ য়্যাকট্রেস! তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় না থাকলেও তোমাকে মেনকা বিলক্ষণ জানে।

মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটাইয়া মেনকার দিকে চাহিয়া পাতিরাম কহিল,—বলেন কি? আমার মত নগন্য লোককেও আপনি জানেন?

মেনকা মুখ টিপিয়া হাসিয়া উত্তর দিল,—নইলে প্রথম দর্শনেই আপনার হাতখানা পাকড়ে ধরি?

পরক্ষণেই মুখখানা ঈষৎ ভার করিয়া কহিল,—কিন্তু আপনি খপ করে হাত ছাড়িয়ে নিলেন—ধরা দিলেন না! আমার অদৃষ্ট!

পাতিরাম কহিল,—আপনার কষ্ট লাঘব করবার জন্যই আমি অমন করে হাতখানা টেনে নিয়েছিলুম।

মেনকা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, তার মানে?

পাতিরাম অসঙ্কোচে উত্তর দিল,—মানে এই, আমি হচ্ছি জেলের ছেলে। আমার মা মাথায় মাছের বোঝা নিয়ে তাই বেচে আমাকে মানুষ করেছে। আমিও মাছ বেচে খাই। আপনার গায়ের চড়া এসেন্সের গন্ধ আমার হাতের মাছের গন্ধ ঘোচাতে পারে নি, আঁসটে গন্ধে পাছে আপনি কষ্ট পান, তাই অমন করে হাতখানা টেনে নিয়েছি, বুঝেছেন?

কথাটা যেন তীক্ষ্ণ খোঁজা দিয়া সকলকে স্তব্ধ করিয়া দিল। এমন করিয়া নিজের সুস্পষ্ট পরিচয় অকপট ভাষায় প্রকাশ্য সভায় সর্ব্বসম্পাদ

কেহ যে প্রকাশ করিতে পারে—এ অভিজ্ঞতা সমাগতদের মধ্যে কাহারও ছিল না। সাধারণ রঙ্গালয়ের এই অভিনেত্রীটি পর্য্যন্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া পাতিরামের দিকে চাহিয়া রহিল।

সহসা কৃত্তিবাস উঠিয়া কহিল,—তুমি যখন দেরী করে এসেছ পাতিরাম, তোমাকে একটু বেশীক্ষণ থাকতে হবে। আমাদের আর একটা নেমন্তন্ন আছে কাছেই, সেটা সেরে এখুনি ফিরছি। তুমি ততক্ষণ মেনকার দু একখানা গান শোনো, আলাপ করো। ওঠো হে রাধু—

রাধানাথবাবুও প্রস্তুত ছিল। পাতিরামকে কথা বলিবার আর অবসর না দিয়াই মেনকা ও পাতিরামকে আসিরে রাখিয়া আর সকলেই রঙ্গমঞ্চের অভিনেতৃ সুলভ ভঙ্গীতে চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পাতিরামের মুখে কোন কথা নাই; তাহার আচরণে চাঞ্চল্যের কোন লক্ষণও নাই। কত পুরুষের সংস্রবে মেনকাকে আসিতে হইয়াছে, তাহাদের স্তব স্তুতি প্রণয় নিবেদন শুনিয়া তাহার কান দুইটি কতবারই ঝালা পালা হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্য! এই লোকটির মুখে কোন প্রার্থনা নাই; চক্ষুর দৃষ্টিতে কোনরূপ লালসার আভাসও নাই,—বার বার তাহার পানে অপাঙ্গে চাহিয়াও মেনকা এই রহস্যময় মানুষটির চিত্তে কিছু মাত্র শিহরণ তুলিতে পারে নাই। সে অতি বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল, মানুষের চর্ম্মাবৃত কোন প্রাণহীন মূর্ত্তি কি তাহার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছে?

মেনকাই সর্ব্বপ্রথম পরাজয় স্বীকার করিল। তাহার মুখ দিয়াই প্রথম কথা বাহির হইল,—আপনি যে চুপ করেই রইলেন, হাত ধরতেও

আমার ভরসা হচ্ছে না, কি জানি যদি রাগ করেন · হাতখানা জোর করে আবার ছাড়িয়ে নেন !

পাতিরাম কহিল,—বললুম ত আমার গায়ে গন্ধ, আপনিই কষ্ট পাবেন।

—আপনি নিজেকে অত ছোট কেন ভাবছেন বলুন ত ? কে বলে আপনার কায ছোট ?

—আমি নিজেকে বরাবরই ছোট মনে করি।

—ওটা আপনার মনের কথা কখনই নয়। বাইরে দশ জনের সামনে আপনি নিজেকে ছোট ব'লে প্রচার করতে চান, কিন্তু মনে মনে আপনি নিজেকে সবার বড় বলেই ভাবেন। মানুষ আমরা চিনি আপনি বড়, এত বড় যে—আপনার মতন বড় মানুষ আমি আর দেখিনি বললেই হয়।

—সেই জন্যই বুঝি আমার হাতখানা ধরে জাহান্নমের পথে নামিয়ে নিয়ে যেতে অত ব্যস্ত হয়েছ ?

—জাহান্নমের পথে !

—তা নয় ত কি বলতে চাও ? যদি তুমি মনে মনে ভেবেই থাকে —মনে মনে আমি নিজেকে সবার বড় বলেই ভাবি, তাহলে আমি যে ছোট হতে পারি না—কিম্বা শত চেষ্টা করলেও তুমি আমাকে ছোট করতে পারবে না—একথা ভুলে যাচ্ছ কেন ?

—দেখুন, কোন মেয়ে কোন পুরুষের সঙ্গে যেচে কথা কইলে সেই পুরুষ মেয়েটির সম্বন্ধে অমনি একটা কদর্য্য ধারণা করে বসে। ভাবে মেয়েটা তাকে ফ্লার্ট করছে। আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমি এমন

কয়েকটা গুণের কথা জানতে পেরেছি, যাতে আপনার ওপর আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে। এই শ্রদ্ধাটুকু জানাবার চেষ্টা-টাকেই আপনি কি জাহান্নামের পথে আপনাকে নামিয়ে দেওয়া বলতে চান?

—তুমি এখনো রেখে ঢেকে কথা বলছো। আসল উদ্দেশ্যটি তোমার বলছ না বা বলতে সাহস করছ না।

—আপনি ঠিক ধরেছেন। দেখছি, আপনি মনের কথাও পড়তে পারেন। বেশ, তাহলে আসল কথাটাই বলি শুনুন।—আপনার মনের জোর দেখে আমি বুঝিছি—মানুষ চরিয়ে কায চালাতে আপনার যোড়া নেই। দেখুন, অনেক দিন থেকেই আমার সাধ যে, আপনার মত কোন শক্ত মানুষ একটা থিয়েটার খোলেন, আর আমরা তাঁকে আশ্রয় করে কাঁপিয়ে তুলি। বেশী নয়, লাখ খানেক টাকা হলেই একটা থিয়েটার খোলা যায়—

—কথাটা তোমার নয়—কৃত্তিবাসের, তা আমি বুঝিছি। যখনই তার নেমন্তন্নর কার্ড পেয়েছি, তখনই আমি ধরে নিয়েছিলুম যে, আমাকে আবার ঘাল করবার জন্য সে একটা ফাঁদ পাতবার মতলব করেছে। কিন্তু নেড়া দুবার বেলতলায় যায় না।

মেনকা এবার স্তব্ধ হইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল। এই অদ্ভুত লোকটির মুখের পানে তাকাইতেও যেন সে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল।

পাতিরাম বক্রদৃষ্টিতে মেনকার দিকে চাহিয়া কণ্ঠে একটু জোর দিয়া কহিল,—আমার মনে এতটা জোর কে দিয়েছে শুনবে? আমার মা! আঠারো বছর বয়সে মাছের ব্যাপারে আমাকে তোমাদেরই মত কতকগুলো মেয়ের সংস্রবে যেতে হয়। পাড়ার লোক তখন আমার মাকে

বলেছিল—তোমার ছেলে পত্না পা পিছলে পড়লো ব'লে! কথাটা শুনে মা আমার জোর গলায় জবাব দেন—কখ্খনো নয়—তা হতে পারে না আমি তার মা, মাথায় মাছের ঝুড়ি নিয়ে দোর দোর ঘুরে যে পয়সা পয়দা করি—পতা তা ওড়াতে পারে না, পতা আমার মানুষ হবে—বা হবে—মায়ের দুঃখ ঘোচাবে।—কথাগুলো যেই আমার কানে উঠলো—আমি অমনি সেগুলো আমার বুকের ভেতর দেগে নিলুম, সার। জীবনে তা মুছবে না। তুমি ত থিয়েটারের একটা অর্ডিনারী য়্যাকট্রেস, স্বর্গে কোন অপ্সরী নেমে এলেও সে দাগ মুছাতে পারবে না—এ মন টলবে না,—বুঝেছ ?

সর্পদষ্টের মত শিহরিয়া উঠিয়া মেনকা পাতিরামের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল—তাহা অপূর্ব। কোন প্রকার আকর্ষণ বা আবিলতার চিহ্নও তাহাতে নাই।

পাতিরাম কহিল,—কাল একটি মেয়ের সঙ্গে আমার হঠাৎ পরিচয় হয়ে যায়। বয়সে সে তোমার চেয়েও ছোট হবে, বাইরের রূপের দিক দিয়েও সে তোমার অনেক নীচে। কিন্তু তার দৃষ্টি এত বড়—বাঙ্গলা দেশের জন্যে তার এত দরদ—যার পরিচয় পেয়ে আমি শুদ্ধ হয়ে যাই। লোকে আমাকে ঝানু ব্যবসায়ী বলে, কিন্তু ষোল বছরের সেই মেয়েটির কাছ থেকে আমারও শিক্ষা করবার যথেষ্ট আছে। আর, আজ তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি জানতে পারছি—যে জুয়াচোর বারবার আমাকে ঠকিয়েছে—সে আমাকে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে তোমার মত একটা মেয়েকে লিলিয়ে দিয়ে আমাকে জাহান্নামের পথে ঠেলে দেবার ফাঁদ পেতেছে। এতে তার ওপর আমার যত না রাগ হচ্ছে, তোমার অবস্থা

ভেবে তার চেয়েও বেশী কষ্ট হচ্ছে। আর, এ সম্বন্ধে আমার একটা ভবিষ্যদ্বাণী তুমি লিখে রাখতে পারো—এই লোকের সংস্রব তুমি যদি ছাড়তে না পারো—তোমারো দুর্গতির এক শেষ হবে।

মেনকা এবার ধীরে ধীরে উঠিয়া পাতিরামের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর কাপড়ের অঞ্চলটি গলায় দিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া গাঢ়স্বরে কহিল,—তাহলে তুমিই আমাকে মুক্তির রাস্তা দেখিয়ে দাও বাবা! এই পাষণ্ডের পাল্লায় পড়ে সত্যিই আমি মরণের পথে ছুটিছি, তুমি আমাকে বাঁচাও।

পাতিরাম কহিল,—বেশ, তাহলে আজ থেকে তুমি আমার মা হ'লে, আমি তোমার ছেলে। মায়ে ছেলে মিলে দুজনেই মুক্তির পথ খুঁজে নেব—ভয় কি!

## ১৭

শ্রীবাস পাতিরামের আফিসে কেরাণীর কাযে নিযুক্ত হইয়াছে। ইংরাজী চিঠিপত্রগুলি তাহাকে মুসবিদা করিতে হয়। চিঠির বয়ান অবশ্য পাতিরাম বাতলাইয়া দেয়। ইহাছাড়া শ্রীবাসকে আর একটি কায করিতে হয়। ঠিক তিনটা বাজিলেই পাতিরামের খাস কামরায়, তাহার ডাক পড়ে। কাগজ পত্র টেবিলের ভিতর রাখিয়া তখনই তাহাকে কর্ত্তার ঘরে ছুটিতে হয়। কর্ত্তা তখন তাহাকে কাছে বসাইয়া

ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া যে সব পরামর্শ বা নির্দেশ দেন—আফিসে সহিত আহার কোন সম্বন্ধই নাই। আলোচনাসূত্রে শ্রীবাস বুঝিল যে তাহার প্রভু সব্বজ্ঞের মত তাহার আত্মীয়বর্গের সম্বন্ধেও এত খবর রাখেন সে স্বয়ং যাহাদের বিষয়ে অজ্ঞ বলিলেই হয়।

প্রথম প্রথম শ্রীবাস ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না, পরচর্চা তাহার প্রভুর এত অনুরাগ কেন এবং তাহাতে তাহার কি লাভ? কি একদা তাহার প্রভুই কথাটা প্রকাশ করিয়া তাহার সকল সংশয়ে অবসান করিয়া দিল।

শ্রীবাসকে লক্ষ্য করিয়া পাতিরাম একদা প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা শ্রীবা বলতে পারো তুমি জিনিয়াস আর ইনটেলিজেন্টে কি তফাৎ?

শ্রীবাস উত্তর দিল,—আজ্ঞে, কলেজে একবার এসম্বন্ধে আলোচন হয়েছিল। আমাদের এক প্রফেসর বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে—জিনিয়াস তারে কাটে। সে যখন যায়—তার রাস্তা সবাই তৈরী করে দেয়, কোথাও তাকে হোঁচট খেতে হয় না, কেউ তাকে বাধা দেয় না, সবাই তাকে মানে কিন্তু ইন্টেলিজেন্টকে ধারে কাটতে হয়। সদাসর্ব্বদাই তার চিন্তাশক্তিতে সান দিতে হয়, রাস্তা তাকে তৈরী করে নিতে হয়, অবস্থা বুঝে তাকে চলতে হয়। তাকে সবাই বাধা দেয়, কিন্তু সেই বাধা বুদ্ধি খেলিয়ে তাকে কাটাতে হয়।

পাতিরাম কহিল,—ঠিক। দেখ, পৃথিবীতে জিনিয়াস খুব কম দেখা যায়; এত কম যে, আঙ্গুলের পর্ব্বগুলোও পুরে না। কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট এর তুলনায় অনেক বেশী। এই ইন্টেলিজেন্টের দলই বাহাদুর, এরাই পৃথিবীর বুকে বসে রাজত্ব করছে। কাজেই, আমরা যখন জিনিয়াস

নই, জিনিয়াস হবার মত কোনও যোগ্যতাও আমাদের নেই, তখন আমরা চেষ্টা করলে অন্ততঃ ইন্টেলিজেন্টও হ'তে পারি। তাই বলছিলুম—তোমার চিন্তাটাকে আরও সাফ করতে হবে, আর বুদ্ধি শক্তিটা সানে চড়িয়ে ধারালো করে নিতে হবে।

শ্রীবাস সবিনয়ে কহিল,—আপনি শুধু আমার অন্নদাতা প্রভু নন, আপনি আমার গুরু। আপনি যা বলবেন, তাই আমার শিরোধার্য্য।

পাতিরাম গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল,—গিরিশ ঘোষের প্রফুল্ল নাটকের অভিনয় তুমি দেখেছ শ্রীবাস?

শ্রীবাস কহিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখিছি।

—মুলুক চাঁদ ধুধুরিয়ার পার্ট তোমার মনে পড়ে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, চমৎকার। আমি যেবার প্রফুল্ল দেখি, অমরদত্ত ঐ পার্টে নেমেছিলেন। এখনো যেন সে চেহারা চোখের ওপর ভাসছে!

—ব্যাস্! আমার কথা তাহলে হয়ে গেছে।

শ্রীবাস সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পাতিরামের মুখের দিকে চাহিল মাত্র, কোন উত্তর তাহার কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল না।

পাতিরাম একটু হাসিয়া কহিল,—ইন্টেলিজেন্ট হতে হলে সব বিষয়েই কিছু কিছু জ্ঞান থাকা চাই। বিশেষ ক'রে, অভিনয়ের ব্যাপারটা।

শুষ্ককণ্ঠে শ্রীবাস কহিল,—কিন্তু আমি ত কোন দিন ষ্টেজে নেমে অভিনয় করিনি স্যার! এ বিষয়ে আমি একবারে আনাড়ী।

পাতিরাম কহিল,—অভিনয়ের ছাপ যখন তোমার মনের ওপর পড়েছে, অভিনয় করতে তোমাকে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তার তালিম আমি তোমাকে দেব। তবে তুমি বুদ্ধিমান, বুঝতেই ত

পারছ—অভিনয়টা আসলে কিছু নয়—ঝুটো। কিন্তু এতে লোক মুগ্ধ হয়ে যায়। তোমাকেও এমনই একটা ঝুটো ব্যাপারকে আসল ব'লে চালাতে হবে। পারবে ত ?

শ্রীবাস কহিল,—বলুন, কি করতে হবে ?

পাতিরাম গম্ভীরভাবে কহিল,—তোমার মামা সৃষ্টিধর দাসের সঙ্গে মুলাকাৎ করতে হবে।

দুই হাত যোড় করিয়া শ্রীবাস কহিল,—ঐ আজ্ঞাটি আমাকে করবেন না স্যার! আমি আর সব পারবো, কিন্তু তাঁর বাড়ীর দেউড়ীতে মাথা গলাতে পারবো না। সেখানে গেলেই আমার বাবার চরম লাঞ্ছনা—দারুণ অভাবের মধ্যে তাঁর মৃত্যুশীর্ণ মুখখানা আমার চোখের ওপর ভেসে উঠবে।

পাতিরাম দৃঢ়স্বরে কহিল,—তোমার বাবার ওপর তাঁর ঐ সব অবহেলার প্রতিশোধ নিতেই তোমাকে যেতে হবে।

শ্রীবাস নিষ্প্রভদৃষ্টিতে পাতিরামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার দুই দুই চক্ষু ক্রমশঃ বাষ্পাচ্ছন্ন হইতেছিল।

পাতিরাম কহিল,—শোন শ্রীবাস, তোমার ভালোর জন্যই আমি তোমাকে সৃষ্টিধরের কাছে পাঠাচ্ছি। কিন্তু এও স্থির যে, তুমি আমার আফিসের একজন কেরাণী হয়ে সেখানে যাবে না। তুমি আইরিস লটারীতে সাত লাখ টাকা পেয়ে আমার ফারমের অংশীদার হয়েছ, বড় বড় ফারমে ক্যাপিট্যাল জোগাচ্ছ, জমিদারী কেনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ—এই হবে তোমার বর্ত্তমানের পরিচয়। তোমার থাকবার বাড়ী, জুড়ী গাড়ী, চাপরাসী, দরোয়ান, ঝি, চাকর—এসবের বন্দোবস্তও

আমি করে রেখেছি। কাল থেকে এ ব্যাপারের রিহার্সেল সুরু হবে। তিনটে থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত দুটি ঘণ্টা তোমাকে এর তালিম আমি দেব।

কি, আমার আফিসের লোকজনরাও দু'চারদিনের ভেতরেই জানবে যে কথাটা সত্যি, তুমি আমার আফিসের পার্টনার, তুমি মিলিওনিয়ার।

পাতিরামের যে কথা, সেই কায। এই পরামর্শের পর এক সপ্তাহের মধ্যেই আফিস শুদ্ধ সকলেই স্তব্ধ হইয়া শুনিল যে, শ্রীবাস রাতারাতি বড় লোক হইয়া গিয়াছে। সে প্রকাণ্ড বাড়ী কিনিয়াছে, বাড়ীতে লোকজন গিস্‌গিস্ করিতেছে, পাতিরামের বিশাল কারবারের সে এখন অংশীদার। প্রকাণ্ড জুড়ী চড়িয়া আসে, কর্ত্তার ঘরে বসে ও জুড়ী চড়িয়া বাড়ী যায়।

একদা শ্রীবাসের জুড়ী সৃষ্টিধরের বাড়ীর দেউড়ীতে লাগিল। সৃষ্টিধর তখন বাহিরের ঘরে বসিয়াছিল। দেউড়ীর সম্মুখে জুড়ী থামিতেই সে ফরাসের উপর সোজা হইয়া বসিয়া জানালার ফাঁক দিয়া তাকাইয়া দেখিল পাটকিলে রঙের এক জোড়া অতিকায় ওয়েলারবাহিত অতিশয় সুশ্রী গাড়ী। কোচোয়ান ও সহিসের সাজ সজ্জা এবং তকমা জুড়ীর মতই জমকালো। সৃষ্টিধর গড়গড়ার নল টানিতে টানিতে ভাবিতেছিল,—তাইত কে এল!

কিন্তু অনতিবিলম্বে যে লোক আসিল, তাহার আসিবার ভঙ্গী ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য এক নিমিষে তাহাকে চমৎকৃত করিয়া দিল। তাড়াতাড়ি সে এই অভিজাত অভ্যাগতের সম্বর্দ্ধনার জন্য উঠিতেছিল, কিন্তু শ্রীবাস অত্যাধিক তৎপরতার সহিত সৃষ্টিধরের পদতলে শির নত করিয়া কহিল,—মামা আমি শ্রীবাস; পায়ের ধুলো দিন।

শ্রীবাস! নাম অবশ্যই পরিচিত। ভগিনীপতি চিনিবাস পরিত্যক্ত হইলেও, তাহার প্রিয়দর্শন পুত্র শ্রীবাস শৈশবাবস্থায় তাহার কোলে পীঠে উঠিয়া সে কালের স্মৃতি আজও টানিয়া রাখিয়াছে। শ্রীবাস যখন দশ বৎসর বয়স্ক বালক, সেই সময় সৃষ্টিধরের ভগিনী বিয়োগ হয়। শ্রীবাসের পিতা জাতিগত ব্যবসায় পরিত্যাগ না করায় সৃষ্টিধর কোনদিনই তাহার উপর প্রসন্ন ছিল না। তথাপি, ভগিনী বিদ্যমানে উভয় পরিবারের মধ্যে যে সম্বন্ধটুকু ছিল, কন্যার বিয়োগের পর তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। আজ সেই শ্রীবাস তাহার সম্মুখে উপস্থিত।

সৃষ্টিধরের স্নেহসিন্ধু যেন উথলিয়া উঠিল। দুই হাতে শ্রীবাসকে টানিয়া কোলের কাছে বসাইল, ভাব গদগদ স্বরে কহিল,—এত বড় হয়েছিস রে তুই, কিন্তু মামাকে একবারে ভুলে ছিলি ত?

শ্রীবাস কহিল,—ভুলে গেলে কি আসতে পারতুম মামা? মন তোমার কাছেই পড়ে থাকতো, তবে বড়লোক মামার কাছে আসবার মত সৌভাগ্য পাইনি এতদিন, তাই আসতেও পারিনি।

সৃষ্টিধর কহিল,—সৌভাগ্য এবার এসেছে না? তোকে দেখেই বুঝিছি। মধ্যে কে যেন খবর দিয়েছিল—লটারীর টাকা পেয়ে শ্রীবাস বড় লোক হয়েছে। আমি তখন বিশ্বাস করি নি। এখন দেখছি—খবরটা সত্যি। কত টাকা পেয়েছিস শুনি?

শ্রীবাস কহিল,—পুরো সাত লাখ পাবার কথা, তার ভেতর থেকে হাজার ত্রিশ দিতে থুতে গেছে।

সৃষ্টিধর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শ্রীবাসের দিকে চাহিয়া কহিল,—টাকাটার গতি কি করলে?

শ্রীবাস কহিল,—বাড়ী কতকগুলো কিনিছি, কয়েকটা প্রফিটেবল
ারবারের অংশীদার হয়েছি। এ ছাড়া দু একটা ভালো তালুক কেনবার
সনা আছে। সেই পরামর্শ নিতেই আপনার কাছে আসা।

সৃষ্টিধর কহিল,—খাসা আইডিয়া। দেখে শুনে ভালো তালুক
নাই বুদ্ধিমানের কায। আমি তেমাকে এর সব সুড়ুক সন্ধান দেব।
ে তুমি তাড়াতাড়ি যেন কিছু ক'রে ফেলো না, র'য়ে বসে এসব কায
তে হয়।

সৃষ্টিধরের নির্দ্দেশে অন্তঃপুরে শ্রীবাসের ডাক পড়িল। বৃদ্ধ তাহাকে
্গ করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। শ্রীবাস আজ লক্ষপতি, বড় লোক;
্ তাহার আদর আপ্যায়নের অন্ত নাই!

## ১৮

এদিকে মেনকা-মঞ্জিলেও পাতিরামের নির্দ্দেশে রীতিমত অভিনয়
তেছিল। মেনকা পাকা অভিনেত্রী হইলেও তাহাকে পাতিরাম
াপযোগী তালিম দিতেছিল। কৃত্তিবাস মেনকার মুখে শুনিল যে,
তরামকে সে ফাঁদে ফেলিয়াছে; মেনকার রূপ দেখিয়া, আর বাছা
খান কতক গান শুনিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে; থিয়েটারের
পাড়িতেই সে সানন্দে সায় দিয়াছে। এ সংবাদে কৃত্তিবাসের আনন্দ
ধরে না। মেনকা-মঞ্জিলে পাতিরামের আনাগোনায় যাহাতে

কোনরূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হয়, সেজন্য সে নানাবিধ উপায় অনুষ্ঠান করিতে লাগিল।

যেখানে স্বার্থ-সংস্পৃষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান, সেইখানেই পাতিরামের চর এমন সতর্কতায় গতায়াত করে, কাহারও সাধ্য নেই যে, কোনও প্রকারে তাহাতে পাতিরামের সংস্রব সম্বন্ধে কোনরূপ আভাস পায়। পাতিরাম এখন প্রায়ই মেনকা-মঞ্জিলে আসে ও ঘণ্টা ব্যাপিয়া মেনকার সহিত তাহার পরামর্শ চলে। পাতিরাম চলিয়া গেলেই কৃত্তিবাস আসিয়া থিয়েটারের ব্যাপার কতদূর অগ্রসর হইল তাহার হিসাব লয়। মেনকা সুকৌশলে পরিকল্পিত নাট্যশালার ফিরিস্তি তাহাকে শুনাইয়া দিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

একদিন কথায় কথায় মেনকা কৃত্তিবাসকে জিজ্ঞাসা করিল,—হাটখোলার হাতীবাবুদের বাড়ীতে তোমার নাকি বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে?

প্রশ্নটা শুনিয়াই কৃত্তিবাস যেন আকাশ হইতে পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—খবরটা কোথা থেকে পেলে?

মেনকা কহিল—নাথের বাগানে আমার এক সই থাকে, তার কাছেই খবরটা পেয়েছি। কথাটা কি বাজে?

কৃত্তিবাস কহিল,—যা রটে তা বটে। বাজে কি করে বলি? তবে তোমার তাতে দুঃখ কি বল?

মেনকা কহিল,—বালাই, দুঃখ হবে কেন, এতো আনন্দের কথা গো! অত বড় লোকের বাড়ীতে তোমার যদি বিয়ে হয়, তোমার বরাত যেমন ফিরে যাবে, আমার বাক্সেও কোন্ দু পাঁচ হাজার না উঠবে!

কৃত্তিবাস উল্লাসে মেনকার কোমল গণ্ডে একটা টোকা দিয়ে কহি

ব্রাভো, এই জন্যই ত তোমাকে এত পেয়ার করি! খবরটা পেয়েই তুমি যে প্যান প্যানানির বদলে পাওনার কথা বললে, এতে আমি ভারি খুসী হয়েছি।

মেনকা কহিল,—তুমি যেমন খুসী হয়েছে, আমাকেও তেমনি তোমার খুসী করা উচিত।

স্থিরদৃষ্টিতে মেনকার দিকে চাহিয়া কৃত্তিবাস জিজ্ঞাসা করিল,—তোমাকে খুসী করবার জন্য কোন দিকেই আমি দৃকপাত করিনি। তবে একথা বলবার মানে?

মেনকা মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া কহিল,—মানে এই যে, এতদিন এক তরফাই তোমাকে পেয়েছি; এবার ভাগিদার আসছে। কাযেই আখের ভেবে আমাকেও নিজের কোলে ঝোল টানতে হচ্ছে। তবে ভয় নেই, আমাকে খুসী করতে কোন গঙ্গামণ্ডল তালুক তোমাকে লিখে দিতে হবে না।

কৃত্তিবাস কহিল,—কি দিতে হবে, তুমি কি চাও, সেইটিই কেন খুলে বল না?

মেনকা কহিল,—আমি একনিষ্ঠ হয়ে তোমার কাছে আছি বলে তুমি যে এই বাগান বাড়ী আমাকে ভাড়া করে দিয়েছ, আর খোর-পোষের জন্য মাসে আশীটি ক'রে টাকা দিচ্ছ—এটা আমি কতকাল পাব?

কৃত্তিবাস কহিল,—কেন, বরাবর পাবে—যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে।

কণ্ঠেরস্বর একটু মৃদু ও কোমল করিয়া মেনকা জিজ্ঞাসা করিল,—ধর, কালে যদি আমার রূপে ভাঁটা পড়ে আর বয়স বাড়ে—তবুও পাব?

কৃত্তিবাস কণ্ঠের স্বরে জোর দিয়া উত্তর দিল,—নিশ্চয়।

মেনকা এবার সহজকণ্ঠে কহিল,—বেশ, তাহলে এই কথাটা তুমি আমাকে একখানা কাগজে এখনি লিখে দাও।

কৃত্তিবাসের মুখখানা এক মুহূর্ত্তে ছায়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে কহিল,—হঠাৎ আমার ওপর তোমার এই সন্দেহের কারণ? লেখাপড়ার কথা ত কোন দিন হয়নি?

মেনকা কহিল,—তুমি যে বিয়ে করবে এ কথা ত তখন ভাবিনি. তাই তখন লেখাপড়ারও প্রয়োজন হয়নি।

কৃত্তিবাস রুক্ষস্বরে কহিল,—লেখাপড়া হয়নি ব'লে আমি কি এ পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে কোন রকম অসদ্ব্যবহার করেছি? যা বলেছি, তার নড়চড় হয়েছে কোন দিন?

মেনকা কহিল,—এর পর ত হতে পারে। যাতে না হয়, সেইজন্যই আমাকে সাবধান হতে হচ্ছে। তোমার কথার ওপর তোমার যদি বিশ্বাস থাকে, লেখাপড়া করতে কি দোষ?

কৃত্তিবাস এবার বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—লেখাপড়া আমি কিছুতেই করব না।

মেনকা কহিল,—লেখাপড়া তোমাকে করতেই হবে। না করে কিছুতেই রেহাই পাবে না।

কৃত্তিবাস এবার তর্জ্জনের সুরে কহিল,—কি! আমাকে চোখ রাঙিয়ে কথা? বুঝিছি—পাতিরামের পাল্লায় পড়ে মাথা তোর বিগড়ে গেছে। লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছিস্—তাকে নিয়ে থিয়েটারে মাতবি—আর আমাকে দেখাবি রম্ভা! কিন্তু তা হবে না, আমিও কৃত্তিবাস কোলে, দরকার বুঝলে তোকে খুন করতেও পেছপাও হব না।

মেনকাও উচ্চকণ্ঠে কহিল,—মুখ সামলে কথা বলো, যা তা বলে আমাকে অপমান ক'র না বলছি ; ভাল হবে না।

মেনকার কথাগুলি এবার কৃত্তিবাস বরদাস্ত করিতে পারিল না, হুঙ্কার দিয়া মেনকার উপর লাফাইয়া পড়িল, দুই হাতে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—হারামজাদী—কসবী! আমি তোকে খুন না করে ছাড়বো না—

কিন্তু তৎক্ষণাৎ পিছন হইতে দুইটি সবল হাতের বেষ্টনী সাঁড়াশীর মত কৃত্তিবাসের গলাখানি এমন জোরে চাপিয়া ধরিল যে, তাহার হাতের বন্ধন শিথিল হইয়া গেল এবং মেনকা নিষ্কৃতি পাইয়া বারান্দার দিকে ছুটিয়া গিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল,—পুলিস, পুলিস।

যে লোক পিছন হইতে কৃত্তিবাসের গলা চাপিয়া ধরিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি হাত দুখানি ছাড়াইয়া লইয়া কহিল,—কোন দরকার নেই মা পুলিস ডাকবার, পুলিস ত আমরাই। আপনিই দাঁড়িয়ে হুকুম দিন —ঘা কতক রড্ডা দিয়ে বাছাধনকে বিদেয় দিই। আপনি ভেতরে আসুন, ভয় নেই।

গুণ্ডাকৃতি যোয়ানটির শক্তির পরিচয় পাইয়া কৃত্তিবাসের ক্রোধ জল হইয়া গিয়াছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটির পানে চাহিয়া কহিল,—তুই কে? কার হুকুমে এখানে এসেছিস্?

উত্তর আসিল,—উনি আমার মা, আমি ওনার চাকর। এর বেশী জবাব পাবে না, জিজ্ঞাসাও ক'র না। তবে বলে রাখছি, ফের বেলেল্লাগিরি করেছ কি—মরেছ! এমন টিপুনী গলায় দেব যে নলীটা মুট করে ভেঙ্গে যাবে।

কৃত্তিবাস আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

এমনই একটা দুর্ঘটনার অনুমান করিয়াই পাত্তিরাম মেনকাকে কৃত্তিবাসের নির্ব্বাচিত দরোয়ানকে বিদায় দিবার পরামর্শ দিয়াছিল তদনুসারে মেনকার কৌশলে পুরাতন দরোয়ান পদচ্যুত হয় ও তাহার স্থলে এই লোকটি চাকুরী পায়। দমদমা অঞ্চলে পাত্তিরামের পুষ্করিণীর সংখ্যা অল্প নহে। বাগ্দী জাতীয় অনেকগুলি বলিষ্ঠ যুবা পুকুরগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। পাত্তিরাম তাহাদের ভিতর হইতেই বাছিয়া বাছিয়া এই বলবান লোকটিকে মেনকার রক্ষার্থে নিয়োজিত করিয়াছিল

## ১৯

মেনকার সহিত কৃত্তিবাসের ঘনিষ্ঠতার কথা তাহার মাতুল সৃষ্টিধরের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিল। ইদানীং সৃষ্টিধর কৃত্তিবাসের হাতেই তাহার জমিদারী ও টাকাকড়ির ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কৃত্তিবাস মামাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, জমিদারী বা কারবার থাকলেই দেনা হয়; কিন্তু তার জন্য ভাবনা কি? সম্বৎসরের ভেতরেই দেনা আমি শোধ করে ফেলবো।

সৃষ্টিধর কিন্তু কৃত্তিবাসকে ভাল করিয়াই চিনিত। সেইজন্য সে দেনা পরিশোধের জন্য কৃত্তিবাসের কথার উপর নির্ভর না করিয়া, কৃত্তিবাসকে অবলম্বন করিয়া একটা মোটা রকমের দাঁও মারিবার ফিকিরে ঘুরিতে ছিল। ঘটনাচক্রে তাহা সার্থক হইবার সম্ভাবনা সূচিত হইল।

হিজলীর হাতীবাবুরা ইহাদের পালটি ঘর। হাটখোলা অঞ্চলে ইহাদের প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড বাড়ী, ফেলাও কারবার, বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জিলায় ও পরগণায় ইহাদের বহু জমিদারী। সৃষ্টিধর সংবাদ পাইয়াছিল যে, এই বংশের এক কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে ও তাহার বিবাহের সম্বন্ধ চলিয়াছে। বিবাহের যৌতুকে তাহারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করিবে এবং জামাতাকে নাকি একখানি তালুক লিখিয়া দিবে। সংবাদ পাইয়াই সৃষ্টিধর ভাগিনেয় কৃত্তিবাসের জন্য এ সম্বন্ধে যত কিছু তদ্বির সম্ভব কিছুরই ত্রুটি করে নাই। তাহার ফলে হাতীবাবুদের কন্যার সহিত কৃত্তিবাসের বিবাহের কথা পাকা হইয়া গেল।

কথাটা পাতিরামের কানেও গেল, সে স্তব্ধ হইয়া একদা শুনিল যে, এ বিবাহে কৃত্তিবাস হাতীবাবুদের নিকিড়ি পাড়ার এষ্টেটটি যৌতুক স্বরূপ স্বতন্ত্রভাবেই পাইবে।

তীরের মত এ সংবাদ যেন পাতিরামের বুকে বিঁধিল। নিকিরি পাড়ার সম্পত্তি—তাহার বহু বাঞ্ছিত নিকিরি পাড়া—যাহার জন্য সে অতিকষ্টে উপার্জ্জিত লক্ষাধিক টাকা কৃত্তিবাস সৃষ্টিধরের হাতে তুলিয়া দিয়াছে এবং তাহারা সেই টাকা অম্লানবদনে আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে বেকুব সাব্যস্ত করিয়া বসিয়া আছে, সেই নিকিরি পাড়ার মালিক হইয়া বসিবে পরম অধর্ম্মাচারী পরস্বাপহারী প্রতারক কৃত্তিবাস কোলে? না—এ অসম্ভব, ইহা হইতে পারে না; যেমন করিয়া হউক—এ কার্য্যে বাধা দিতে হইবে। নিকিরি পাড়া তাহার চাইই,—ইহার জন্য সর্ব্বস্ব পণেও তাহার দ্বিধা নাই।

কথাবার্ত্তা সব পাকা হইয়া গিয়াছে, বিবাহের দিনও নির্দ্ধারিত

হইয়াছে ; চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে ; উভয়পক্ষই যখন উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় পাত্র সম্বন্ধে এক অপ্রীতিকর ও অতিশয় কেলেঙ্কারীর কথা সংবাদপত্রসমূহে প্রচারিত হইয়া সকলকে চমকিত করিয়া দিল।

প্রচারিত সংবাদটির মর্ম্ম এইরূপ —

মেনকা বাঈ নাম্নী এক অভিনেত্রীর সহিত বাবু স্বষ্টিধর দাসের ভাগিনের কৃত্তিবাস কোলের বহুদিন ধরিয়াই ঘনিষ্ঠতা চলিয়া আসিতেছিল। মেনকা তরুণী, রূপবতী ও নৃত্য গীত পটিয়সী বিধায় তাহার প্রতি কলিকাতা সহরের বহু ধনী যুবার লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছিল। কিন্তু কৃত্তিবাস মেনকার সহিত রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে দমদমায় স্বতন্ত্র একখানি বাড়ীতে লইয়া গিয়া রাখে ও স্বামি-স্ত্রীর ন্যায় সদ্ভাবে বাস করিতে থাকে। উভয়ের মধ্যে সর্ত্ত থাকে যে, মেনকা অপর কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিবে না এবং কৃত্তিবাস মেনকাকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন ও ভরণপোষণ করিতে বাধ্য থাকিবে।" কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতার কোন বিশিষ্ট ধনীগৃহে কৃত্তিবাসের বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হওয়ায়, কৃত্তিবাস মেনকার প্রতি নিরতিশয় দুর্ব্ব্যবহার করিতে থাকে। পাছে মেনকার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতার কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় সে মেনকাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হয়। একদা সুযোগ বুঝিয়া দমদমায় জনহীন এক উদ্যান ভবনে সে হত্যার অভিপ্রায়ে মেনকার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরে। কিন্তু কোনক্রমে মেনকাবাঈ আর্ত্তনাদ করিবার সুযোগ পায় এবং তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া সন্নিহিত পুষ্করিণীর কতিপয় রক্ষক অকুস্থলে ছুটিয়া আসে ও

তাহাকে রক্ষা করে! কৃত্তিবাস অতঃপর পলাইয়া যায়। মেনকা এখন আলিপুরের পুলিশ কোর্টে আসামীর বিরুদ্ধে উপর্যুক্ত অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর বিরুদ্ধে সমন জারী করিয়াছেন।

পুলিস কোর্টে কৃত্তিবাস কোলের বিরুদ্ধে মেনকা যে অভিযোগ দায়ের করে, তাহারই মোটামুটি মর্ম্ম সংবাদ পত্র এই ভাবে প্রকাশিত হয় এবং সংবাদপত্রের ছাপা ফাইল ও মামলার তারিখ প্রভৃতিও কে বা কাহারা এমন কৌশলে সৃষ্টিধর দাস ও হাতীবাবুদের সেরেস্তায় বিতরণ করিয়া দেয় যে, সংবাদপত্র পড়িবার কোনরূপ সুযোগ যাহাদের পক্ষে কোনদিন সম্ভব পর ছিল না, তাহারাও এই কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাটির রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয় নাই।

ইতিমধ্যে শ্রীবাসের সহিত সৃষ্টিধরের সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠতা হয় এবং সৃষ্টিধর শ্রীবাসের ঐশ্বর্য্য ও গুণের পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু তখন কৃত্তিবাসের সহিত হাতীবাবুদের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। তথাপি কৃত্তিবাসের মনের কোণে স্বভাবতঃই এমন চিন্তারও সঞ্চার হইয়াছিল যে,—পাত্র হিসাবে শ্রীবাস কৃত্তিবাসের অনেক উপরে।

রূপ, গুণ, বিদ্যা—সব দিক দিয়াই সে শ্রেষ্ঠ। কৃত্তিবাস ইহার তুলনায় কত নিকৃষ্ট! কন্যাপক্ষ শ্রীবাসের পরিচয় পাইলে সাধিয়া তাহাকে নির্ব্বাচিত করিত, সৃষ্টিধরকে তজ্জন্য তদ্বির করিতে হইত না। কিন্তু আর উপায় নাই, কথা পাকা হইয়া গিয়াছে!—দুর্ভাগ্য শ্রীবাস! যদি সে আরও কিছু পূর্ব্বে আসিত!

খবরের কাগজের বিবরণটি পড়িয়া সৃষ্টিধর গুম হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহাকে লইয়া ঘরখানা বুঝি বন্‌বন্‌ করিয়া ঘুরিতেছে। একটু সামলাইয়াই চাকরকে ডাকিয়া কহিল,—কৃত্তিবাসকে ডেকে আন্‌ শীগগীর।

একটু পরেই কৃত্তিবাস মাতুলের নিভৃত ঘরে প্রবেশ করিয়া ফরাসের একধারে বসিল। আড় নয়নে তাহার পানে চাহিয়া সৃষ্টিধর খবরের কাগজখানা আগাইয়া দিল।

কৃত্তিবাস বুঝিল, আদালতে যে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছে, তাহার ভিতরের কদর্য্য পদার্থ-টুকু সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে মনে মনে নিজেকে শক্ত করিয়া কহিল,—ও আমি দেখিছি, সব বাজে; কতকগুলো পাজীলোকের ফেরেবাজি।

দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রখর করিয়া কৃত্তিবাসের মুখের উপর ফেলিয়া সৃষ্টিধর কহিল,—কোনটা বাজে? তোমার কথা, না কাগজের এই ছাপাটা?

—আপনি যেটা পড়েছেন, আর আমাকে পড়তে দিচ্ছেন—ঐ খবরটা।

—আদালতে নালিস হয়েছে, কাগজে বেরিয়েছে, পরশু মামলার দিন পড়েছে—এগুলো সবই বাজে? এ রকম বাজে খবর কাগজওলারা ছাপতে পারে?

—তারা ছাপবে না কেন? কেউ যদি আজই আপনার নামে যা তা একটা মিথ্যে কিছু বানিয়ে আদালতে নালিস জুড়ে দেয়—সে নালিসের ব্যাপারটা কাগজওলারা ত ছাপবেই।

—আমার নামেই বা কেউ—যা তা ব'লে নালিস জুড়ে দেবে কেন? এই এত বয়স হ'ল, কত লেন দেন কাণ্ডকারখানাই ত করা গেল, কিন্তু কই—যা তা বলে মিছিমিছি নালিস ত কেউ কোনদিন করে নি। তোমার নামেই বা করবে কেন?

—আমার পেছনে কতকগুলো পাজীলোক লেগেছে তাই। ও বাড়ীতে আমার বিয়ে হয়, এটা তাদের সহ্য হচ্ছে না, তাই একটা চক্রান্ত ক'রে বিয়েটা ভেঙ্গে দেবার জন্য এই মিছে মামলা সাজিয়েছে। কিন্তু আমি এদের দফারফা করে তবে ছাড়বো তা বলে রাখছি।

ধমক দিয়া এবার সৃষ্টিধর বলিল,—থামো, ও সব বাহাদুরী পরে ক'রো, এখন আমি যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও। এই মেনকা বাঈটা কে?

কৃত্তিবাস কহিল,—আমি কি ক'রে জানবো? বললুম না—মিছিমিছি একটা মামলা সাজিয়েছে।

—আদালতের সমন তুমি পেয়েছ?

—হাঁ। রাস্তার মোড়ে পেয়দার সঙ্গে দেখা। সমন পড়েই আমি অবাক! পুলিস কোর্টের সমন, কি করি—সই দিয়ে নিতে হয়েছে। কিন্তু আসলে এ সব মিছে।

সৃষ্টিধর গম্ভীর মুখে কহিল,—কিন্তু তোমার নামে নালিস যখন হয়েছে, কেস উঠেছে, তুমি মিছে বললে লোকে তা বিশ্বাস করবে কেন? হ্যাঁ, তবে যদি বেকসুর খালাস পাও, সে কথা আলাদা। কিন্তু এই নিয়ে কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত হবে, কথাটা চাপা থাকবে না। হাতীবাবুরা এ সব ব্যাপারে ভারি শক্ত। তাদের কানে যদি এ খবর

ওঠে, ওরা কখনই তোমাকে মেয়ে দেবে না; সম্বন্ধ পাকা হলে কি হবে—তখনি ভেঙ্গে দেবে।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কৃত্তিবাস কহিল,—আমার বরাত।

কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কথা নাই। কৃত্তিবাস উঠি-উঠি করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ মুখখানা শক্ত করিয়া সৃষ্টিধর কহিল,—ওঠবার ঃ উস্‌খুস্ করছ যে?

কৃত্তিবাস কহিল,—কোর্টের দিকেই যাব মনে করছি। কেসটার ত তদ্বির করতে হবে।

সৃষ্টিধর কহিল,—কেস যখন মিছে, কোর্টে গিয়ে তদ্বির করবার কোন দরকার নেই। আমার উকীলকেই এখানে ডেকে পাঠাচ্ছি। এখন তোমার সঙ্গে আমার অন্য কায আছে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মাতুলের দিকে চাহিতেই বৃদ্ধ কহিল,—আমার সঙ্গে সেরেস্তায় চল। খাতাপত্রগুলো আমি দেখবো।

কৃত্তিবাসের মাথায় বুঝি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমতা আমতা করিয়া কহিল,—কদিন কিছুই দেখতে পারিনি, কায কতক গুলো প'ড়ে আছে; এ হপ্তাটা যাক, তার পর আপনাকে বুঝিয়ে দেব।

দৃঢ়স্বরে সৃষ্টিধর জানাইল,—আমি এখনি বুঝে নিতে চাই, যে কায পড়ে আছে—থাকুক, তার জন্য আমার মাথা ব্যথা নেই। তার আগের তারিখ পর্য্যন্ত আমি সমস্ত দেখবো—এখনই।

কৃত্তিবাসের আর আপত্তি করিবার সাহস হইল না, সৃষ্টিধর তাহাকে একপ্রকার জোর করিয়াই সেরেস্তায় লইয়া চলিল।

কিন্তু ঘণ্টা খানেক পরীক্ষার পরই সৃষ্টিধর বুঝিল যে, হিসাবে

পুকুর চুরী হইয়াছে ; আগাগোড়াই নানাবিধ গোল। এমন অসতর্কতার সহিত বহু অর্থ তস্রূপ করা হইয়াছে যে, অন্য কেহ হইলে সৃষ্টিধর তাহাকে পুলিসে না দিয়া স্থির হইতে পারিত না।

দুই চক্ষু পাকাইয়া কৃত্তিবাসের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ তর্জ্জনের সুরে কহিল,—এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি, কাগজে তোমার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট বেরিয়েছে, তা মিছে নয়। আমার সঙ্গেই যে ব্যবহার তুমি করেছ, যে ভাবে টাকা তছরূপ করেছ, এও একটা আলাদা পুলিস কেস। এ সব টাকা তুমি কি করেছ শুনি ?

কৃত্তিবাস কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বৃদ্ধের ক্রোধ এবার চরমে উঠিল। চীৎকার করিয়া কহিল,—শ্রীবাসকে ছেঁটে ফেলে যে ভুল আমি করেছি, তার শাস্তি আমাকে ভগবান দিয়েছেন। সোনারচাঁদ ভাগনেকে আমি পর করে বাঁদরকে আমার টাটে বসিয়ে-ছিলাম—তার ফল এখন হাতে হাতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি এ সব সহ্য করব না, যদি ভালো চাও, যে টাকা ভেঙ্গেছ—কড়ায় গণ্ডায় আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া চাই, নইলে আমি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাবো তা বলে রাখছি।

বাঁকা চক্ষু পাকাইয়া ও মুখখানা বিকৃত করিয়া কৃত্তিবাস এবার মামার কথার উত্তর দিল,—বরাবরই দেখছি নিজের কোলেই আপনি ঝোল মেখে চলেছেন। সব ব্যাপারেই যেন আমি দোষী। টাকার তছরূপই দেখছেন, কিন্তু ত্রিশ হাজার টাকা যে দিন সেরেস্তায় তুলে দিয়েছিলুম, তখন আমার সুখ্যাতি আর মুখে ধরেনি।

তর্জ্জনের সুরে সৃষ্টিধর কহিল,—থাক্, সে টাকা নিয়ে আর বড়াই করে কায নেই। একে ত জোচ্চুরীর টাকা, তারপর সেটা তবিলে

ঢুকিয়ে বেনো জল এনে ঘরের জলটুকু পর্য্যন্ত বের করে নিয়ে গেছিস্! তোর সেই চালাকীটুকু দেখেই ভেবেছিলুম—বিলেত ঘুরে এসে না জানি কত বড় কেলেঙ্কারী হয়েছিস—তাই না বিশ্বাস ক'রে চাবিকাটিটা ছেড়ে দিয়ে—ডাইনের হাতে পো সমর্পণ করেছিলুম।

বিদ্রুপের সুরে কৃত্তিবাস কহিল,—হ্যাঁ, তখন আচমকা ত্রিশ হাজার টাকার পাওনাটা আপনার বুদ্ধিটাকেও গুলিয়ে দিয়েছিল,—ন্যাকা সেজেছিলেন তখন, কিছু জানতেন না? আর—ডাইনীর হাতে পো—সমর্পণ করেছিলেন কিসের লোভে—সেটাও এখন মনে নেই! পাওয়ার অফ্ য়্যাটর্নী দিয়েই—নিকিরি পাড়ার ইজেরাদারী বিক্রী করালেন—ছাই ফেলতে, ভাঙ্গা কুলো এই কৃত্তিবাসকে দিয়ে! যদি পাতিরাম পাকড়ে নালিশ করতো—তার ঝক্কি পোয়াত কে?

সৃষ্টিধর উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল,—কে সেধেছিল তোকে ওসব ঝক্কির ভেতর যেতে? তুইই ত নিজের রিস্কেই ঐ নোংরা কাজে নেমেছিলি। ত্রিশ হাজার টাকা ত আমার তবিলে দিয়েছিলি, কিন্তু ওর তিনগুণ টাকা নিজেরা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিলি। হাতীবাবুদের সেরেস্তার ম্যানেজারের নাম করেছিলি, এখন বুঝ্ছি সব বাজে—সমস্ত টাকাটাই ঐ মাগীটার খপ্পরে গিয়েছে;—এর পর আমার যথাসর্ব্বস্বও ওপথে যাবার দাখিল হয়েছে।

কৃত্তিবাসও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিল,—আপনার যথাসর্ব্বস্ব ত এখন নামেই তালপুকুর, অথচ ঘটি ডোবে না। এই যে তিন লাখ টাকার ওপর দেনা, তার দায়ী কে? আর এই দেনা শোধবার রাস্তা দেখালেই বা কে?

—তুই? তোর ঐ ট্যারা চোখ আর কটা চামড়া দেখে রাধাশ্যাম হাতী ধন্না দিয়ে পড়েছিল আর কি! এর গোড়া হচ্ছে এই সৃষ্টিধর দাসের বুদ্ধি আর চাল, তা জানিস্?—

আপনার চেয়ে আমি বেশী জানি। এর গোড়া হচ্ছে ওদের ষ্টেটের জেনারল ম্যানেজার। গোড়া থেকেই এই প্যাক্ট্ হয়েছিল। টাকাগুলো দিয়েই তাকে বেধেছিল এই কৃত্তিবাস কোলে; যার ফলে—বিয়ের সম্বন্ধটা পাকা হয়েছে। আপনি যা করেছেন তার কোন দাম নেই। ঐ ম্যানেজার আপনার হাল সব জানে। সে যদি সব ফাঁস করে দেয়—একদিনেই আপনার নাম ডাক সব ভূস্ করে ডুবে যাবে। আর এতে দাঁও মারবে কে? নিকিরিপাড়ার ইজারাদারী বেচবার সময় যেমন আমাকে শিখণ্ডীর মত সামনে খাড়া রেখেছিলেন, এই বিয়ের ব্যাপারেও ত সেই কাণ্ডই করেছেন! আমাকে বিক্রী ক'রে নিজে নির্দ্দায় হবেন; অথচ সামান্য হাজার বত্রিশ টাকা গরমিল হয়েছে বলে আপনি আমাকে একবারে যাচ্ছে তাই করলেন সবার সামনে! এই কটা টাকার জন্য আপনি কি না কুরুক্ষেত্র বাধাতে চান! আচ্ছা, তাই হবে। আমি টাকার সন্ধানে চললাম, যোগাড় করে না আনতে পারি, আমাকে না হয় জেলেই দেবেন।

কথাটা এক নিশ্বাসে শেষ করিয়াই সে টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি দশটার পর বাড়ীতে ফিরিয়া কৃত্তিবাস নিজের ঘরে ঢুকিল। বাবুর পরিচর্য্যায় চাকর ছুটিয়া আসিল, পাচক যথাযথ ভাবেই তাহার আহার্য্য রাখিয়া গেল। কৃত্তিবাস দেখিল, তাহার সেবার বা পরিচর্য্যার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

বেলা আটটায় সময় সৃষ্টিধরের ঘরে কৃত্তিবাসের পুনরায় ডাক পড়িল। কম্পিত বক্ষে কৃত্তিবাস কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতেই সৃষ্টিধর কহিল,—গুহ সাহেবকে খবর দিয়েছি। তিনি বাড়ীতে তোমার প্রতীক্ষা করছেন। কাগজপত্র যা আছে নিয়ে যাও, কেসটা তাঁকে বুঝিয়ে দেবে। আমার কথা হচ্ছে এই—সত্য মিথ্যা কিছু বুঝি না—বেকসুর খালাস পাওয়া চাই। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, শীগ্‌গীর বেরিয়ে পড়।

কৃত্তিবাস বুঝিল, পূর্ব্বদিনের তাহার ঝাঁঝালো কথাগুলি ব্যর্থ হয় নাই, মামার মর্ম্মদ্বারে রীতিমত খোঁচা দিয়াছে; মামা এই বুঝিয়াছে যে, তাহাকে এখন হাতে না রাখিলে এবং উপস্থিত মামলার ব্যূহ হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে, বিবাহ সম্পর্কে তাঁহার যত কিছু আশা ও কল্পনা সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে।

বিবাহের পূর্ব্বেই এইরূপ একটা কেলেঙ্কারীর কথা কাগজপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় সৃষ্টিধর একেবারে মুসড়াইয়া পড়ে। পাছে খবরটা পল্লবিত হইয়া ভাবী বৈবাহিকপক্ষকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলে, তজ্জন্য তিনি মনে মনে ইহার প্রতিবিধানে নানারূপ ফন্দী আঁটিতেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সোয়াস্তি পাইতেছিলেন না। এমন সময় এক অপরিচিত ব্যক্তি সেই ঘরে ঢুকিয়া কহিল,—নমস্কার, আপনিই কি সৃষ্টিধরবাবু?

চমকিত হইয়া গৃহস্বামী আগন্তুকের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিলেন। দেখিলেন, কালো চেহারা, সাধারণ ধরনের কাপড় জামা পরা এক যুবা, দুইটি অসাধারণ চক্ষুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাহার দিকে নিবদ্ধ করিয়া পাথরে খোদা একটা মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে।

সৃষ্টিধর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার প্রতিভাদৃপ্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া

জ্ঞাসা করিল,—কোথা থেকে আপনি আসছেন,—কি দরকার?

যুবা গম্ভীর মুখে উত্তর দিল,—আমি আসছি নিকিরিপাড়া থেকে, আমার দরকার আপনাকে। কাযের কথা আছে।

নিকিরিপাড়ার নাম শুনিয়াই সৃষ্টিধরের বুকের ভিতরটা যেন ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল।

নিকিরিপাড়ার সম্বন্ধ ত তাহার চুকিয়া গিয়াছে, তবে পুনরায় প্রকারান্তরে তাহার সহিত নূতন সম্বন্ধ ঘটিবার আয়োজন চলিয়াছে বটে! তবে নিকিরিপাড়ার নাম উঠিলে এখনও সৃষ্টিধরের বুকের ভিতরটা আলোড়িত হইয়া উঠে এবং সেই পাড়ারই আর একটা নাম যেন তাহাকে শাসাইতে থাকে।

আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সৃষ্টিধর এবার প্রশ্ন করিল,—আপনার নাম?

আগন্তুক উত্তর দিল,—পাতিরাম পাকড়ে।

সৃষ্টিধরের মনে হইল কে যেন তাহার যুগল কর্ণবিবরে যুগপত দুইটি লৌহ শলাকা ফুটাইয়া দিল। ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে নীরব থাকিয়া সে হাতখানা তুলিয়া আহ্বানের স্বরে কহিল,—আসুন; বসুন এখানে।

পাতিরাম ধীরে ধীরে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ফরাসের একপ্রান্তে থাকিয়া বসিল।

সৃষ্টিধর কহিল,—আপনার নামটা যেন শোন' শোনা মনে হচ্ছে। মনে পড়েছে—আপনার যেন মাছের কারবার ছিল, আর কি একটা হার্ডওয়ারী কারমও আছে—

পাতিরাম কহিল,—সেটা বাজে। আসল কায হচ্ছে আমার মাছ

বেচা, আর এইটিই হচ্ছে পেশা, যাতে দিন চলে। যাক, আপনার কাছে
যে জন্য এসেছি শুনুন,—রণছোড় লাল ঝুনঝুনওয়ালা আর শিউরত
খৈতানের গদীতে আজ তক আপনার সুদে আসলে মোট তিন লাখ একু
হাজার তিপান্ন টাকা দেনা আছে,—একথা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকা
করবেন ?

সৃষ্টিধর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল,—আমার বাড়ী বয়ে এ
একথা বলবার মানে ?

পাতিরাম দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল,—মানে এই, ঐ দুটো গদীর দে
পাওনা সমস্ত আমি কিনে নিয়েছি।

বলেন কি ! দেনা পাওনা—সমস্ত ?

আজ্ঞে হঁ্যা ! এর জন্য আমাকে অনেকগুলো টাকা ঢালতে হয়েছে
কাযেই টাকাগুলো তাড়াতাড়ি না তুললেই নয়। এই জন্যই আপনা
কাছে এসেছি।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সৃষ্টিধর কহিল,—বুঝেছি। কিন্তু পাও
টাকাগুলো ত জলের মাছ নয় পাতিরাম বাবু, যে মনে করলেই টানা জ
দিয়ে একদিনেই তুলে নেবেন !

পাতিরাম মুখখানা কঠিন করিয়া কহিল,—আমি কিন্তু তাই ম
করি। আমার কাছে জলের মাছ, খেতের ফসল আর খাতকের টা
সব সমান, ইচ্ছা করলেই তুলতে পারা যায়।

বিরক্ত কুটিল মুখে সৃষ্টিধর কহিল,—ইচ্ছা করলেই তুলতে পা
যায় ! বলছেন কি আপনি ? তাহলে ঐ ঝুনঝুনওলা আর খৈত
এতদিন চুপ করে থাকতো ? তারা তুলতে পারেনি কেন ?

পাতিরাম কহিল,—তারা পারেনি কেন, সে খবর ত আমি আপনাকে দিতে পারব না দাস মশাই। কিন্তু আমি তুলতে চাই। তাই লোক না পাঠিয়ে আর চিঠি বাজী না করে আমি নিজেই এসে আপনাকে বলতে এসেছি—আজ থেকে তিন দিনের ভেতর ঐ টাকাগুলো আপনি মিটিয়ে না দেন, চৌঠো দিন আমি হাইকোর্টে এই বলে আপনার নামে এফিডেফিট করবো যে, আপনাকে যেন দেউলে সাব্যস্ত করা হয়—কেননা, আপনার দেনা দেনা, য়্যাসেটসের চেয়ে লায়াবিলিটিজ্ বেশী, দেউলে খাতায় আপনার নাম লেখানোই উচিত।

সৃষ্টিধরের মনে হইল, এই অদ্ভুত লোকটা যেন তাহাকে তুলিয়া ফরাসের উপর হইতে ঝুপ করিয়া রাস্তার উপরে ফেলিয়া দিয়াছে। এমন সাংঘাতিক কথা মানুষের চামড়া পরা কাহারও মুখ দিয়া এভাবে বাহির হইতে পারে—চোখের পরদা ছিঁড়িয়া দিয়া এমন করিয়া মুখের উপর স্পষ্ট কথা কেহ বলিতে সাহস করে—এ ধারণা তাহার ছিল না। মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

পাতিরাম কহিল,—তাহলে এই কথাই রইলো। পরশু আমার লোক ঠিক এই সময় আপনার কাছে আসবে। আপনি তার সঙ্গে আমার য়্যাটর্নীর আপিসে যাবেন—সেইখানেই লেন দেন হবে। আর যদি আপত্তি থাকে, সেটাও বলে দেবেন।

সৃষ্টিধর কহিল,—আপনি আমার ওপর এত নিষ্ঠুর হচ্ছেন কেন পাতিরাম বাবু! বেশত, ওদের পাওনা কিনে নিয়েছেন, এত ভাল কথা! এখন আমার সঙ্গে একটা রফা করে—

ফরাস হইতে তড়াক করিয়া উঠিয়া পাতিরাম কহিল,—রফা আমার

কোষ্ঠিতে লেখেনা, রোকশোধ হচ্ছে আমার কারবারের মটো। আচ্ছা—নমস্কার।

আর কোন কথা না বলিয়া অথবা সৃষ্টিধরকে এ প্রসঙ্গে অন্য কথা কহিবার অবসর না দিয়ে পান্তিরাম ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সৃষ্টিধর স্তব্ধভাবে ফরাসের উপর বসিয়া এই অদ্ভুত মানুষটির সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা করিতে লাগিল। যে লোক এতটা কঠিন হইতে পারে, তাহার হুমকী যে মিথ্যা নয়—সে যে মনে করিলে এক দিনেই তাহাকে রাস্তায় নামাইয়া দিতে পারে—এই চিন্তা তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। যদি সত্যই সে তাহা করে? তখন?—কি সর্ব্বনাশ! এ কথা ত ছাপা থাকিবে না; তাহার দেনার কথাও সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। তখন কি নিকিরিপাড়া সম্পর্কে তাহার আশা ও আকাঙ্খা চরিতার্থ হইবে? না—যেমন করিয়া হউক, পান্তিরামের মুখ তাহাকে বন্ধ করিতেই হইবে। এখন একমাত্র উপায়—শ্রীবাস। সেই তাহাকে এ বিপদে রক্ষা করিতে পারিবে।

যেমন একদিন শ্রীবাসের জুড়ী তাহার মামার বাড়ীর দেউড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়ায় এবং জুড়ী হইতে নামিয়া সে মামাকে তাক লাগাইয়া দেয়, তেমনই একদিন সৃষ্টিধরের বাড়ীর গাড়ী শ্রীবাসের সুবৃহৎ বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রকাণ্ড বাড়ী। বাহির মহলে বিরাট কর্ম্মশালা; চারিদিকে লোক
ন গিস্‌গিস্‌ করিতেছে। এক একটি ঘরে এক একটি বিভাগ; ক্রয়
বক্রয়, লেন দেন, আদায় উসুল, বন্ধকী ব্যাপার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর
কারবারের বিরাট প্রতিষ্ঠান। দেউড়ীতে লোহার শিকলে প্রকাণ্ড এক
পটা ঘড়ি ঘণ্টায় ঘণ্টায় সশব্দে সময় নির্দ্দেশ করিতেছে। দরোজার
রেই উর্দ্দীপরা দ্বারবান সদা সর্ব্বদা মোতায়েন। ভিতরে ঢুকিলেই
শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্ম্মধারা হইতে প্রতিষ্ঠানটির আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া
যায়।

শ্রীবাসকে তাহার মাতুল সৃষ্টিধরের উপরে তুলিতে এবং সেই সঙ্গে
য় আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ করিতে পাতিরাম যদিও প্রথমে দুই একটি ফাঁকা
াওয়াজ দিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরেই কি ভাবিয়া সেই আওয়াজটি
য একেবারে ফাঁকা নয়—তাহা প্রতিপন্ন করিতে এক বিরাট কাণ্ড
াধাইয়া বসে।

এই বিশাল বাড়ীখানি তাহার কাছেই দায়বদ্ধ অবস্থায় ছিল। সুতরাং
খানে শ্রীবাসকে মালিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করা পাতিরামের পক্ষে কঠিন
য় নাই। কিন্তু পাছে সংঘর্ষকালে গোড়ার এই গলদটুকুর সুযোগ লইয়া
প্রতিপক্ষ শ্রীবাসকে জাল ধনী সাব্যস্ত করিয়া দেয়, এই আশঙ্কায় পাতিরাম
শ্রীবাসকে সমঅংশীদার করিয়া বিশ্বাস কোম্পানী নামে এক বিরাট
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করে এবং নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের মূলধন
হইতেই বাড়ীখানি কিনিয়া লয়। বাহিরে পাতিরামের প্রচার-কৌশলে
তাও প্রচারিত হয় যে, শ্রীবাস বিশ্বাসই এই প্রতিষ্ঠানের সত্ত্বাধিকারী ও
পরিচালক।

কিন্তু পাতিরামের কাণ্ড দেখিয়া শ্রীবাস বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। সে কম্পিতকণ্ঠে তাহার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করে,—স্যার, আপনার মতলব ত কিছু বুঝতে পারছি না। মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়ার মত ফাঁকা আওয়াজ দিতে আমাকে ত জাহীর করলেন, কিন্তু এখন দেখছি সবই যে উল্টে গেলো ; জাল আসল হয়ে দাঁড়ালো !

পাতিরাম তখন হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল,—আমার স্বভাবটাই এই রকম শ্রীবাস। প্রথমটা আমি লোকটাকে ধরে খুব কোসে নাড়া চাড়া দিই, তাতেও যদি সে খাড়া থাকে, টিকে যায়, তখন তাকে আমার ওপরেও তুলে দিতে চাই। তাতে সে লোক যত আশ্চর্য্য হয়, আমিও তত আনন্দ পাই। হ্যাঁ, এখন আমার কথা শোন, কাযের খাতিরে আমি যেমন মিছে কথা বলি, তেমনি সুযোগ পেলে আর আবশ্যক বুঝলে মিছে কথাটাকেও সাংঘাতিক খাঁটি করে তুলি। আমার লোক জনের কাছে বলেছি—তুমি আমার কারবারের অংশীদার। যোগ্যতার পরীক্ষায় ভালরকম পাশ করে তুমি বেরিয়ে এসেছ বলেই আমি সত্যি সত্যি তোমাকে অংশীদার করে নিচ্ছি। তুমিত জান, এই বিশ্বাস কোম্পানীর ক্যাপিট্যাল হচ্ছে পুরোপুরী ছ'লাখ টাকা। বাড়ীখান কিনতে একলাখ বেরিয়ে গেছে। বাকিটা এর ক্যাপিট্যাল খাতে আছে সমস্ত ক্যাপিট্যালটা আমি যদিও বের করেছি, কিন্তু এর অর্দ্ধেক তিন লাখ টাকা তোমাকে দিতে হবে।

শ্রীবাস দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুধু বলিয়াছিল,—কিন্তু আমি ঐ তিন লাখ কোথা থেকে দেব স্যার ! আমার কাছে এ সবই স্বপ্নের মত—

পাতিরাম তখন শ্রীবাসকে এই বলিয়া স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিল,—

আগেকার খোলস তুমি ছেড়ে এসেছ শ্রীবাস ; একথা ভুলে যেও না, তুমি এখন এমন একটা কোম্পানীর সমান অংশীদার ও মালিক, যার বাড়ীখানা নিজেদের, আর মূলধন পাঁচ লাখ টাকা। এ থেকে তিন লাখ টাকা শোধ করতে কতক্ষণ ? শোধ করবার উপায়ও আমি তোমাকে বলে দেব, তার জন্য এখন থেকে ভাবনার কি দরকার ? তবে একটা কথা হচ্ছে এই, এ সব কথা ভেতরের ; বাইরে প্রকাশ থাকবে—তুমিই এই কারবার ফেঁদেছ, বাড়ী কিনেছ, মালিক হয়ে একে চালাচ্ছ। আরও অনেক কথা আছে, সে সব ক্রমশঃ শুনতে পাবে।

সৃষ্টিধর এই প্রথম বিশ্বাস কোম্পানী তথা—তাহার মালিক শ্রীবাস বিশ্বাসের বিরাট প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিল। শ্রীবাস তখন তাহার খাস কামরায় বসিয়া কতিপয় মাড়োয়ারী দালালের সহিত তিসির কনট্রাক্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল।

বেয়ারা কক্ষে প্রবেশ করিয়া সৃষ্টিধরের নাম ও ঠিকানা লেখা এক টুকরা কাগজ তাহার টেবিলে দাখিল করিল। নাম পড়িয়াই শ্রীবাস সোজা হইয়া দাঁড়াইল। কক্ষে সমবেত মাড়োয়াড়ীরাও তাড়াতাড়ি উঠিতেছিল, কিন্তু শ্রীবাস বাধা দিয়া কহিল,—আপনারা বসুন, আমি এখুনি আসছি। কক্ষের বাহিরেই সৃষ্টিধরকে দেখিয়া শ্রীবাস ছুটিয়া গিয়া তাহার পদতলে মাথা নত করিয়া দিল এবং তাহাকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া হাত ধরিয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিল।

সৃষ্টিধরকে সম্মুখের আসনে বসাইয়া শ্রীবাস মাড়োয়ারীদিগের সহিত তাহাকে পরিচিত করিয়া দিল। তাহারা সকলেই শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে অভিবাদন করিল।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া শ্রীবাস মাড়োয়ারী দিগকে বিদায় দিল। তাহার পর মামার দিকে চাহিয়া কহিল,—আ যখন এসেছেন, এখানেই খাওয়া দাওয়া কিন্তু করতে হবে।

সৃষ্টিধর কহিল,—খাওয়া দাওয়া আর একদিন এসে ধীরে সু করবো। এখন মাথার ওপর আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে বাবা, এমন মুস্কি কখনো পড়িনি। সেই জন্যই তোমার কাছে এসেছি।

শ্রীবাস কহিল,—আপনার চেহারা দেখেই সেটা মনে হচ্ছে বটে আমিও এটা খুব বুঝি মামা, মনে দুশ্চিন্তা থাকলে, তার ছায়া মুখেও ফু ওঠে। কিছুতেই সোয়াস্তি আসে না, ক্ষুধা তখন মাথায় ওঠে। আচ্ছ বলুন ত, ব্যাপারখানা কি ?

সৃষ্টিধর তখন কহিল,—আমার কিছু দেনা আছে বাবা, কিছু মানে লাখ তিনেকের ধাক্কা। দেনাটা শোধ করবার আমি একটা উপায় পেয়েছি, তবে কিছু দেরী হবে। কিন্তু তার আগেই একটা মহা ফ্যাসা বাধিয়েছে এক বেটা ভূঁইফোড় ধড়িবাজ। সে করেছে কি জান ? দুটো মহাজনের কাছে আমার দেনা, তাদের কাছ থেকে সেটা কি নিয়ে আমাকে হুমকী দিয়েছে—তিন দিনের ভেতর সমস্ত পাওনা য পরিষ্কার করে না দিই—সে আমাকে দেউলে খাতায় নাম লিখিয়ে ত ছাড়বে।

বিস্ময়ের সুরে শ্রীবাস কহিল,—বলেন কি মামা ! কিন্তু এতে তা লাভ ?

সৃষ্টিধর কহিল,—আমিও ভেবে ঠিক করতে পারিনি—নিজের না কান কেটে এমন করে অন্যের যাত্রা-ভঙ্গ ক'রে কি লাভ ! তবে এম

তে পারে—ভেবেছে মানের দায়ে যেমন করে হোক টাকাটা আমি ফেলে দব কিন্তু তিন দিনের ভেতর এতগুলো টাকা যোগাড় করা কি সোজা থা বাবা! অথচ, সে লোকটার যে রকম মেজাজ দেখলুম্, তাতে নে হচ্ছে—সে সব পারে। টাকা না দিলে, আমাকে মুস্কিলেই ফলবে।

শ্রীবাস কহিল,—কিন্তু মনে করলেই ত আর একজন নামী লোককে মন করে বেইজ্জত করা যায় না মামা! দেনা আপনার যেমন আছে, তমনি বিষয় সম্পত্তিও ত আপনার কম নয়।

সৃষ্টিধর কহিল,—সেটা সবাই জানে, লুকোবার নয়, লুকিয়ে আছে শুধু ঐ দেনাটা—সবাই যা জানে না। এখন আমার মস্ত ভাবনা কি জান? যদি ও লোকটা ঐ পাওনাটা তুলে এফিডেফিট করে, তাহলেই ব জানাজানি হয়ে যাবে, আর আমার যে উপায়টা সামনে ঝুলছে, দিন কতক পরেই হাতে এসে পড়বার কথা—আমার দেনার ব্যাপারটা রাষ্ট্র লেই সেটা উপে যাবে, বুঝেছ

শ্রীবাস মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল,—তাহলে এখন উপায়? ক করবেন বলুন ত, টাকাও ত কম নয়।

সৃষ্টিধর কহিল.—সেই জন্যই ত তোমার কাছে এসেছি বাবা,—এখন তুমি যদি টাকাটা যোগাড় করে দিতে পারো—

কথাটা এই খানেই শেষ করিয়া সৃষ্টিধর দুই চক্ষুর সাগ্রহ দৃষ্টি শ্রীবাসের মুখের উপর নিবদ্ধ করিল।

শ্রীবাস একটু ভাবিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—আমার টাকাগুলো সবই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে, হাতে থাকলে কোন কথাই ছিল না। তবে হাতে

এখন টাকা না থাকলেও লোক আছে। আপনার আপত্তি না থাক
এখনই আপনাকে নিয়ে তার কাছে যেতে পারি।

সৃষ্টিধর কহিল,—আমার যেতে আপত্তি নেই, যদি বোঝ যে, সেখা
কাষ উদ্ধার হবেই আর ব্যাপারটা চাপাই থাকবে।

শ্রীবাস কহিল,—সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। আমি
লোকের কাছে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি মামা, তাঁর ওপর আমার
বিশ্বাস আছে।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে মামাকে লইয়া সেই লোকের খাস কামর
প্রবেশ করিতেই লোকটিকে দেখিয়া মামার মুখখানি একেবারে ছা
মত বিবর্ণ হইয়া গেল। দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া সে দেখিল,—যা
দুর্ব্বার আর্থিক বুভুক্ষা মিটাইবার আশঙ্কা লইয়াই তাহারা এখানে আ
য়াছে, সেই সাংঘাতিক মানুষটিই তাহাদের সম্মুখে বসিয়া আছে।
মানুষ আর কেহ নহে, নগদবিদায় এজেন্সীর মালিক নিকিরিপাড়া
মাথা—স্বয়ং পাতিরাম পাকড়ে!

পাতিরাম সহাস্যে কহিল,—আসুন শ্রীবাস বাবু, আসুন। একি,—
সৃষ্টিধর বাবু যে! কি ভাগ্য! বসুন আপনারা বসুন। উভয়ে পাশ
পাশি দুইখানি কেদারায় বসিলে, পাতিরাম কহিল,—আপনাদে
চেনাশোনা আছে নাকি?

শ্রীবাস কহিল,—বিলক্ষণ! ইনি যে আমার মামা হন, তা বু
জানেন না?

হাস্যস্ফুরিত মুখে বিস্ময়ের ঈষৎ রেখা ফুটাইয়া পাতিরাম কহিল,—
বটে! আপনি তাহলে সৃষ্টিধর বাবুর ভাগনে? আপনার সঙ্গে অনে

দিনের আলাপ. কিন্তু এ কথাটা কোন দিন শুনিনি। যাক্, হঠাৎ কি মনে করে গরীবের কুটীরে আসা হয়েছে সৃষ্টিধর বাবু! শ্রীবাসের কথা ছেড়ে দিন, আসা যাওয়া প্রায়ই আছে; কিন্তু আপনার মত দিকপালের পায়ের ধূলো যে এখানে পড়বে—সেটাত কল্পনাও করিনি।

সৃষ্টিধর শুষ্ক কণ্ঠে কহিল,—কি যে বলছেন, তার ঠিক নেই। আপনি ত সবই জানেন, সুতরাং মিছি মিছি বাড়িয়ে কি লাভ বলুন না! তবে আমার কথা যেটা বলছেন, সেটার ভেতর একটা ভারি গলদ হয়ে গেছে।

মুখে কৌতুকের ভঙ্গী ফুটাইয়া পাতিরাম কহিল,—কি বলুন ত?

সৃষ্টিধর কহিল,—ভুতের ভয়ে রোজার সন্ধানে বেরিয়েছিলুম। শ্রীবাসকে বলতে, সে জানালে, তার সন্ধানে ভাল রোজা আছে। কিন্তু ওর সঙ্গে এসে এখন দেখছি—

পাতিরাম কহিল,—সেই ভুতটাই রোজা হয়ে বসে আছে, কেমন? যাক্, ব্যাপারখানা আমি বুঝে নিয়েছি; শ্রীবাসকে ধরেছেন লাখ তিনেক টাকার জন্য, ওঁর হাতে টাকা না থাকায় উনি আমার কাছে আপনাকে এনে হাজীর করেছেন। কিন্তু, এতে আপনার হতাশ হবার কিছু নেই সৃষ্টিধর বাবু। সে দিন আপনার বাড়ীতে যে লোক গিয়ে টাকার হুমকী দিয়ে এসেছিল, সে চায় পাওনা টাকা আদায় করতে। আর এখানে যে লোক বসে আছে দেখছেন, এ চায় আট ঘাট বেধে টাকা খাটাতে।

সৃষ্টিধর অভিভূতের মত পাতিরামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পাতিরাম বলিয়া চলিল,—শ্রীবাস যেমন আপনার সব জানেন, আমিও তেমনই আপনার সব খবরই রাখি। আপনাকে লাখ তিনেক টাকা

দিতে আমার আপত্তি নেই—কেননা, শ্রীবাস বাবু আপনাকে যখন এনেছেন। ওঁর মান আমাকে রাখতেই হবে। তবে কি জানেন, ভদ্রলোকের দায়ে আদায়ে টাকাকড়ি দিতে আমি যেমন পোক্ত, সেটা আদায় করবার রাস্তাগুলোও জেনে শুনে নিতে তেমনি আমাকে শক্ত হতে হয়।

সৃষ্টিধর কহিল,—টাকা দিতে শক্ত হবেন, এতে আর কথা কি! কিন্তু আমি ঠিক করতে পারছি না, এর জন্য আলাদা লেখাপড়ার কি দরকার, আমার যে দেনা আপনি কিনেছেন, তারই মেয়াদ মাস তিনেক বাড়িয়ে দিলেই ত, গোল মিটে যায়।

পাতিরাম কহিল,—তা যায়, কিন্তু আমি সে রাস্তায় যেতে রাজী নই। গোড়াতেই আপনাকে বললুম না, যে লোক আপনার বাড়ীতে গিয়ে তাগাদা দিয়েছে, আর যে লোক ঐ দেনা শোধ করবার জন্য টাকা দিতে বসেছে, আপনাকে ভাবতে হবে এরা আলাদা।

আপনি রীতিমত দলিল লেখাপড়া করে তিনলাখ টাকা এক হাতে নেবেন, আর এক হাতে ঐ টাকাটা দিয়ে পুরানো দলিলগুলো ফিরিয়ে নেবেন।

সৃষ্টিধর কহিল,—লেখাপড়া কি ভাবে হবে?

পাতিরাম কহিল,—টাকা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনার ষ্টেট আমাদের হাতে থাকবে। আপনার যা কিছু খরচ পত্র আমাদের হাত দিয়েই হবে। যে টাকা উদ্বৃত্ত হবে, তা থেকেই আমরা আস্তে আস্তে আমাদের দেওয়া টাকাটা উসুল করে নেব।

সৃষ্টিধর কহিল,—না, এ প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারি না এতে

আমার প্রেষ্টিজে ঘা পড়বে। যে জন্য আমি দেনার ব্যাপারটা লুকোতে চাইছি, সেটা সবাই জানতে পারবে।

পাতিরাম কহিল,—আমরা কি এমনি আহাম্মুকের মতই কায করবো ভেবেছেন! আমরা মানীর মান রাখতে জানি। আপনার এষ্টেটের ওপর খবরদারী করতে আমিও যাব না, আমার লোক জনও যাবে না, সে সব দেখাশোনা করবে আমার তরফ থেকে আপনার এই ভাগনে শ্রীবাস বাবু। কেননা, এ ব্যাপারে ওঁকেই সমস্ত রিস্ক্ নিয়ে কায করতে হবে, যখন আপনাকে উনিই এনেছেন। ওঁর ওপর আমার বিশ্বাস এত বেশী যে, টাকাটা যদিও আমি দেব, কিন্তু দলিলটা হবে ওঁরই নামে, তাতে আপনার আরও সুবিধা, লোকে জানবে—আপনার ভাগনের ওপরই আপনি সব ভার দিয়েছেন, তিনিই আপনার ষ্টেট দেখা শোনা করছেন।

সৃষ্টিধর কহিল,—বেশ, এতে আমার আপত্তি নেই। আপনি লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করুন।

সেই দিনই দলিল লেখা ও যথারীতি রেজিষ্টারী হইয়া গেল। শ্রীবাসই যেন সৃষ্টিধরকে তিন লক্ষ টাকা এই সর্ত্তে ধার দিল যে, সৃষ্টিধরের তাবত্ত সম্পত্তি সে তত্ত্বাবধান করিবে এবং সৃষ্টিধরের সেরেস্তার লোকজনের বেতন ও সংসার খরচাদি নির্ব্বাহ করিয়া অবশিষ্ট টাকা হইতে দেনার টাকা উসুল করিতে থাকিবে।

## ২১

ইহার পর খুব তোড়জোড় করিয়াই মামলার শুনানী আরম্ভ হইল। কৃত্তিবাসের পক্ষ হইতে গুহ সাহেব সওয়াল করিলেন,—কেসটা সম্পূর্ণ সাজানো। মেনকা বাঈএর সহিত কস্মিনকালেও কৃত্তিবাসের আলাপ-পরিচয় নাই। সহরে এক শ্রেণীর রূপজীবিনী আছে—ইহারা বড়লোকের ছেলেদের পিছনে লোক লাগায় ও তাহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিয়া লইয়া শেষে তাহাকে এই ভাবে জব্দ করিয়া থাকে। কৃত্তিবাস শিক্ষিত যুবা, তাহার স্বভাব চরিত্র গঙ্গাজলের মত নির্ম্মল।

কিন্তু মেনকা বাঈএর পক্ষ হইতে এমন কতকগুলি মারাত্মক প্রমাণ দাখিল করা হইল যে, তাহার প্রত্যেকটি কৃত্তিবাসের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতার দর্পণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাড়ীওয়ালার সাক্ষ্য, দোকানদারের হিসাব, চাকরদের সাক্ষ্য, সাপ্তাহিক জলসার ফিরিস্তি প্রভৃতি ম্যাজিষ্ট্রেটের একজিবিট-লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গুহ সাহেবকে পর্য্যন্ত স্তব্ধ করিয়া দিল। ইহার উপর তরুণী রূপসী মেনকা আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সুস্পষ্টভাবে জানাইল,—কৃত্তিবাস এমন কোন তালেবর লোক নয় যে, তাহাকে জব্দ করিবার জন্য আমি এই ভাবে একটা মিথ্যা মামলা রুজু করিব। নাট্যশালায় অভিনয় করিয়া আমি যাহা উপার্জ্জন করি, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। কৃত্তিবাসের আর্থিক

অবস্থা যে সচ্ছল নয় এবং তাহাকে যে নানাবিধ অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাও আমি জানি। সে যদি আমার ক্ষতিপূরণে অসমর্থ হয়, আমি আমার আর্থিক দাবী ত্যাগ করিতেও পারি। কিন্তু আমার সহিত তাহার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই এবং সে নিজেকে সত্যবাদী সচ্চরিত্র প্রতিপন্ন করিতে যাহা বলিয়াছে, তাহা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা—তাহারই হস্ত লিখিত কতিপয় পত্র ও আমাদের যুগ্ম ফটোচিত্র হইতে প্রকাশ পাইবে। এই পত্র ও ফটোগুলি যে আসল, জাল নহে, অপর পক্ষ তাহা যে-কোন উপায়ে পরীক্ষা করিতে পারেন।

বলা বাহুল্য, মামলায় কৃত্তিবাসকে হারিতে হইল। সে যে মিথ্যাবাদী ও চরিত্রহীন, আদালতে তাহা প্রতিপন্ন হইয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে এ যাত্রা সাবধান করিয়া অব্যাহতি দিলেন।

যে ধনী-কন্যার সহিত কৃত্তিবাসের বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার নাম রাধাশ্যাম হাতী। অতিশয় স্থূল দেহখানি অতিকায় এক তাকিয়ার উপর ন্যস্ত করিয়া অনেকগুলি পারিষদ ও আত্মীয়গণের সহিত হাতী মহাশয় বাহিরের বৈঠকখানায় তাঁহার ভাবী জামাতার প্রসঙ্গেই আলোচনা করিতেছিলেন।

কৃত্তিবাসের মকদ্দমার আজ রায় বাহির হইবার কথা। হিতৈষীবর্গ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, আগে রায়টা দেখুন, কেসটা ধোপে টেঁকে কি না, ব্যাপারখানা আসল কি নকল এসব না জেনে কোন কিছু করা ঠিক নয়।

রাধাশ্যাম বাবু স্বয়ং শিক্ষিত ব্যক্তি, চরিত্রবান এবং হিসাবী লোক। কৃত্তিবাস ছেলেটি চালাক চতুর, শিক্ষিত এবং অপুত্রক মাতুলের সমগ্র

সম্পত্তির উত্তরাধিকারী জানিয়া খুব খুসী মনেই তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। বনেদী বংশের দিকেও ইহাঁর একটা ঝোঁক ছিল, সেদিক দিয়াও কৃত্তিবাস যোগ্যতাসম্পন্ন। আশীর্ব্বাদ যেখানে হইয়া গিয়াছে এবং বিপুল ঘটা করিয়া বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন চলিয়াছে, নিয়তির কঠোর পরিহাসের মতই সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে পাত্র সম্বন্ধে এই সাংঘাতিক সংবাদ। খবরের কাগজের ছাপা বিবরণটুকুর প্রত্যেক কথাটি যেন তীরের ফলার মত তাঁহার মর্ম্মে বিদ্ধ হইল। উৎসবমুখর বহুজনপূর্ণ ভবনে একটা নিরানন্দের ছায়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সুপরামর্শের সভাও বসিয়া গেল। অনেকেই অনেক কথাই বলিলেন, কিন্তু কেহই কোন প্রকারে কৃত্তিবাসের স্থলে তাহার অনুরূপ একটি পাত্রের সন্ধান দিতে পারিল না। শেষে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, ম্যাজিষ্ট্রেট কি রায় দেন, তাহা দেখিয়া পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

সপারিষদ রাধাশ্যাম বাবু সাগ্রহে ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সেরেস্তার দুইজন কর্ম্মচারী খবর আনিবার জন্য পূর্ব্বাহ্ণেই আদালতে ছুটিয়াছিল।

অপরাহ্ণের দিকে তাহারা যখন আদালত হইতে ফিরিয়া প্রভুর বৈঠক-খানায় ঢুকিল, তাহাদের মুখভঙ্গী দেখিয়াই সকলে বুঝিল, খবর ভাল নহে

অতঃপর তাহারা যে মর্ম্মন্তুদ খবর শুনাইয়া দিল, বৈঠকখানায় সমবেত সকলেই তাহাতে স্তব্ধ হইয়া গেল। রাধাশ্যাম বাবু কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন,—এখন আমি কি করব? উপায় কি! মেয়েকে ত হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারিনে!

এ সম্পর্কে নানারূপ আলোচনা ও বিতর্কে বিশাল বৈঠক ঘরখানা

যখন মুখর হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় ছাতাটি বগলে লইয়া সীতানাথ শীল ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

রাধাশ্যাম বাবু তাহাকে দেখিয়া যেন অকুলে কুল পাইলেন। মাত্র কতিপয় দিবস হইল, ইঁহাদের বংশের একটা কাহিনী লিখিবার প্রসঙ্গ লইয়া এই লোকটি এখানে আসিয়াছিল এবং কথা প্রসঙ্গে ভাগ্য গণনায় তাহার অসামান্য কৃতিত্বে গৃহস্বামীকে চমৎকৃত করিয়া কায গুছাইয়া গিয়াছিল।

রাধাশ্যাম বাবু দুই হাত তুলিয়া কহিলেন,—আসুন সীতানাথ বাবু, আসুন। আপনাকে এ সময় পেয়ে ভারি খুসী হয়েছি। মনের টানেই যেন আপনি এসে পড়েছেন।

সীতানাথ কহিল,—ভারি একটা মুস্কিলে পড়েই আমাকে ছুটে আসতে হয়েছে স্যার! সেদিন আপনি বললেন না—কলকেতার ভেতর আপনাদের জাতের দুটো পুরোনো বড় ঘর আছে; একটা ঘরের কর্ত্তা হচ্ছেন আপনি, আর একটি ঘরের কর্ত্তা হচ্ছেন আপনার হবু বেহাই মশাই সৃষ্টিধর দাস। কিন্তু আমি আর একটী বড় ঘরের সন্ধান পেয়েছি, তিনি হচ্ছেন—বিশ্বাস কোম্পানীর মালিক শ্রীবাস বিশ্বাস। তাঁদের বংশের কথা লেখবার জন্য ধরেছিলাম কিনা? তিনিও আপনার মত সদয় হয়ে তাঁর বংশ পরিচয় লিখতে দিয়েছেন। তাতেই জানলুম কিনা তিনিও আপনাদের। হয়ত জানা শোনাও থাকতে পারে।

রাধাশ্যাম বাবু বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করিলেন,—আমাদের ঘরে বিশ্বাস? হ্যাঁ—বিশ্বাস কোম্পানীর নাম আমরা জানি, খুব ফ্যালাও কারবার ফেঁদেছে শুনিছি, কিন্তু এই বিশ্বাস যে—

তাড়াতাড়ি একখানি ছক ও সেই সঙ্গে সুন্দর একখানি ফটো চিত্র বাহির করিয়া সীতানাথ কহিল,—এই দেখুন না, আমাকে সব নোট দিয়েছেন লিখে। জাতি, গাঁই, গোত্র—সব। তবে আপনাদের সঙ্গে আর সব দিক দিয়ে মিলছে, খালি বয়সের দিক দিয়ে মিলছে না। আপনারা দুই বৈবাহিক বুড়িয়ে এসেছেন, আর ইনি দিব্য যোয়ান আছেন—এই এই দেখুন না কেমন খাসা চেহারা, আর বয়স কতই বা হবে, বড় জোর ছাব্বিশ। কিন্তু এই বয়সেই এত বড় একটা কারবার চালাচ্ছে। এখনো বিয়ে পর্য্যন্ত করেনি—খাসা ছেলে। আপনাদের ঘরে এ রকম ছেলে যে থাকতে পারে তা ভাবিনি।

ফটোখানির উপর দুই চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাধাশ্যাম কহিলেন,—কি নাম বললেন ?

সীতানাথ কহিল,—নাম এঁর শ্রীবাস বিশ্বাস। আমি ঠিক করেছি, বংশ পরিচয়ে আপনাদের দুই বৈবাহিকের পরেই এঁর বিষয় ছাপাবো। আপনাদের ফটোগুলো কিন্তু আজ দিতে হবে স্যার ; ব্লক তৈরী করাতে হবে ত।

রাধাশ্যাম কহিল,—সে সব আর একদিন হবে। আজ আমরা একটা ব্যাপারে ভারি ব্যস্ত আছি। আচ্ছা সীতানাথ বাবু, আমার ভাবী জামায়ের রাশিচক্রটা একবার দেখে দেবেন।

সীতানাথ কহিল,—নিশ্চয়ই দেখবো, কাছে আছে ?

রাধাশ্যাম বাবু তাঁহার মির্জ্জায়ের পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া সীতানাথের হাতে দিয়া কহিলেন,—দেখুন ত !

সীতানাথ কহিল,—ভালই হ'ল, আর একটা পরিচয় বাড়লো।

আপনার জামাতা ও কন্যার একটা আলাদা চ্যাপ্টার ছাপবো। আপনার জামায়ের একখানা আর মেয়ের একখানা ছবি দেবেন।

রাধাশ্যাম কহিলেন,—সে সব পরে হবে; আগে এই রাশিচক্রটা ত দেখুন।

প্রায় পনের মিনিট ধরিয়া নানারূপ মুখভঙ্গী করিতে করিতে সীতানাথ একখানি কাগজের পৃষ্ঠা বিবিধ অঙ্কপাতে ভরাইয়া ফেলিল। তাহার পর মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল,—দেখুন, স্যার! আপনি আমার সঙ্গে কৌতুক করছেন; এ রাশিচক্র আপনার জামাতার হতে পারে না।

রাধাশ্যাম কহিলেন,—এর মানে?

সীতানাথ কহিল,—মনে হচ্ছে—এই জাতকের বিবাহ-যোগ মোটেই নেই। অবিদ্যার সংযোগ বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। জাতক খুব চতুর বটে, কিন্তু রাজদ্বারে নিগ্রহের যোগ প্রবল রয়েছে। তা ছাড়া এ জাতক কশ্চিন কালেও বিত্তবান হবে না, বরং এঁকে বিত্তনাশক বলা যেতে পারে। এঁর হাতে সময় সময় প্রচুর বিত্ত আসতে পারে, কিন্তু সেটা অধর্ম্মের পথ দিয়েই আসবে, আর তাতে বিপদেরও সম্ভাবনা যথেষ্ট। এ জাতক কেমন ক'রে আপনার জামাতা হতে পারে?

রাধাশ্যাম বাবু কহিলেন,—সহরের বড় বড় জ্যোতিষী দিয়ে আমি এই রাশি চক্র গণিয়েছি। কিন্তু আপনি যে সব কথা বললেন, আর কেউ বলেন নি।

সীতানাথ কহিলেন,—আমার ত এই দোষ স্যার, রেখে ঢেকে বলতে পারি না। তা ছাড়া, ভৃগুর মতে আমি গণনা করি; আমার গণনার

ধারা আলাদা, কারুর সঙ্গে মেলে না। তবে জোর করে আমি বলতে পারি স্যার—এ রাশিচক্র কখনই আপনার জামাতার নয়, হতে পারে না।

রাধাশ্যাম বাবু এ কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া সজোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—হুঁ!

এমন সময় প্রৌঢ় বয়স্ক এক ব্যক্তি সেখানে আসিয়া সসম্ভ্রমে গৃহস্বামীকে নমস্কার করিল। রাধাশ্যাম বাবু প্রতিনমস্কার করিয়া কহিলেন,—কোথা থেকে আসছেন?

আগন্তুক কহিল,—আপনার কাছেই এসেছি। গোপনে একটু কথা আছে।

গোপন কথা শুনিবার জন্য বিপুল দেহখানি তুলিবার চেষ্টা না করিয়া রাধাশ্যাম বাবু আগন্তুককে পার্শ্বে ডাকিয়া কর্ণ দুইটি তাহার দিকে হেলাইয়া দিলেন।

আগন্তুক অন্যের অশ্রুত স্বরে কহিল,—দেখুন স্যার, এক সময় দালালী ক'রে অনেক পয়সাই আপনাদের খেয়েছি। কিন্তু আজ এমন একটা খবর পেয়েছি, যা শুনলে আপনি চমকে উঠবেন। আপনাদের অনেক খবর রাখি ব'লে, এ খবরটা জানাতে ছুটে এসেছি। যদি আজ্ঞা করেন ত বলি।

রাধাশ্যাম বাবু কহিলেন,—যখন বলতে এসেছেন, বলেই ফেলুন।

আগন্তুক কহিল,—আপনার হবু বোই আপনাকে ভারি ঠকিয়েছেন। তাঁর সমস্ত এষ্টেট এক রকম বেহাত করে ফেলেছেন।

—বলেন কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিন লাখ টাকা দিয়ে একজন তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই হাতিয়ে নিয়েছে।

—কথাটা বুঝতে পারলুম না। টাকা ফেলে হাতিয়ে নিলে, এর মানে ?

—টাকাটা দেনায় গেছে। তিন লাখ টাকায় এষ্টেটটা বন্ধক ছিল। ঐ লোকটা সেটা খালাস করে এষ্টেটটা হাতে নিয়েছে। এতে তার বরাত খুলে গেলো, কিন্তু আপনার জামাইকে যে পথে বসতে হল। অথচ, এ সবের বিন্দু বিসর্গও আপনি জানেন না।

—আপনার কথা যে সত্য তার প্রমাণ কি ?

আগন্তুক কহিল,—প্রমাণ রেজিষ্টারী অফিস। সেখানে সার্চ করলেই সব জানতে পারবেন।

রাধাশ্যাম বাবু প্রশ্ন করিলেন,—যে লোক এষ্টেট হাতে নিচ্ছে বললেন, তার নামটা জেনেছেন ?

আগন্তুক কহিল,—নিশ্চয়। তার নাম হচ্ছে—শ্রীবাস বিশ্বাস ; বিশ্বাস কোম্পানীর প্রোপ্রাইটার।

তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া বসিয়া রাধাশ্যাম বাবু সীতানাথের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। একটু আগে তাহার মুখ দিয়া এই নামটিই নির্গত হইয়াছিল।

আগন্তুক সংবাদদাতাকে চুপি চুপি রাধাশ্যাম বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার নামটি—

আগন্তুক উত্তর দিল,—সহদেব সাঁতরা। আমি রেজিষ্টারী অফিসে চাকরী করি স্যার ! আপনার সেরেস্তার অনেকেই আমাকে জানেন।

রাধাশ্যাম বাবু কহিলেন,—আচ্ছা, কাল আমার লোক বেলা দশটার

পর রেজিষ্টারী আফিসে সার্চ করতে যাবে। আপনার প্রাপ্য গণ্ডা সেখানেই পাবেন।

সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া লোকটি উঠিয়া গেল।

রাধাশ্যাম বাবু তখন সীতানাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—আপনার এখন অবসর আছে সীতানাথ বাবু?

সীতানাথ কহিল,—কেন বলুন ত?

রাধাশ্যাম বাবু কহিলেন,—আমি একটু বাইরে বেরুব। আপনি সঙ্গে যদি থাকেন বড় ভাল হয়। আপনার বাড়ীতে আপনাকে পৌছে দিয়ে আসব।

সীতানাথ সানন্দে কহিল,—বেশ ত, তাতে কি হয়েছে,—আমার এখন যথেষ্ট অবসরই আছে।

রাধাশ্যাম বাবু তখনই গাড়ী বাহির করিবার আদেশ দিলেন।

## ২২

সকল দিক দিয়াই রাধানাথ বাবুর অদৃষ্ট ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। শেষ ভাগ্য পরীক্ষার জন্য যে টাকাটা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং লোহালক্কড় আনাইবার জন্য বিলাতে পাঠাইয়া দিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা সাগর-পথে বিলাতে পাড়ি না দিয়া কলিকাতার ময়দানেই নিঃশেষ হইয়া গেল। ইহার মূলেও পাতিরামের কৌশল-চালিত চক্রান্ত ওতঃপ্রোতঃ ভাবে জড়াইয়াছিল।

রাধানাথের সমস্ত খবর পাতিরাম অতি সন্তর্পণে সংগ্রহ করিয়া তাহার আসন্ন পতনের সাংঘাতিক দিনটির প্রতীক্ষা করিতেছিল! যে দিন সে শুনিল, রাধানাথ তাহার পৈতৃক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে এবং এই সাংঘাতিক মনস্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সেইদিন তাহার মুখের ভীষণ হাসি দেখিয়া তাহার কর্ম্মসচিব সীতানাথ পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিয়াছিল।

আফিসের পাট তুলিয়া দিয়া রাধানাথ টালার পৈতৃক বাড়ীতেই ফিরিয়া গেল। কলিকাতার বাড়ী বিক্রয় করিয়া পরিবারবর্গকে টালার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া রাধানাথ একাই কলিকাতায় স্বতন্ত্র বাসা করিয়া থাকিত। কিন্তু এখন কলিকাতার বাসা চালাইবার সামর্থ্যের অভাব বশতঃই তাহাকে টালায় ফিরিতে হইল। বিশেষতঃ কলিকাতায় থাকিয়া মুখ দেখাইবার উপায়ও তাঁহার ছিল না। চারিদিকে দেনা, অসংখ্য পাওনাদার, কারবার বন্ধ, আয়ের আর কোন পথই নাই, অথচ ব্যয়ের সকল পথই মুক্ত।

একটা বিষয়ে রাধানাথ বাবু ছিল অতিশয় ভাগ্যবান তাহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নিভাননী দেবীর মত চৌখস মহিলা খুব অল্পই দেখা যাইত। অপূর্ব্ব রূপ, প্রচুর স্বাস্থ্য, অসামান্য প্রতিভা, প্রখর বুদ্ধি এবং আশ্চর্য্য রকমের অনুমান শক্তি এই মেয়েটিকে সদাসর্ব্বদাই এমনই সতর্ক ও সপ্রতিভ করিয়া রাখিত যে, সংসার ও তাহার পারিপার্শ্বিক খুঁটিনাটি কোনও বিষয় তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না। কিন্তু রাধানাথবাবু কদাচ এমন গুণবতী সাধ্বী পত্নীর সাহায্য প্রার্থনা করে নাই। নিভা বুঝিত, স্বামী বংশগৌরবের অভিমানে কাহাকেও

গ্রাহ্য করিতে চাহে না। তাহার আভিজাত্যের অহঙ্কার এত বেশী যে, নিভা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-কন্যা বলিয়া সে তাহাকে অবহেলার চক্ষুতে দেখিত, কৃপার পাত্রী বলিয়া মনে করিত। স্বামীর এই উপেক্ষা নিভার অন্তরে যেন তীরের মত বিঁধিত, বেদনাহত দেহ মন লইয়া সে তাহার ক্ষুদ্র সংসারটির মধ্যেই নিজেকে মিশাইয়া দিয়াছিল। একান্ত প্রয়োজন না পড়িলে কিম্বা স্বামীর নিকট হইতে আহ্বান না আসিলে সে সহজে সাড়া দিতে চাহিত না। অভিমানক্ষুব্ধ মনের এই বিদ্রোহস্পৃহাকে সে কোনদিন মূর্ত্ত হইতে দেয় নাই, স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রীতি না থাকিলেও, কোনরূপ বিরোধ আছে, বাহিরের কেহ, এমন কি বাড়ীর চাকর দাসীরাও তাহা জানিবার সুযোগ পাইত না।

তথাপি স্বামি-স্ত্রীর এই মনোমালিন্যের সংবাদটুকু সুচারুরূপেই পাতিরামের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়াছিল. স্বামিস্ত্রীর মধ্যে যে একটা ব্যবধানের প্রাচীর উঠিতেছে, এ সংবাদটুকু সংগ্রহ করিয়া পাতিরাম যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিল। রাধানাথের খবর তাহাকে সরবরাহ করিত তাহারই এক অনুচর; রাধানাথ বাবুর নিকট চাকুরী করিয়া সে যে মাহিনা পাইত, রাধানাথ বাবুর সংক্রান্ত দিবারাত্রির যাবতীয় খবর পাতিরামের নিকট দাখিল করিত বলিয়া পাতিরামও তাহাকে সেই বেতন দিত। টালার বাড়ীতেও ঠিক এই ভাবে একটা বালক চাকরকে হাত করিয়া পাতিরাম তাহার দ্বারা রাধানাথবাবুর স্ত্রীর সংক্রান্ত সকল খবর সংগ্রহ করিত।

নিভাকে যদিও রাধানাথ বাবু বৈষয়িক ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রাখিয়াছিল, কিন্তু নিভাদেবী প্রত্যক্ষভাবে এ সম্বন্ধে ঔদাস্য প্রকাশ

করিলেও, গোপনে গোপনে স্বামীর সকল কার্য্যের সংবাদ লইত, স্বামীর পিছনে সময় সময় তাহারও গুপ্তচর ঘুরিত এবং এমন অনেক সংবাদ তাহাকে সংগ্রহ করিয়া দিত যে, শুনিয়া সে অবাক হইয়া থাকিত।

এই অনুসন্ধিৎসা সূত্রেই পাতিরাম ও সীতানাথ তাহার সন্দেহভাজন হইয়া পড়ে। ক্রমে নিজের দাসদাসীদের উপরও তাহার সংশয় নিবিড় হইতে থাকে। ইহার ফলে পাতিরামের নিয়োযিত বালক চর নিভাদেবীর কৌশলে ধরা পড়িয়া যায়।

ঝি চাকরকে চালনা করিতে বা তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া কায গুছাইতে নিভার একটা অসামান্য ক্ষমতা দেখা যাইত। পাতিরামের নিয়োযিত বালক ভৃত্য সকল কথাই নিভার নিকট ব্যক্ত করিয়া দিল। নিভা তাহাকে ধমকাইল না, পীড়ণ করিল না, কিন্তু এমন কৌশলে তাহাকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিল যে, অতঃপর সে যেন যাদুমন্ত্রে বশীভূত হইয়া নিভার কথামত কায আরম্ভ করিয়া দিল; নিভা তাহার দ্বারায় পাতিরাম সম্বন্ধে এমন অনেক খবর সংগ্রহ করিল, যেগুলি তাহার স্বামীর পক্ষে সাংঘাতিক। রাধানাথ বাবু না বুঝিলেও, নিভা বুঝিয়াছিল যে, তাহাদের এত বড় সাংঘাতিক শত্রু আর দুটি নাই। কিন্তু এই শত্রু তখন সকল দিক দিয়া এত প্রবল ও দুর্ব্বার যে, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত কোন শক্তিই তাহাদের নাই।

ঠিক এই সময় সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া এবং বিরাট বাণিজ্যশালার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া রাধানাথ বাবু ভগ্ন দেহমন লইয়া টালার বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

স্বামীর অনিন্দ্যসুন্দর দেহের শোচনীয় পরিনতি দেখিয়া নিভার

অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল। মনের অভিমান এবার দুই হাতে সরাইয়া দিয়া নিভা স্বামীর কাছে ছুটিয়া গেল, আয়ত দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া শুধু ছোট একটি প্রশ্ন করিল—আর কিছু আছে ?

রাধানাথ সে দৃষ্টির সংঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া মৃদুস্বরে কহিল, —না : সব শেষ হয়েছে।

বিদ্যুতের মত ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির একটু ঝিলিক তুলিয়া নিভা কহিল,—তাহলে এবার আমার পালা এসেছে বল !

রাধানাথ অভিভূতের মত নিভার দিকে চাহিয়া রহিল, একটি কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কথাটার অর্থ বোধ হয় সে উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

স্বামীকে নিরুত্তর দেখিয়া নিভা কহিল,—চুপ করে রইলে যে, কথাটা কি বুঝতে পারনি ?

রাধানাথ উত্তর দিল,—না।

নিভা কহিল,—কথাটার মানে হচ্ছে, তোমার দলের বড় বড় রথীরা সবাই ত দেখছি সরে পড়েছেন তোমাকে ফেলে। এখন আমাকেই না হয় সেনাপতির পদে বরণ করলে। পালার কথাটা এই জন্যই বলেছি।

রাধানাথের মুখে হাসির একটু ক্ষীণ আভা ফুটল। কহিল,—ও এই কথা ! কিন্তু কি নিয়ে এখন লড়বে তুমি বল ? আমার যে কিছু নেই।

নিভা কহিল, আমি ত আছি। তবে আমার কথা হচ্ছে, বড়বংশের বড় মেজাজের বড়মানুষীর যত কিছু বিষ ছিল, সমস্তই শেষ করে

ফেলেছ। এখন তুমি বিষ হীন ঢোঁড়া। তোমার এই অবস্থাতেই আমি তোমার ভার নিচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে দেহটাকে শুধু রক্ষা করো। কিন্তু তোমাকে শপথ করতে হবে, আমার অমতে কিছু করতে পারবে না। যদি রাজী থাকো তবে আমি ভার নেব।

রাধানাথ বিস্ফারিত নয়নে নিভার পানে তাকাইয়া কহিল,—আমি তোমার মতলব কিছু বুঝতে পারছি না। আর বোঝবার শক্তিও এখন নেই। যাই হোক, আমি বরাবরই তোমাকে অবহেলা করে এসেছি। আজ সর্ব্বহারা হয়ে তোমারই ওপর আমার ভারটুকু পর্য্যন্ত সঁপে দিচ্ছি। কিন্তু আমার কিছু নেই নিভা, আমি রিক্ত আজ।

নিভা কহিল,—আমি ত শুধু তোমার ভারটুকু নিইনি, ভাবনাটুকুও কেন নিচ্ছি ; কেন তুমি রিক্ত হতে যাবে ? বিয়েররাতে, তার পর কুশণ্ডিকায় কি মন্ত্র পড়ে আমাকে পত্নীর মর্য্যাদা দিয়েছিলে মশাই ? স্বামী কখনো রিক্ত হতে পারে ? আমরা পূর্ণ। তুমি কেন ভাবছো ?

দশ বৎসরের উপর, হইতে চলিল ইহাদের বিবাহ হইয়াছে, তিন চারিটি সন্তানও জন্মিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে এমন প্রাণ খুলিয়া আলাপ কোন দিন হয় নাই। রাধানাথের সর্ব্বাঙ্গে আজ যেন আনন্দের শিহরণ উঠিল। এমন পার্শ্বচারিণী সহধর্ম্মিণীর সাহচর্য্য সে কোনদিন প্রার্থনা করে নাই !

অতঃপর নিভাদেবী সুকৌশলে স্বামীর বিগত কয়েক বৎসরব্যাপী কর্ম্মজীবনের সকল কথাই একটি একটি করিয়া জানিয়া লইল।

## ২৩

যেদিন মেনকার মামলার নিষ্পত্তি হইল, তাহার পরদিন প্রত্যুষে রাধাশ্যাম হাতীর স্বাক্ষরযুক্ত এই মর্ম্মে একখানি পত্র সৃষ্টিধর দাসের হস্তগত হইল,—

সবিনয় নমস্কার নিবেদন

আপনার দৌহিত্র শ্রীমান কৃত্তিবাস কোলের সহিত আমার কন্যার বিবাহের যে কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছিল, এই পত্র দ্বারা তাহা রহিত করা যাইতেছে। কিরূপ অপ্রীতিকর কারণপরম্পরা আমাদিগকে এ কার্য্যে বাধ্য করিয়াছে, তাহা আপত্তি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। নিবেদন মিতি

বিনয়াবনত

শ্রীরাধাশ্যাম হাতী

সৃষ্টিধরও এইরূপ কিছু প্রত্যাশা করিতেছিল। চিঠিখানা পড়িয়াই সে অস্থির ভাবে কক্ষ মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। কৃত্তির উপরু তাহার ক্রোধ আজ বুঝি ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল। কৃত্তির দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় সেও কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং মামা সৃষ্টিধরের দিকে চাহিয়া সহজ কণ্ঠেই প্রশ্ন করিল,—হাটখোলা থেকে লোক এসেছিল না?

বোমা যেন এবার ফাটিয়া গেল। গলার স্বর সপ্তমে তুলিয়া সৃষ্টিধর

কহিল,—হ্যাঁ এসেছিল, দড়ি আর কলসী দিয়ে গেছে—তাই নিয়ে নিজের পথ দেখো। বেরোও এখান থেকে বলছি।

কৃত্তিবাস এ অপমান পরিপাক করিতে পারিল না, সেও জোর গলায় কহিল,—মুখ সামলে কথা কও বলছি,—বুড়ো হয়ে ভীমরতি ধরেছে তা বেশ বুঝতে পারছি। তোমাকে এবার পিঁজরেপোলে পাঠিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হব।

তবে রে হারামজাদা—বলিয়া বৃদ্ধ কৃত্তির দিকে ছুটিয়া গেল। কৃত্তিও ঘুসি পাকাইয়া উত্তর দিল,—এগিয়ে আয় বুড়ো জাম্বুবান!

লোকজন চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া উভয়কেই নিরস্ত করিল। একটু পরে কৃত্তিবাস বৃদ্ধকে শাসাইতে শাসাইতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। সৃষ্টিধর দরোয়ানকে হুকুম দিল,—খবরদার ও হারামজাদা যেন দেউড়ীর ভেতরে না ঢোকে।

ইহার দুই দিন পরেই হাটখোলার রাধাশ্যাম হাতীর জুড়ী গাড়ী সৃষ্টিধর দাসের বাড়ীর ফটকে আসিয়া থামিল। হাতী মহাশয়কে হঠাৎ এভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া দাস মহাশয় চমৎকৃত হইয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি উঠিয়া এই অতি সম্মানভাজন ধনী ব্যক্তিটিকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। আগমনের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেও তাহার মনে কুণ্ঠা উঠিতেছিল।

রাধাশ্যাম বাবু নিজেই তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন,—শ্রীমান শ্রীবাস বিশ্বাসের সঙ্গে আমার কন্যার বিয়ের সম্বন্ধ চলছিল। পাত্রের অবস্থা, স্বভাবচরিত্র, আচার ব্যবহার ইত্যাদি সব জেনে আমাদের খুবই পছন্দ হয়। কথা যখন

অনেকটা এগিয়ে পড়ে, তখন ছেলেটি জানায় যে আপনারই সে দৌহিত্র কিন্তু আমরা জানতাম কৃত্তিবাসই আপনার একমাত্র দৌহিত্র—যার স আমার কন্যার সম্বন্ধ আগে হয়েও ঘটনাচক্রে ভেঙ্গে যায়। শ্রীবাস কি বলছে, সে ও আপনার দৌহিত্র এবং আপনিই তার অভিভাবক আপনার সম্মতি ভিন্ন এ বিবাহ হতে পারে না। এই জন্যই আপনা কাছে আসা।

অপ্রত্যাশিত আনন্দের উচ্ছ্বাসটুকু সযত্নে চাপিয়া সৃষ্টিধর কহি —শ্রীবাস ঠিকই বলেছে, মিছে কথা বলবার ছেলে সে নয় সে হচ্ছে আমাদের জাতের গৌরব, যাকে বলে খাঁটি সোনা শ্রীবাসের বাবার সঙ্গে আমার বনিবানও ছিল না। সে আমার কাছে কি পায় নি, শ্রীবাসও কখনও আমার কাছে কিছু চায় নি। নিজের চেষ্টাে সে বড় হইয়াছে। কৃত্তিবাসের কীর্ত্তি প্রকাশ হলে আমি তাকে ত্যা করেছি। আমার সমস্ত সম্পত্তি এখন শ্রীবাসের তত্ত্বাবধানেই আছে

রাধাশ্যাম কহিলেন,—কিন্তু শ্রীবাস এসব কথা আমাকে কিছু ব নিত!

সৃষ্টিধর কহিল,—যেটুকু আপনাকে বলবার, সে শুধু তাই বলেছে এই তার স্বভাব। এমন ছেলে আমাদের সমাজে মেলে না।

রাধাশ্যাম করযোড়ে কহিলেন,—আমার আগেকার ধৃষ্টতা মার্জ্জন করে এখন শ্রীবাসকে ভিক্ষা দিন, অর্থাৎ আমার কন্যাটিকে দয়া করে নিন

সৃষ্টিধর কহিলেন,—আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন! শ্রীবাস ভাগ্যবান তার অদৃষ্টে যা লেখা আছে, কে খণ্ডাবে! ভগবান যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য।

অতঃপর এই অপ্রত্যাশিত যোগাযোগের কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেল।

কিন্তু এই সব যোগাযোগের উপর পাতিরামের কিরূপ প্রভাব ছিল ও তাহার স্থির মস্তিষ্ক প্রসূত বুদ্ধি কি ভাবে এই অঘটন ঘটাইয়াছিল—বৃদ্ধ সৃষ্টিধর বা তাহার দৌহিত্র কৃত্তিবাস তাহার সন্ধান পাইয়াছিল কি ?

## ২৪

কিন্তু সহর ছাড়িয়া সহরোপকণ্ঠে টালার বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া এবং সহধর্ম্মিনীর সাহায্য পাইয়াও রাধানাথ তাহার পাওনাদারদের শ্যেনদৃষ্টি হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। অতীতের কথা স্মরণ করিয়া যে কতিপয় হৃদয়বান মহাজন রাধানাথ বাবুকে অব্যাহতি দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, পাতিরাম আধাকড়িতে তাহাদিগের নিকট হইতে রাধানাথ বাবুর দেনা-পত্র কিনিয়া লইল। কথাটা রাধানাথ ও তাহার স্ত্রী নিভা উভয়েই শুনিল।

রাধানাথ কহিল,—এই পাজীটাই হচ্ছে আমার অদৃষ্টপথের শণি। ওর জন্যই আমি আজ পথে বসেছি।

নিভা কহিল,—পথে বসেছ তুমি নিজের দোষে। ও লোকটা নিজের বুদ্ধি চালিয়ে কায গুছিয়েছে, কিন্তু তুমি চলেছ পরের বুদ্ধিতে। তোমার বাবার সঙ্গে এর ব্যবহার সব জেনেও তুমি শক্ত হওনি—এইটুকুই আশ্চর্য্য। আমার মনে হয়—তুমি ওকে চিনতে পারোনি, কিন্তু তোমার বাবা ওকে চিনেছিলেন।

রাধানাথ বাবু কহিল,—ঐ সয়তানটাকে আমি আবার চিনিনি!

নিভা কণ্ঠে জোর দিয়া কহিল,—না। যদি চিনতে, তাহলে তোমার দোকানের একটা পেরেক পর্য্যন্ত ওকে বেচতে না। তুমি ত জোর করেই তোমার ঘরের লক্ষ্মীকে ওর ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছ!

রাধানাথ কহিল,—আমি সেটা বুঝতে পারিনি।

নিভা কহিল,—তোমার পার্শ্বদরা তোমাকে বুঝিয়েছিল, পোড়ো মালগুলো বেচে বোকাকে খুব ঠকাচ্ছ। ঠকাবার এই প্রবৃত্তিটুকু তোমার মনে জেগেছিল বলেই ঠকেছ তুমি, সে ঠকেনি।

রাধানাথ কহিল,—কিন্তু আশ্চর্য্য এই, আমার সর্ব্বস্ব নিয়েও নিশ্চিন্ত নয়। আমি ডুবতে বসেছি দেখেও সে কিনা তার ওপর বাঁশ দিয়ে চেপে ধরছে। আমার দেনাগুলো কিনে নিয়ে আমাকে জব্দ করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

নিভা কহিল,—কেন এ সব করছে তা জান? ধরতে পেরেছ কিছু?

রাধানাথ কহিল,—আর কি! টালার এই বাড়ীখানায় আমার যে অংশটুকু আছে, তার ওপরেই ওর টাঁক; এইটে নেবার জন্যই—

কথায় বাধা দিয়া নিভা কহিল,—না। তুমি ভুল ভেবেছ। এ বাড়ীর ওপর ওর টাঁক নয়।

—তবে?

—এই বাড়ীতে একটি দিন মাত্র ও ঢুকেছিল, কর্ত্তা তখন বেঁচেছিলেন। গাড়ী চ'ড়ে, আমীরের মত সেজে কর্ত্তার ঘরে এসেছিল। ওর বাপের জন্য—ওকে মানুষ করবার জন্য কর্ত্তা যে খরচ পত্র করেছিলেন—ও সে সব শোধ করবার জন্য চেকবই পর্য্যন্ত খুলেছিল। কিন্তু কর্ত্তা তখন হেসে

বলেছিলেন—আমার ঋণের টাকা তোলাই থাক তোমার কাছে পাতিরাম। এর পর যদি কখনো তোমার কাছে আমার বা আমার ছেলেদের হাত পাতবার প্রয়োজন আসে, তখন এই ঋণ শোধ দিয়ো—তার আগে নয়।—কর্ত্তার সে কথা পাতিরাম ভোলেনি। তোমার ঐ দুর্দ্দশা নিজের চোখে দেখেও তার চোখ দুটো সার্থক হয়নি—কেননা, কর্ত্তা বেঁচে নেই, তিনি তাঁর ছেলের দুর্দ্দশা দুচোখে দেখতে পেলেন না। তার এখন দুরাশা—

নিভার কণ্ঠস্বর এখানে সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল, বাকি কথাটা আর বাহির হইল না।

রাধানাথ মোহাবিষ্টের মত এই সময় কহিয়া উঠিল,—দুরাশা—

গলাটা পরিষ্কার করিয়া নিভা কহিল,—হ্যাঁ। সে চায়—তার বাড়ীতে বসে এর শোধ তুলতে।

রাধানাথ সন্দিগ্ধস্বরে প্রশ্ন করিল,—তার মানে?

নিভা উত্তর দিল,—তার কাছে গিয়ে গলায় কাপড় দিয়ে আমি চাইব ভিক্ষা তোমার জন্য।

তীরের বেগে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রাধানাথ বাবু কহিল,—কি বললে? ও! একথা কেমন করে তুমি—ও!

মাথাটা সজোরে চাপিয়া রাধানাথ পুনরায় বসিয়া পড়িল।

নিভা কহিল,—কথাটা আমি বানিয়ে বলিনি জেনো। কিন্তু এই তার মতলব। এই জন্যই সে তোমাকে বেড়াজালে ঘেরবার মতলব করেছে। এর পর আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবে। শেষে হবে বলিদানের ব্যবস্থা। তখন আমার অবস্থাটা কি হবে—সেটাও সে অনুমান করে নিয়েছে।

উত্তেজিত কণ্ঠে রাধানাথ কহিল,—কালই আমি ইনসলভেন্সী নেব।

নিভা দৃঢ়স্বরে কহিল,—না, তা হবে না। সেটা পৌরুষের কথা নয়। তোমাকে নিজের পায়েই দাঁড়াতে হবে, তুমি যে টালার অমুক মুখুজ্যের ছেলে—এ কথা মনে রাখতে হবে।

এই সময় বাড়ীর ঝি আসিয়া খবর দিল,—কিত্তীবাস বাবু এসেছেন দেখা করতে।

স্বামীর মুখে অন্যান্য প্রসঙ্গের সহিত এই অন্তরঙ্গ সুহৃদটির কথাও নিভা শুনিয়াছিল। নামটা শুনিয়াই খপ করিয়া কহিল—ভালই হয়েছে। ওর ত অবস্থা এখন ভালো, পাতিরাম পাকড়ের সঙ্গে টক্কর দিতে ওকে নিয়ে মাছের যে কারবার করেছিলে, সে বাবদে ওর কাছে পাওনা টাকাগুলো এই সময় চেয়ে ফ্যালো। যদি নিজে না পারো, আমার ওপর ভার দাও—আমি আদায়ের ব্যবস্থা করছি।

রাধানাথ কহিল,—কি সর্ব্বনাশ! আমার দুর্দ্দশা দেখে শেষে কি তুমি লোকের সামনে বেরিয়ে তাগাদা করবে?

নিভা কহিল,—লোকের কাছে গিয়ে গলায় কাপড় দিয়ে ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে—লোকের সামনে বেরিয়ে পাওনা টাকা চাওয়া কি দোষের? তোমার সমস্ত ভার আমার ওপর দিয়েছো, একথা যেন ভুলে যেও না।

বাহিরের সেই বিশাল বৈঠকখানা এখনও অতীতের আদর্শটুকু লইয়া পড়িয়া আছে। ঘরজোড়া তক্তপোষের উপর ধূলিমলিন জীর্ণ সতরঞ্চিখানি এখনও বিস্তৃত; আর উপরের দুগ্ধফেননিভ যাজিম ও তাকিয়াগুলির চিহ্নও নাই।

কৃত্তিবাস এই ঘরে বসিয়া রাধানাথের প্রতীক্ষা করিতেছিল। আজ তাহার বেশভুষার পারিপাট্য নাই, মাথার চুলগুলি রুক্ষ, চক্ষু দুইটী নিষ্প্রভ, মুখখানা বিবর্ণ। রাধানাথ ঘরে ঢুকিয়া কৃত্তিবাসের এই নিষ্প্রভ চেহারা ও কদর্য্য বেশভূষা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল

কৃত্তিবাসও রাধানাথকে দেখিয়া অস্বাভাবিক কণ্ঠে উচ্ছাসের কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—আর দেখছ কি রাধু,—যত চিল উড়ে গেল, বেঁড়ে চিল ধরা পড়ল! তুমি এসেছ অজ্ঞাতবাসে, আর আমি ঘুরছি পথে পথে।

রাধানাথ কহিল,—ব্যাপার কি?

কৃত্তিবাস কহিল,—সে অনেক কথা। তবে মোটামুটি খবরটা এই—মামা দিয়েছে গলাধাক্কা, মাসতুতো ভাই শ্রীবাস বসেছে আমার জায়গায়। সেই এখন মামার এষ্টেটের অছি, আর আমি হয়েছি—এঁটো পাতার সামিল। হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছি, শৃগাল কুকুরে চাটছে।

বিস্ময়ের সুরে রাধানাথ কহিল,—সে কি হে, চাকা একবারে ঘুরে গেল? তুমিই ত মামার বিষয়ের অছি ছিলে, শ্রীবাস এলেও তোমার ভাগ যাবে কোথায়?

কৃত্তিবাস কহিল,—গেছে গোল্লায়। কথায় আছে না—

যদি হয় সোনার ভাণ্ডারি
তবু ধরে লোহার কাটারি!

আমার দশাও তাই। শ্রীবাসকে ধরেছিলুম, সে বলে—পাতিরাম পাকড়েকে ধরো; তার সঙ্গে চালাকী করতে গিয়েই তুমি সর্ব্বস্ব হারিয়েছ। আমার ওপর তার হুকুম—ত্রিসীমায় এলেই চাবুক পেটা করে তাড়াতে হবে। নইলে সে চাবুক আমারই পীঠে পড়বে।

শিহরিয়া উঠিয়া রাধানাথ কহিল,—বল কি !

কৃত্তিবাস কহিল,—মেনকার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ, মামলা, মামার সাথে মনান্তর, এ সমস্তর গোড়া হচ্ছে ঐ পাকড়ে। এমন কি বিয়েটা পর্য্যন্ত বিগড়ে দিয়েছে। শ্রীবাস শুধু মামার সম্পত্তিটা ছিনিয়ে নেয়নি—আমার হবু কনেটাকে পর্য্যন্ত হাতিয়েছে।

—তুমি কি এতদিন নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে ?

—আমি ভাবতে পারিনি রাধু, মানুষ এতটা সাংঘাতিক হ'তে পারে ! একটা লোককে জব্দ করবার জন্য এমন করে বেড়াজাল দিয়ে জড়িয়ে ধরে ! কিন্তু আমিও কৃত্তিবাস কোলে, চুপ করে সইব না, এর শোধ নেব—ঠিক পাণ্টা জবাব দেব।

—কিন্তু তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছ, ঐ দেহখানা ছাড়া আর কিছু নেই। কি করবে ?

—সেই জন্যই ত তোমার কাছে এসেছি। এখন তুমি মনে করলে আমাকে রক্ষা করতে পারো ; আমাকে রক্ষা করা মানে—তোমারও পেছনে একটা শক্তিকে খাড়া করা।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রাধানাথ কহিল,—কিন্তু আমার অবস্থা যে তোমার চেয়ে খুব বেশী ভালো, তা ভেব না। তবে তুমি হয়ত একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে, আমার মাথা রাখবার এই পুরানো ভিটেটা আছে। কিন্তু কতদিন থাকবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। চার দিকে দেনা, কারবার বন্ধ, হাত খালি। কাজেই, আমি তোমাকে কি করে রক্ষা করতে পারি ?

কৃত্তিবাস কহিল,—তোমার অবস্থাও আমি সব জানি। আমি

তোমার কাছে টাকা চাইতে আসিনি। কিন্তু এমন একটা পোড়া টাকার সন্ধান এনেছি—যা থেকে এ দুঃসময়ে তোমারও কিছু উপকার হয়, আর আমিও খাড়া হবার একটা উপায় পাই।

কথাটা রাধনাথকে তৎক্ষণাৎ চমকিত করিয়া দিল। পোড়ো টাকার কথা তাহার কানে বাজিতেই সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কৃত্তিবাসের মুখের দিকে চাহিল।

কৃত্তিবাস কহিল,— আমার এক মুরুব্বী আছে, তুমি তাকে জানো। তার নাম অনুকূল তলাপাত্র।

নামটা শুনিয়াই রাধানাথের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কৃত্তিবাস বলিতে লাগিল,--তার কাছে গিয়েছিলাম কিছু টাকার আশায়। লোকটার কথা তোমার বোধ হয় মনে আছে ?

রাধানাথের মুখখানা সহসা শক্ত হইয়া উঠিল, রুক্ষস্বরে সে কহিল— এক সময় খুবই মনে ছিল, কিন্তু ইদানীং ভুলেই গিয়েছিলুম। তুমি এই লোকটাকে খাড়া করে আমার আঠারো হাজার টাকা বরবাদ করেছিলে।

প্রতিবাদের ভঙ্গীতে কৃত্তিবাস কহিল,—বরবাদ করব কেন? তোমাকে একটা প্রপারটি কিনে দিয়েছিলুম। তলাপাত্র তোমাকে একটা গুদোম বোঝাই মাইকা আর তার এলাকার সমস্ত মাইন আঠারো হাজার টাকায় বেচেছিল। মজুত মাল আর ফ্যালোয়া মাইনগুলো তুমি ত জলের দরে কিনেছিলে হে, তারপর দশ জন লোকের কথা শুনে তাতে আর হাত দিলেই না, ফেলেই রাখলেন; এর জন্য তলাপাত্র দায়ী নয়, আমিও দোষী নই।

রাধানাথ তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল,—দোষী নও তুমি? তলাপাত্রের সঙ্গে

ষড় করে তুমি আমাকে রীতিমত ঠকিয়েছিলে! ফেলে রেখেছিলুম কি সাধ করে? স্যাম্পল ব'লে যে মাইকা দেখালে—কাচের মত ধবধব করছে সাদা, কিন্তু গুদোম বোঝাই মালগুলোর অবস্থা দেখেই চক্ষুস্থির! সমস্তই ডিস্‌কলার, লালচে রঙ, বাজারে অচল, কোন দামই উঠলো না: কাযেই গুদোম বোঝাই হ'য়ে পড়ে আছে। তা ছাড়া, এক্সপার্টকে দিয়ে মাইনগুলো যাচিয়ে দেখেছি, এই এক ধাঁজের মাইকাই বেরুবে। সাদা মাইকা ও তল্লাটেই নেই। এই সব জেনেই, তলা পর্য্যন্ত চুঁয়ে গেছে বুঝেই তলাপাত্র তোমাকে মুরুব্বী ধরে এই বোকা বামুনের মাথায় হাত বুলিয়েছিল। তুমি আজ আবার তাকে ধরেচ মুরুব্বী, এতদিন কোন্ চুলোয় ছিলেন তিনি, এখন কি বলতে চান?

কৃত্তিবাস কহিল,—তিনি তাঁর বেচা জিনিসটা ফের কিনে নিতে চান।

বিস্ময়ে রাধানাথের মুখে বাক্য ফুটিল না। নিবদ্ধ দৃষ্টিতে কৃত্তিবাসের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

কৃত্তিবাস কহিল,—তুমি হয়ত ভাবছ, আমি মিছে কথা বলে তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছি, বা ঠাট্টা করছি; কিন্তু আসলে তা নয়। তিনি জেনে এসেছেন, তোমার গুদোমে মজুত মাল ঠিক আছে। তিনি এখন খদ্দের পেয়েছেন ঐ মাল কেনবার। যদি তুমি রাজী থাক, আজই রেজিষ্টারী হতে পারে। তিনি যে দামে বেচে ছিলেন, সেই দামেই কিনে নিতে রাজী আছেন। ইচ্ছা করলেই তুমি হাতে হাতে আঠারো হাজার টাকা পেতে পারো।

আনন্দের উত্তেজনায় রাধানাথের দুই চক্ষু যেন জল জল করিয়া উঠিল। আঠারো হাজার টাকা! যাহার হাতে আজ আঠারো টাকাও সম্বল নাই,—সুসময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার সময় যে

টাকা খেয়ালের বসে এক কথায় ঢালিয়া দিয়াছিল, টাকাগুলা জলে পড়িয়াছে জানিয়াও গ্রাহ্য করে নাই, এবং বর্ত্তমানে যাহা আবর্জ্জনার স্তূপের মতই উপেক্ষিত ভাবে সুদূর হাজারিবাগ অঞ্চলে পড়িয়া একটা বাজে খরচা সূত্রে দেনার সৃষ্টি করিতেছিল, আজই তাহা হইতে আঠারো হাজার টাকা উসুল হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে! উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে রাধানাথ কহিল,—তোমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই কৃত্তি, যদি তোমার কথা সত্যি হয় তাহলে বুঝবো, তলাপাত্রের পক্ষ থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করতে এসেছ। এই আঠারো হাজার—আমার কাছে এখন আঠারো লাখ! তাহলে তলাপাত্রই ফের কিনছে।

কৃত্তিবাস কহিল,—যেই কিনুক না কেন, তোমার ত টাকা নিয়ে কথা। তলাপাত্র নিজের নামে না কিনে আর কারুর নামেও কিনতে পারে। তাহলে বায়না পত্র হবে, না রেজিষ্টারী আফিসেই একবারে—

রাধানাথ ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল,—কি দরকার বায়না-পত্রের; সেইখানেই পেমেন্ট হবে; আজই যখন রেজিষ্টারী হবে বলছ—

বাড়ীর ঝি সত্যবতী ঠিক এই সময় দরজার পাশ হইতে কহিল,—বাবু, মা বলে পাঠালেন—আজ দিন ভাল নয়, কথা কিছু পাকা করবেন না; ওঁকে আজ যেতে বলুন।

কথাটা অপ্রত্যাশিতভাবে উভয়কেই স্তব্ধ করিয়া দিল। মুখখানা রীতিমত কুঞ্চিত করিয়া কৃত্তিবাস কহিল,—ব্যাপার কি হে রাধু! মা আবার কোথা থেকে এলেন, এতকাল ত ছিলেন না!

রাধানাথ কহিল,—ছিলেন বরাবরই, তবে আমোল পান নি। কিন্তু এখন হালে পানি না পেয়ে তাঁকেই দখল দিয়েছি—বুঝলে?

কৃত্তিবাস ভ্রূভঙ্গী করিয়া বিদ্রূপের সুরে কহিল,—একেই বলে শিঙ্গা হারিয়ে কাঁকুড়ে ফুঁ! তবে কি জানো, শুভকার্যে দিনক্ষণ নেই, সেরে ফেলাই ভালো।

রাধানাথ কহিল,—বেশ ত, না হয় কালই হবে। একদিনে আর কি এমন ক্ষতি হবে বল! তাহলে তুমি কাল এই সময়েই এসো।

ইহার পর আর কথা চলে না। অত্যন্ত অপ্রসন্ন ভাবেই অগত্যা কৃত্তিবাসকে উঠিতে হইল।

রাধানাথও বাড়ীর ভিতরে যাইবার জন্য উঠিয়াছে, এমন সময় নিভাকে দ্বারদেশে দেখিয়া, সে পুনরায় তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িল, দুই চক্ষুর সপ্রশ্নদৃষ্টি তাহার দিকে ফেলিয়া কহিল,—ব্যাপার কি, এখানে পর্য্যন্ত ছুটে এসেছ!

নিভা কহিল,— তোমার পিছু পিছুই এসেছিলুম! নইলে অমন করে বাধা দিতে পারতুম! কিন্তু তুমি ত বেশ লোক, সব ভার দিয়ে এসে— তারপর নিজেই ভারি হ'য়ে বসেছ। আমি বাধা না দিলে আজই ত সব শেষ করে ফেলতে।

রাধানাথ কহিল,— তাতে মন্দ ত কিছু হত না। আবর্জ্জনার মত যে জিনিস পড়ে আছে, তা থেকে যে আজ এতগুলো টাকা উঁকি দেবে— তা কল্পনাও করিনি।

মুখখানা কঠিন করিয়া নিভা কহিল,—তোমার ব্যবসা করতে নামাই ভুল হয়েছিল। এখনো তোমার বুদ্ধি খোলে নি।

রাধানাথ অবাক হইয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিভা

কহিল, —ওগুলো আবর্জ্জনা কে তোমাকে বললে? ঘর থেকে আঠারো হাজার টাকা বার করে কেননি?

রাধানাথ কহিল,—লাভের আশায় কিনেছিলুম, কিন্তু ও থেকে একটি পয়সাও উসুল হয় নি, বরং ওর উপরে আরো পাঁচ ছ হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে। সবাই বলেছে—টাকা দিয়ে জঞ্জাল কিনিছি।

নিভা কহিল,—সবাইয়ের বুদ্ধি নিয়েই বরাবর কারবার করেছ, নিজের বুদ্ধি ত কোনদিন চালাও নি। দোকানের লোহালকড়গুলোও একদিন জঞ্জাল মনে করে পাতিরামের আড়তে তুলে দিয়েছিলে। কিন্তু এটুকু তোমার বুদ্ধিতে এল না কেন—যে জঞ্জালগুলো এতকাল হাজারিবাগের জঙ্গলে জমা হয়ে ছিল—খনির খাজনা গুনেছ; লোকজনের মাইনে দিয়ে আসছ বরাবর—আজ সেগুলো কিনতে তোমার বাড়ী বয়ে লোক আসে কেন?

রাধানাথের নিষ্প্রভ দুইটি চক্ষু কথাটার সঙ্গে সঙ্গে যেন সহসা দীপ্ত হইয়া উঠিল।

নিভা আড়চোখে তাহা লক্ষ্য করিয়া দৃপ্তস্বরে কহিল,—যে লোক একদিন তোমার দোকানের জঞ্জালগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে তার ওপরে লক্ষ্মীর ভাঁড়ার পেতেছিল হাজারিবাগের এই পোড়ো জঙ্গলটা সাফ করতে সেই লোকই কৃত্তিবাসকে পাঠিয়েছে, একথা তুমি ধারণা করতে পারো?

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া রাধানাথ কহিল,—বল কি? এর গোড়ায়ও পাতিরাম! কৃত্তিবাস তার কাছ থেকে—না, এ অসম্ভব!

নিভা কহিল,—এক ঘণ্টার ভেতরেই আমি তোমাকে সঠিক খবর

দেব। আমার লোক ঐ পাজীটার পিছু নিয়েছে, তার ফিরতে দেরী হবে না। তবে একটা কথা বলে রাখছি,—এ জঞ্জালগুলো বেচা হবে না। লাখ টাকা পেলেও নয়।

রাধানাথ নির্ব্বাক বিস্ময়ে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু এই বিস্ময়টুকু স্ত্রীর সম্বন্ধে তাহার চিত্তে শ্রদ্ধার একটা গভীর রেখা দাগিয়া দিল, যখন সে শুনিল, কৃত্তিবাস টালা হইতে বরাবর নিকিরি-পাড়ায় পাতিরাম পাকড়ের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ বাড়ীর চাকরকে বলিয়া দিল, ঐ লোকটা এ বাড়ীর দেউড়ীর সামনে এলে যেন গলা ধাক্কা দিয়ে বিদায় করা হয়।

## ২৫

মহাসমারোহে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। শ্রীবাসের বাড়ী হইতেই সকল কার্য্য সমাধা হইল। শ্রীবাসের আশ্রিতরূপেই কৃত্তিবাস দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ভবিতব্যের এই রহস্যময় খেলা দেখিল।

রাধাশ্যাম হাতী প্রতিশ্রুতি মত শ্রীবাসকে নিকিরিপাড়ার সম্পত্তি যৌতুক স্বরূপ দানপত্র করিয়া দিলেন। সপ্তাহের মধ্যে শ্রীবাস পাতিরামের নামে নিকিরিপাড়ার ইজারাদারী লেখা পড়া করিয়া দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিল। কথাটা অপ্রকাশ রহিল না। শ্বশুর ও মাতুলের তরফ হইতে এ সম্বন্ধে যখন প্রশ্ন উঠিল, শ্রীবাস তখন সুস্পষ্ট ভাবে

জানাইল;—আমার দাদা ও মামা দুজনেরই ঋণ পরিশোধের জন্য এটা আমি করেছি।

কথাটা তখন প্রকাশ করিয়াই তাহাকে বলিতে হইল যে, কি ভাবে পাতিরাম পাকড়ে একদা এই সম্পত্তির জন্য লক্ষাধিক টাকা ন্যস্ত করিয়াও বঞ্চিত হইয়াছিল। শ্রীবাস দৃঢ়তার সহিত জানাইল, পাতিরাম বাবুই আমার সৌভাগ্যের সোপান। তিনিই আমাকে হাতে ধরে লক্ষ্মীর দেউলে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ক্ষতিপূরণ করে আমি আজ যে আনন্দ পাচ্ছি তার তুলনা নেই।

কথাটা শুনিয়া কৃত্তিবাসের মুখখানা শুধু কালো হইয়া গেল, তাহা ছাড়া আর সকলেই অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। ঘটনার কথা সৃষ্টিধর দাস এবং রাধাশ্যাম হাতীরও অবিদিত ছিলনা, এভাবে তাহার মীমাংসা হওয়ায় তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন।

এদিকে নিক্রিরিপাড়ার বড় রাস্তার উপর পাশাপাশি যে দুইখানি বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছিল, একদিন সকলে দেখিল, তাহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে, গৃহ প্রবেশের আয়োজন চলিয়াছে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেদিন শীতলা মন্দিরের সম্মুখে চাতালটির উপর বসিয়া গুণগুণ স্বরে মায়ের নাম গাহিতেছিলেন। এমন সময় আস্তে আস্তে পাতিরাম তাঁহার সম্মুখে আসিয়া নত মস্তকে প্রণাম করিল; নগ্ন পদ উন্মুক্তদেহ পাতিরামকে এভাবে দেখিয়া তিনি বিস্ময়ের সুরে কহিলেন,—পাতিরাম যে! অনেক দিন দেখিনি, কেমন আছ বাবা?

সবিনয়ে পাতিরাম কহিল,—যেমন আপনার আশীর্ব্বাদ, ভালই আছি।

— কাষ কারবার চলচে ভাল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভালই চলেছে। একটা কাযের জন্য আপনার কাছে এসেছি।

দুই চক্ষুর দৃষ্টি পাতিরামের মুখের উপর ফেলিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, —বল বাবা, বল ?

দুই হাত যুক্ত করিয়া পাতিরাম কহিল,—আপনার বোধ হয় মনে আছে, একদিন এই পাড়াটার ইজারাদারী কিনে এই মন্দিরের সামনে ইট গাড়তে এসেছিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে বাধা পেয়ে মুখখানা কালো করে ফিরে গিয়েছিলাম ?

মুখে বিষাদের চিহ্ন ফুটাইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—খুব মনে আছে বাবা, আর সেটা মনে হলেই বুকখানা আমার সত্যিই দুলে ওঠে। একরাশি টাকা বরবাদ হয়ে গেল।

পাতিরাম কহিল,—কিন্তু আপনার আশীর্ব্বাদের জোরে সে টাকা বরবাদ হয়নি—নিকিরিপাড়ার ইজারাদারী আমি ফিরে পেয়েছি।

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গদ্‌গদ্ স্বরে চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন, বল কি—এ যে বড় সুসংবাদ বাবা! জয় মা তারা ব্রহ্মময়ী! আমার বুকখানা আজ আহ্লাদে দুলে উঠছে। তাই বুঝি দখল নেবার জন্য—

বাধা দিয়া পাতিরাম কহিল,—সে বয়স আর সে দুষ্টুমী বুদ্ধির এলাকা যে আজ পেরিয়ে এসেছি চক্রবর্ত্তী মশাই! দখল পেয়েছি কাগজে পত্রের, তার বেশী আর এগুচ্ছিনা। তবে আমার একটা বদ স্বভাব কি জানেন, যেটা ধরি বা একবার করি সেটাকে খতম না করে ছাড়তে পারি না। সেবার ইট গাড়তে বুক বেঁধেছিলুম। কিন্তু ঘটে ওঠেনি!

এবার এ চত্বরে আর ইট গাঁথবার হাঙ্গামা করিনি, রাস্তার ধারে দুখানা বাড়ী উঠেছে বোধ হয় দেখেছেন—

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—সদর রাস্তার ওপর হাল ফ্যাসানের দুখানা বাড়ী—কে না দেখেছে বল ? শুনিছি, তুমিই ত তৈরী করাচ্ছিলে বাবা ?

হাত দুখানি যুক্ত করিয়া পাতিরাম এবার বিনীতভাবে কহিল,—একটা আমার প্রার্থনা আছে, সেটি জানাতেই এসেছি। গৃহ প্রবেশের একটি দিন দেখে দিতে হবে, আর এর জন্য নেম কর্ম্ম যা কিছু করবার সে সমস্তই আপনাকে করে কর্ম্মে নিতে হবে।

উল্লাসের সুরে চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—এ ত আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বাবা ! তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হোক, ঘর বাড়ী কর, ভোগ কর, আমি উপলক্ষ হয়ে কায কর্ম্ম করি—এর চেয়ে বড় আনন্দ আমার ত আর কিছুতে নেই বাবা ! বেশ, আমি দিন দেখে দিচ্ছি।—দিন দেখিবার পর পাতিরাম আর এক প্রার্থনা জানাইল;—গৃহ প্রবেশের দিন পাতিরাম যেমন পুরাতন বাড়ী হইতে শোভাযাত্রা করিয়া যথারীতি নূতন বাড়ীতে যাইবে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়কেও তেমনই সপরিবার সেই সঙ্গে পার্শ্বের বাড়ীখানিতে শোভাযাত্রা করিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। ঐ বাড়ীখানি সে দেবসেবার উদ্দেশে নির্ম্মাণ করাইয়াছে, দেবতার প্রতিনিধি স্বরূপ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নামেই গৃহ প্রবেশের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইবে।—পাতিরামের এই প্রার্থনাও চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বীকার করিয়া লইলেন।

খুব ঘটা করিয়াই গৃহ প্রবেশের উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। শাস্ত্রানুমোদিত বিধানে শোভাযাত্রা করিয়া পাতিরামের একান্ত আগ্রহে

প্রথমেই সপরিবার চক্রবর্ত্তী মহাশয় নূতন বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তাহার পরেই পাতিরামের শোভাযাত্রা। পাতিরামের মাতার আমন্ত্রণে মনসরামের কন্যা পার্ব্বতী এবং পাড়ার কতিপয় বধূ ও বালক বালিকা এ পক্ষের শোভাযাত্রার অঙ্গপুষ্ট করিল। গৃহপ্রবেশের পর ভূরি ভোজের বিপুল আয়োজন সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিল।

অপরাহ্নের দিকে পাতিরামকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—বাবা, আমরা এবার মন্দিরে যাই—

পাতিরাম বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল,—সেকি! নিজের মন্দিরেই ত আপনি এসেছেন, আবার কোন্ মন্দিরে যাবেন? গৃহ প্রবেশ ক'রে আবার বেরুতে আছে নাকি? শাস্ত্রের এখবরটুকু বুঝি আমি রাখিনা মনে করেন? যান্-যান্ মা-ঠাকরুণকে বলুন--ঘর দোর সব বুঝে নিতে, এখন থেকে এই খানেই থাকতে হবে, এটাই হ'ল আপনাদের ভীটে!

নির্ব্বাক বিস্ময়ে চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাতিরামের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন, এই অদ্ভুত মানুষটির রহস্যময় কথাগুলি তাঁহার কাণে যেন হেঁয়ালির মত ধ্বনিত হইতেছিল।

পাতিরাম তাড়াতাড়ি লম্বা লেফাফায় ভরা একখানা দলিল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পদতলে রাখিয়া কহিল,—বিশ্বাস না হয় এটা পড়ে দেখুন।

কম্পিত হস্তে লেফাফাখানি খুলিয়া দামী ষ্ট্যাম্পকাগজে রেজিষ্টারী আফিসের মোহর যুক্ত দলিল খানি পড়িতে পড়িতে উদ্দাম অশ্রুর আবর্ত্তে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গণ্ডদেশ প্লাবিত হইয়া গেল। বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠে তিনি চীৎকার তুলিলেন,—ওগো গিন্নী! শোনো—শোনো; পাতিরাম এই বাড়ী খানা আমাদের একবারে দিয়েছে—দান করেছে!

ভিতর হইতে বামাকণ্ঠের স্বর শ্বসিয়া উঠিল,—বেঁচে থাক বাবা, জয় হোক তোমার।

ঠিক এই সময় ধীরে ধীরে এক তরুণী সেই স্থানে আসিয়া আদ্রকণ্ঠে পাতিরামকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—মাকে একদিন যেমন ঘটা করে কাপড় পরিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ঘটা করে আজ গৃহপ্রবেশ করলেন। গৃহ আপনার সার্থক হল।

শিহরিয়া উঠিয়া পাতিরাম মেয়েটির প্রতিভাদৃপ্ত মুখখানির দিকে চাহিল মাত্র, মুখে তাহার বাণী ফুটিল না।

পিছন হইতে পাতিরামের মা দ্রৌপদী অগ্রসর হইয়া মেয়েটির হাতখানি খপ করিয়া ধরিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছে টানিয়া লইয়া গেল, তাহার পর তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিল,—এই আমার ঘরের লক্ষ্মী বাবা, পাতিরামের ভাগ্য ভালো, মা আমার ধরা দিয়েছেন, এখন তুমি আশীর্ব্বাদ কর বাবা!

দুই হাত তুলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন,—বা! বা! এ যে মা-লক্ষ্মীর জীবন্ত প্রতিমা! আশীর্ব্বাদ করি, সর্ব্বসুখী হও, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

পার্ব্বতীর হাত ধরিয়া দ্রৌপদী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পদতলে মস্তক নত করিয়া দিল।

## ২৬

পাতিরামের সংসারে আসিয়াই পার্ব্বতী তাহার অদ্ভুতপ্রকৃতি স্বামীর অতীত জীবনের সকল কাহিনীই একটি একটি করিয়া জানিয়া লইল; এমন কি, পাতিরামের সেই খেরো বাঁধানো খাতাখানি পর্য্যন্ত সে আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিল। স্বামীর দুর্জ্জয় জিদ যেমন তাহার মনে আনন্দ দিল, সেই সঙ্গে অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার প্রাচুর্য্য তাহাকে মর্ম্মাহত করিয়া তুলিল।

কৃত্তিবাসকে জব্দ করিতে পাতিরাম যে দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হয়, তাহা যতই শোচনীয় ও কৃত্তিবাসের দিক দিয়া মর্ম্মন্তুদ হউক না কেন, পার্ব্বতী তাহাতে ক্ষুব্ধ হয় নাই। কিন্তু রাধানাথের প্রতি স্বামীর নিষ্ঠুরাচরণের বিরুদ্ধে তাহার সমগ্র অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠে। পুরুষসিংহ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইতে রাধানাথের চরম নিগ্রহ পর্য্যন্ত সমস্ত কাহিনী জ্ঞাত হইয়া সে দৃঢ়তার সহিত কহিয়াছিল,—এ অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায়।

কিন্তু বুদ্ধিমতী পার্ব্বতী প্রতিবাদের পন্থাটিও ভালভাবেই জানিত। একদিন সে আবদারের সুরে স্বামীকে কহিল,—আমার একটা ব্রত আছে, তার যে উদ্‌যাপন দরকার।

হাসিমুখে পাতিরাম কহিল,—ফর্দ্দটা দিতে পারো, কাষ আটকাবে না।

পার্ব্বতীর ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি ফুটিল, কহিল,—আটকাবে না জানি! কিন্তু ব্রতটা খুব সাধারণ নয়।

পাতিরাম কহিল,—সেটা আমি আগেই বুঝেছি। পাতিরামের পত্নী যে যেমন তেমন একটা ব্রত করবে না, এটাও আমার জানা আছে।

পার্ব্বতী কহিল,—তবে ফর্দ্দটা বলি শোন ;—যেমন ঘটা করে মাকে শীতের কাপড় পরিয়েছিলে, নতুন রাস্তা দিয়ে যেমন গৃহ প্রবেশ করে-ছিলে, তেমনই জাঁকজমকে একটা পুরোনো ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

পাতিরামের চক্ষু দুইটি এক নিমিষে যেন জ্বলিয়া উঠিল। সেই দৃষ্টি হইতেই পার্ব্বতী বুঝিতে পারিল যে, কথাটা আর খুলিয়া বলিতে হইবে না, কথা পাড়িতেই স্বামী তাহা বুঝিতে পারিয়াছে।

পাতিরাম কহিল,—আমি জানি, আমার বাড়ীতে এসেই তুমি আমার সম্বন্ধে সমস্তই জেনেছ ; কিছুই আর চাপা নেই।

পার্ব্বতী কহিল,—আমি তো তোমার বাড়ীতে কারবার করতে ঢুকি নি ; তোমার ঘর সংসার সামলাতেই এসেছি। কাযেই তোমার সংসারের সঙ্গে তোমাকে পর্য্যন্ত আমাকে ভাল করে পড়ে নিতে হয়েছে। স্বামীর মন যদি না পড়া যায়, স্বামীকে নিয়ে কি করে ঘর করা চলে ? অনেক ভেবে চিন্তেই ব্রতের কথা পেড়েছি।

পাতিরাম কহিল,—যখন সব জেনেছ, তাহলে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ —এ ব্রত উদ্‌যাপন করা কত শক্ত ! রাধানাথ মুখুয্যেকে জব্দ করতে আমি হায়রাণ হয়ে গেছি, কিন্তু তবু বাগে আনতে পারি নি। হয়ত, এতদিনে সে ঐ কীর্ত্তি কোলের মত আমার কাছে এসে নেতিয়ে পড়তো, কিন্তু পড়েনি—তাকে পড়তে দেয়নি—তার ঐ নতুন মন্ত্রী ! তবে আমারও মন্ত্র হচ্ছে—ওকে পেড়ে ফেলবোই,—শেষের যুদ্ধই এখন চলেছে।

পার্ব্বতী কহিল,—তোমার খাতায় সে সব ত লিখেই রেখেছ। রাধানাথ বাবুকে চালাচ্ছেন এখন তাঁর স্ত্রী—নিভা দেবী। তোমার যত কিছু রাগ এখন ঐ মেয়েটির ওপরে। কিন্তু যে রাস্তা ধরে তুমি চলেছ, তাতে কিছু করতে পারবে না।

উত্তেজিত কণ্ঠে পাতিরাম কহিল,—কিন্তু না পারলেও ছাড়বো না। এবার রাধানাথ মুখুয্যেকে চারিদিক দিয়ে বেঁধে তার মৃত্যুবান হাতে নিয়েছি। রাধুকে জেলে পুরবো; প্যায়দা নিয়ে গিয়ে বাড়ীতে ঢুকে থালা ঘটি বাটি পর্য্যন্ত নিলেমে চড়াবো—

পার্ব্বতী কহিল,—তবুও তাঁর স্ত্রীকে দাবাতে পারবে না। স্বয়ং ভগবতী তাঁকে রক্ষা করবেন। তিনি কিছুতেই নীচু হবেন না জেনো। তা ছাড়া—মা-লক্ষ্মীর দৃষ্টি এখন ওদের দিকে পড়েছে, এখন তোমার সব চেষ্টাই পণ্ড হবে।

—মা-লক্ষ্মীর দৃষ্টি না পড়ুক, পার্ব্বতীর দৃষ্টি ওদের উপর পড়েছে, তা বেশ বুঝতে পারছি।

—এ দৃষ্টির কোন দাম নেই। ওদের ওপর লক্ষ্মীর দৃষ্টি না পড়লে ওরা হাজারিবাগের জঙ্গালগুলো আঁকড়ে পড়ে থাকতো না,—এতদিন তোমার খর্পরে এসে পড়তো। আর এই জন্যই ত রাধানাথ বাবুর স্ত্রীর ওপর তোমার এত রাগ। তিনি বুঝেছেন ঐ জঙ্গালের ভেতর মা-লক্ষ্মীর ঝাঁপিভরা মাণিক লুকিয়ে আছে। এখন আমার কথা হচ্ছে এই—এবার রাস্তা পাল্টাতে হবে; জোর-জবরদস্তি ছেড়ে সোজা রাস্তা ধরে চলো, তাহলেও ছকুড়ি সাতের খেলা বজায় থাকবে।

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া পাতিরাম কহিল,—তুমি কি করতে বল?

পার্ব্বতী কহিল,—ঋণ পরিশোধ করতে। মার সঙ্গে পরামর্শ করে আমি সব ঠিক করে রেখেছি; তাতে তোমারই মুখোজ্জ্বল হবে, আর সাতকড়ি মুখুয্যের ঋণ পরিশোধের সঙ্গে তাঁর বংশটাও রক্ষা পাবে।

পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে পাতিরামের হস্ত নিক্ষিপ্ত খরতর শরগুলির সাংঘাতিক আঘাতে রাধানাথ যখন ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় শয্যার আশ্রয় লইয়াছে এবং নিভাদেবী শরাহত স্বামীর পরিচর্য্যার সহিত প্রতিপক্ষের চরম অভিযান ব্যর্থ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সেই সময় অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী বধূর সহিত এক বর্ষীয়সী মহিলা সরাসরি রাধানাথের বাড়ীর দ্বিতলে দরদালানে আসিয়া ডাকিল,—কোথায় গো মা-লক্ষ্মী, কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা যে।

দরদালানটির পার্শ্বেই রাধানাথের শয়ন ঘর। অসুস্থ রাধানাথ খাটের উপর স্থূল শয্যায় শয়ন করিয়াছিল, নিভা একধারে বসিয়া স্বামীর সহিত কি একটা কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিল। স্বর শুনিয়াই ছুটিয়া বাহিরে আসিল। দেখিল,—সাদা থান কাপড় পরা এক বৃদ্ধা ও তাহার পশ্চাতে এক তরুণী দাঁড়াইয়া আছে। যদিও ইহাদের সাজ গোছের বিশেষ প্রাচুর্য্য নাই, কিন্তু উভয়েরই দেহে মুখে যেন লক্ষ্মীশ্রী ঝলমল করিতেছে। বৃদ্ধার গলায় সরু লিকলিকে একছড়া সোনার হার, তাহাতে একটি কবচ দুলিতেছে। বধূটির পরিধানে টুকটুকে লালপেড়ে একখানি সাধারণ শাড়ী, হাতে দুই গাছি শাঁখা, তাহাদের কোলে এক গাছি করিয়া সোনার রুলি, গলায় সরু এক ছড়া হার। কিন্তু এই

সামান্য বসন-ভূষণেই মেয়েটির স্বাস্থ্যপুষ্ট রূপটি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

নিভাকে দেখিয়াই বৃদ্ধা কহিল,—বুঝিছি, তুমিই মা-ঠাকরুণ, এবাড়ীর মা-লক্ষী। বউমা, গড় কর।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই উভয়ে নিভার দুই পায়ে মাথা নত করিয়া দিল ও অঙ্গুল সংযোগে পদধূলি লইয়া শ্রদ্ধার সহিত মাথায় ঠেকাইল।

নিভা তাড়াতাড়ি একখানি সতরঞ্চি বিছাইয়া দিয়া কহিল,—বসুন।

বৃদ্ধা কহিল,—সে কি হয় মা, তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে, আর আমরা বসবো।

বধূ কহিল,—আপনিই ওখানে বসুন, আমরা মেঝেতে বসছি, দিব্যি পরিষ্কার মেঝে—

নিভা কহিল,—তা কি হয়! গৃহস্থের বাড়ীতে এসে মাটিতে বসতে নেই, তাতে অকল্যাণ হয়। আপনারা বসুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে না হয় বসছি।

সঙ্গে সঙ্গেই সে ক্ষিপ্রকৌশলে আগন্তুকাদ্বয়কে সতরঞ্চির উপর বসাইয়া নিজেও তাহাদের সহিত বসিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল,—কোথা থেকে আসছেন আপনারা?

কথাটার উত্তর দিল তরুণী বধূটি। ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—আসছি আমরা নিকিড়ি পাড়া থেকে, অনেকদিন থেকে সাধ—বামুন বাড়ীতে প্রসাদ পাবো;—তাই মাকে নিয়ে এসেছি। উনি আমার শ্বাশুড়ী হন।

নিকিড়ি পাড়ার নাম শুনিয়াই নিভার মনে জোরে একটা দোলা লাগিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকা নারী দুইটির মুখের দিকে চাহিয়া

সে সন্দিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—নিকিড় পাড়া থেকে আসছেন? তাহলে—পাতিরাম পাকড়ের—

বৃদ্ধা কহিল,—পাতিরাম আমার ছেলে, আর এই আমার বউ। ভারি লক্ষ্মী বউ মা—গুণের সীমে নেই। দেবতা বামুন বলতে অজ্ঞান। আর নেকাপড়ায় তোমাদের ঘরের মেয়েদের মতই মা!

বধূ তাড়াতাড়ি কহিল,—মার বয়স হয়েছে কিনা, তাই সব কথাই বাড়িয়ে বলেন। আমার কোন দোষ ত্রুটি ওঁর চোখে পড়ে না, শুধু গুণই দেখেন। আসলে কিন্তু আমার কোন গুণ নেই দিদি!

স্তব্ধ বিস্ময়ে নিভা শাশুড়ী বধূর কথা শুনিতেছিল। বধূর কথা শেষ হইলেও, নিভার মুখে কথা ফুটিল না। তাহাদের পরম শত্রুর মা ও স্ত্রী যে তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া এমন সচ্ছন্দভাবে কথা কহিতে পারে—তাহার অন্তর যেন তাহাতে সায় দিতে চাহিতেছিল না! সত্যই কি ইহারা পাতিরামের পরিজন,—অথবা ইহার মধ্যেও পাতিরামের কৌশল-চালিত কোন চক্রান্তের অভিনয় চলিয়াছে?

কিন্তু বৃদ্ধার পরবর্ত্তী কথা তাঁহার এই সংশয়টুকুর মূলচ্ছেদ করিয়া দিল। বধূর কথার সূত্রটি ধরিয়া নিভার দিকে চাহিয়া বৃদ্ধা কহিল,—বউমার আমার স্বভাবটিই এমনি মা, নিজের সুখ্যেতে কান দিতে চান না। কিন্তু তুমিই বলত মা, স্বোয়ামীর দোষ যে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়, ভুলচুক ভেঙ্গে দেয়, তার গুণ গাইব না? এই যে আমার ছেলে পতা—এ বাড়ীর নুন খেয়ে মানুষ, বড় মানুষ হয়ে সে ত সবই ভুলে গিয়েছিল—কত শত্রুতাই যে সেধেছিল তোমাদের সাথে—

গো! মা হয়ে আমি কি তাকে বাগে আনতে পেরেছিলুম? কিন্তু বউমা আমার সংসারে এসেই এই ভুল ভেঙ্গে দেবার জন্যে তোমার সংসারে ছুটে এসেছে মা; শুনে অবাক হবে তুমি শুনে—আমার ছেলেকেও রেহাই দেয়নি,—সেও এসেছে, বাইরের ঘরে বসে আছে।

পার্ব্বতী কহিল,—আমিও ঠিক এই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম দিদি! আপনাকে দেখেই মাথা আমার আপনার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে চাইছে। মনে হচ্ছে—আপনি যেন জন্ম জন্মান্তরের দিদি, আর আমি আপনার স্নেহের ছোট বোনটি।

নিভা কহিল,—বেশ, তাহলে দিদির মতই এই আশাটুকু আমি নিশ্চয়ই করতে পারি—এমন কোন বিপর্য্যয় কাণ্ড তোমাদের পক্ষ থেকে হবে না—আমার স্বামীর অসুস্থ দেহের ওপর যার নিষ্ঠুর আঘাত পড়বে! কি ভেবে একথাটা আমি বলেছি, তুমি বোন, নিশ্চয়ই তা ধরতে পেরেছ বলেই আমার বিশ্বাস।

পার্ব্বতী কহিল,—আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন দিদি; আমার স্বামীর কাছেই শুনিছি, আপনার শ্বশুর বেঁচে থাকতে, একদিন তিনি প্রচুর দম্ভ নিয়ে এবাড়ীতে ঢুকেছিলেন, কিন্তু আপনার শ্বশুর তাঁকে যে আক্কেল দেন—তাতে মাথা নীচু করে ফিরে যান। অতীতের সে স্মৃতিটুকু মনে রেখেই তিনি এবাড়ীতে মাথা গলিয়েছেন। আমার স্বামী আর যাই হোন, তিনি মানুষ চেনেন, মায়ের কি মর্য্যাদা তা বোঝেন।

নিভা তখনই বালক পুত্র নিতাইকে ডাকিয়া বলিয়া দিল,—নীচের বৈঠকখানায় তোমার এক কাকাবাবু এসেছেন, তাঁকে সঙ্গে করে ওপরে নিয়ে এস, ঐ ঘরে তিনি বসবেন!

রাধানাথ বিছানার সহিত মিশিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়াছিল। মানসিক ব্যাধি সাংঘাতিক হইয়া তাহার অনিন্দ্যসুন্দর দেহখানিকে একেবারে বিবর্ণ করিয়া দিয়াছে।

পাতিরাম কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই শয্যাশায়ী রাধানাথের শীর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। গাঢ়স্বরে কহিল,—প্রণাম রাধুবাবু! কিন্তু এ কি! এমন চেহারা হয়েছে?

রাধানাথ শয্যাসান্নিধ্যে রক্ষিত কেদারা খানির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল,—ব'স, পাতিরাম। আমি সব শুনিছি। আমার কাছে আজ এটা কল্পনাতীত ব্যাপার যে—তোমরা আমার বাড়ীতে প্রসাদ পেতে এসেছ।

পাতিরাম কহিল,—বা! এটা ত আমাদের জন্মগত অধিকার। বাবার সঙ্গে ছেলেবেলায় কত বারই পাত পেড়ে প্রসাদ পেয়েছি। মাঝে সব তলিয়ে গিয়েছিল। তাই আবার কেঁচে গণ্ডূষ সুরু করবো বলে এসেছি।

রাধানাথ কহিল,—আমি শুনেই যাচ্ছি। আর, এমন একটা আনন্দও পাচ্ছি, যেটা সত্যই কল্পানাতীত।

পাতিরাম কহিল,—প্রসাদ পাবার আগে আমার কিন্তু একটা অনুরোধ আছে রাধুবাবু।

নিষ্প্রভ দুইটি চক্ষু পাতিরামের দিকে ফেলিয়া রাধানাথ কহিল,—বল।

পাতিরাম কহিল, তোমার আফিস বন্ধ হবার পর একখানি সরকারী চিঠি আমার হাতে আসে। হাজারিবাগের যে মাইকা মাইন তুমি কিনেছিলে, তার মাইকাগুলো লালচে রঙ্গের বলে বাজারে চলে নি।

তুমি ভেবেছিলে টাকাগুলো জলে পড়েছে। তারপর সেই মাইকার স্যাম্পল বোধ হয় কোন একটা সরকারী কনসার্ণে পাঠিয়েছিলে?

রাধানাথ কহিল,—হ্যাঁ, পাঠিয়েছিলুম; কিন্তু কোন উত্তর আসেনি।

পাতিরাম কহিল,—উত্তর এসেছিল, কিন্তু তুমি পাওনি। সে চিঠি যেমন করেই হোক আমার হাতে এসে পড়ে। সে চিঠির মর্ম্ম কি শুনবে? ফার্ষ্ট ক্লাস সাদা মাইকার এখন যে দর, তার অন্তত ত্রিশগুণ বেশী দরে এই বিটকেল রঙের মাইকা বিকুচ্ছে; কেন না, সেল্‌-গোলার কাযে এই মাইকার চাহিদা খুব বেশী। এইজন্যই কৃত্তিকে হাত করে আমি তোমার মাইকা মাইন ও মজুত মাইকা সব কিনে নিতে চেষ্টা করি। কিন্তু পারিনি। সে যাই হোক, আমার জন্য হার্ডোয়্যারী বিজনেসে তুমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে। এখন এই মাইকা বিজনেসে তুমি আবার লক্ষীমন্ত হও—এই আমার অন্তরের বাসনা। তাই এই হদসটির সঙ্গে মা-লক্ষ্মীর ভাঁড়ারের চাবিটি আমি তোমাকে আজ বাড়ী বহে দিতে এসেছি।

রাধানাথ স্তব্ধভাবে পাতিরামের কথাগুলি শুনিল। যে লোক তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে—যাহার চেষ্টায় চারিদিক হইতে যাবতীয় পাওনা ভীতিপ্রদ মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে বিভীষিকা দেখাইতেছে, কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও যে সাংঘাতিক মানুষটিকে সে তাহার এই চরম দুর্গতির একমাত্র হেতু সাব্যস্ত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছে—সেই লোকই আজ তাহার বাড়ীতে আসিয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া তাহার নিষ্কৃতির পথ দেখাইয়া দিে ভাবের আবর্ত্ত উঠিয়া পলকে তাহার দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন করিয়া

অভিভূতের মত রাধানাথ কহিল,—যখনই শুনলুম যে, তুমি সপরি এ-বাড়ীতে এসেছ প্রসাদ পেতে, তখনই ভেবেছিলুম এমন একটা

।ছু বাধাবে, যাতে বাড়ীশুদ্ধ সকলেই চমকে যাবে এ ব্যাপারে তুমি যে ছেলেবেলা থেকে ওস্তাদ, তা ত জানি।

পাঁচুরাম কহিল,—ঝগড়া অনেকের সঙ্গে করেছি, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও খুব চলছে, কিন্তু তুমি ডুবতে ডুবতে সর্ব্বস্বান্ত হতে বসেও জানিয়ে দিয়েছ যে, সাতকড়ি মুখুজ্যের রক্ত তোমার দেহে বইছে। তুমি ভেঙ্গে পড়বে, তবু মচকাবে না।

রাধানাথ কহিল,—এর জন্য আমি আমার স্ত্রীর কাছে ঋণী। তোমার শেষের চাল তাঁরই বুদ্ধিতে ব্যর্থ হয়েছিল।

পাঁচুরাম শ্রদ্ধাভরে করযুগল যুক্ত করিয়া ললাটে ঠেকাইল ও সেই সঙ্গে আবেগের সুরে কহিল,—আমি তা জানি। এ জন্য তাঁর চরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। সবাই বলে—আমি খুব ইন্টেলিজেন্ট, কিন্তু আমি বলছি—আমার চেয়েও তিনি অনেক বেশী ইন্টেলিজেন্ট।

## সমাপ্ত